# কিন্নর পাহাড়ী

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

বসুধারা প্রকাশনী
—৷ ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বসুধারা প্রকাশনী

প্রকাশক : শ্রীজয়ন্ত বসু, বি.এ.,
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রচ্ছদশিল্পী : অজিত গুপ্ত

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৬

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু—

'কিন্নর পাহাড়ী' 'বসুধারা' মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'চেনাশোনার বাইরে' নামক কাহিনীর পরিবর্ধিত রূপ। পার্বত্য হিমাচলপ্রদেশের পাদপ্রদীপে স্বাধীন ভারতের নানা রাজ্যের যুব-সম্মিলন —'খাদরালা ক্যাম্প্'-এর মাধ্যমে আরণ্যক পাহাড়ীয়াদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের ইহা এক রম্য ও রসঘন বিবরণ।

—প্রকাশক

# কিন্নর পাহাড়ী

াক এলো এক বন্ধুর কাছ থেকে। সারা ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থকে জড়ো হয়ে ছাত্রেরা যাচ্ছে হিমালয়ের বুক চিরে পথ করার জন্য। আমি খন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নই। তবু বন্ধুর আহ্বান যখন পেলাম, আর মনও থন পাখা মেলে ছিলই, চটপট সব বেঁধে নিলাম।

জায়গাটা দশ হাজার ফুটের মাথায়। খাদরালা। খাদরালা হিমালয়ের বহু াঙ্গলের মধ্যে একটা জঙ্গল। কস্তুরীর জন্য প্রসিদ্ধ। হিমাচল-প্রদেশের াজধানী সিমলা। সেখান থেকে বাসে যেতে হয় বাগী, নারকাণ্ডা। নারকাণ্ডা ,৩০০ ফুট। সেখান থেকে হাঁটাপথে সাত মাইল খাদরালা। খাদরালা থকে তিব্বত পর্যন্ত হাঁটাপথ। এই পথকে বাস-চলাচলের যোগ্য করতে হবে াই আমাদের কাজ।

রওনা হলাম ২রা জুন ১৯৫২, রাত ১০টার গাড়ী।

আমাদের জন্য একখানা পুরো 'বগি' আলাদা করা ছিল। তারই ক্ষুদ্রতম ম্পার্টমেণ্টে আমরা দশজন। তার মধ্যে এলো দুটো বাণ্ডিল—ডিনার ;— ার্জলা। বিভু করুণাময়। চারজন বিদগ্ধ, পেটের দগ্ধানি পাবেন না তাই াড়াপেট ভরে এসেছিলেন। সুতরাং ছ'জনকে বারোখানি পুরি-প্রসাদাৎ নার সম্পন্ন করতে হলো।

এর মধ্যে দেবী ইন্দিরা গান্ধী এসে আমাদের খবর নিয়ে গেলেন। বললাম, ্যা, সব ঠিক।'—প্রাণ বলছে 'হায় জল!'

চোখ খুললো একেবারে কালকায়। দেবী ইন্দিরা এসে তদারক করে পত্র নামাবার ব্যবস্থা করাতে লাগলেন। হিমালয় পাহাড় দেখে আমাদের

চম্‌কাবার আগে সেই মালের পাহাড় দেখে হিমালয়ের চমক লাগার কথা। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর *Later Moghuls* এবং *Aurangzeb*-এ লিখেছেন যে মোগলদের বাদশাহীই তাদের যুদ্ধে কাবু হবার একটি কারণ। ওরা যখন যুদ্ধে যেতো তখনও একটা গোটা শহর সঙ্গে নিয়ে যেতো। গড়গড়া থেকে বাইজী অবধি নিতে গিয়ে শেষ অবধি বারুদ আর তলোয়ার নিয়ে যেতে হোতো ভুল। আমরা চলেছি হিমালয়ের বুক চিরে পথ করতে। কুড়ুল নেই, বেল্‌চা নেই, শাবল নেই, গাঁইতি নেই—আছে রেন্‌কোট, ওভারকোট, টাই, বিলিতী ক্রীম, ক্যামেরা, বায়নোকুলার, ছড়ি, গগ্‌ল্‌স্‌ আর দু'চার জোড়া করে জুতো। কাজেই বিরাট বিরাট স্যুটকেস তথা ট্রাঙ্ক এবং বিছানাপত্রকে ১২৭ দিয়ে গুণ করে, যোগ করুন—Youth Camp-এর অফিস। অর্থাৎ টাইপরাইটার, লাউডস্পীকার, ডুপ্লিকেটার থেকে কলিং-বেল পর্যন্ত। মনে রাখতে হবে খাদরালায় কিছু পাওয়া যায় না। তাই সব জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। ভয় নেই কিছু। আমরা হিমাচল-প্রদেশের সরকারের অতিথি। এগারোখানা বাস, দু'খানা ট্রাক এবং একখানা জীপ্‌ পাঠিয়েছেন তাঁরা। কুলী-মজুর তাঁদেরই। সুতরাং, হোক্‌না পাহাড়—হনুমান তো আছে?

কালকা স্টেশন আমার জানা। চট্‌ করে স্নান সেরে নিয়ে চা খেলাম। ততক্ষণে বাস স্টার্ট দিয়েছে। এসে বসলাম। থামলাম একেবারে সোলোনে।

পেট ভরে খেলাম এখানে। রেস্টুরাণ্টের সর্দার বুড়ো আমায় চেনে। দেখে মহাখুশী—"বাবুজী আর আসোনা এদিকে। বোলোনা বোলোনা। যুদ্ধ্‌ থেমে যাবার পর মরে গিয়েছিলাম, এখন আবার দু'গুণো মরে গেছি এই পার্টিশানের ঝাঁঝে। কি বলি বাবুজি, এরা আসে ;—আমার দেশের লোক ;—বলতে লজ্জা হয়—তবু বড় দুঃখে তোমায় বলছি—ভালো ভালো জামা কাপড় পরা বাবুরা খেয়ে পয়সা দেবার বেলায় কাজিয়া লাগায়। শুনলে অবাক্‌ হবে বাবুজী, সেদিন এক সর্দারনী সারা রাজ্যের রং তার ঠোঁটে আর গালে ল্যাপা—খাবার পর পাঁচটাকার নোট দিয়ে ফেরত চাইলে দশটাকার নোটের। অবাক্‌ আমি। দাড়ি সাদা হয়ে গেলো এই কম্মো করতে করতে ; কিন্তু এমনটা দেখিনি, শুনিনি। দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেলো। মেয়েমানুষ কিনা বাবুজী, তাতে রং চড়ানো হালের বিবি— আমি যেন কেঁচো হয়ে গেলাম

দোকানের সুনামের জন্য আক্কেল সেলামী দিলাম। নেহাত কোথাও যাবার আর বয়স নেই তাই। আবার কবে আসবে বাবুজী?…"

সুরসিকের জন্য বলে রাখি সোলোনের পান আর plum খুব জুৎসই মাল। চমৎকার কালো-কালো plum—মিষ্টি। আসে পাঞ্জাব-কাশ্মীর পাহাড় অঞ্চল হতে।

এরপর বেলা বারোটায় সিমলা।

থাকবার জায়গা চমৎকার। পুরাকালে Commander-in-chief-এর বাড়ী ছিলো।

পয়লা তারিখে—অর্থাৎ সিমলায় রওনা হবার আগের দিন পণ্ডিত নেহেরু নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাদের। সেদিন আবার তাঁর বাড়ীতে At Home ছিল নতুন Parliament-এর সদস্যদের অভ্যর্থনার জন্য। আমাদের বললেন—"এই ব্যাপার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো তোমরা। কিছু বলতে চাই নিরিবিলিতে। বক্তৃতা নয়—কথা।" তারপর আটটা যখন বেজে গেলো—প্রকাণ্ড লনে বিদায়ের বাজনা বাজলো (রাষ্ট্রগীতির ব্যাণ্ড)—অভ্যাগতরা সব একে একে চলে গেলেন। তখন এলেন পণ্ডিত নেহেরু। এসেই একেবারে বন্ধুর মতো নরম সহজ গলায় বললেন—"কি ভাই, হিন্দীতে বললে বুঝবে তো?" তারপর প্রায় চল্লিশ মিনিট রঙ্গে-রসে-ভরা প্রাণ-খোলা বার্তালাপে জমিয়ে তুললেন আসর। বার বার বোঝালেন: কোনো রাজনৈতিক কাজে তোমরা যাচ্ছোনা; যাচ্ছোনা কোনো তথাকথিত কেতাবী আদর্শবাদের প্রচারে। শক্ত হও, দৃঢ় হও, নিজেদের বোঝা বুঝে নাও, দেশকে চেনো। তোমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমি তোমাদের এই সুযোগ দিতে চাই যাতে হিমাচল থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সারা দেশটাকে তোমরা জানতে চিনতে পারো। যে দেশে যাচ্ছো দেখবে সেখানে দারিদ্র্যের নগ্নমূর্তি। দেখবে সেখানে একহাত মাটিতে ফসল ফলাতে কী পরিশ্রম করতে হয় মানুষকে। সেখানে সম্পদ রাশি রাশি। তবু তারা দরিদ্র। খেতে পায়না, পরতে পায়না—লেখাপড়া, বিশ্রামসুখ কিছু জানেনা। অনেক কারণের মধ্যে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব ওদের দুর্গতির একটা কারণ। এই যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত করতে তোমরা চলেছো। তোমাদের জয় হোক।

তাঁর ভাষার সহজ আন্তরিকতা আমি বোঝাতে পারবো না। যেন ক্লাবে বসে সমবয়সীদের সঙ্গে আলাপচারী কথা। দেখলাম নবীন প্রাণের মধ্যে যেন বসন্তের বাতাস বয়ে গেলো। বিমুগ্ধ হয়ে ফিরলাম।

তখনও পণ্ডিতজীর কথাই কানে বাজছে—বলেছিলেন, "মিতা করো হিমালয়ের পাথরকে, তার বনকে, তার শ্বাপদকে, তার বিহগ-কাকলীকে—মিতা করো সেই দেশবাসীকে। এই মিতালীর বার্তা বয়ে নিয়ে যাও গুজরাতে, কানাড়ায়, অন্ধ্রে, উৎকলে, রাজস্থানে, বাংলায়, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে—দিকে দিকে নিয়ে যাও এই মিতালীর খবর। সারা ভারতকে এক মেলে বেঁধে দাও।"

এই অভিযানে যোগ দিয়েছে বম্বে, বাংলা, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, অন্ধ্র—বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছেলেরা। এরা কোনোদিন পথে নেমে ধুলা মাখেনি, কোদাল শাবল হাতে ধরেনি। আহ্বান-লিপিতে স্পষ্টতঃ লেখা ছিল—"কুলীর মতো খাটতে হবে; ঘাম ঝরবে; রক্ত ঝরবে": তবু তারা এলো। হাসিমুখে বরণ করলো এই অভিযান।

পারিখ বম্বের ছেলে। বয়স ষোলো। সবে কলেজে ঢুকেছে। তার শরীর ক্ষীণ। চেহারা সৌম্য ও ভদ্র। মন রঙ্গে ভরা। মিষ্টি—লাজুক—নম্র প্রকৃতি। পদে পদে ফোটো নিচ্ছে এর ওর তার। নরম ভিজে বয়সটার কিশোরিত রূপ। সকালবেলায় হঠাৎ আমায় বললে—"কি খাই বলুন তো? কাল খাইনি।"

"কেন?" আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"বড় বিশ্রী খাবার। পাচ্ছিনা খেতে।"

বললাম—"খেয়োনা। পরে যখন ক্ষিদেয় পেটে কামড়ানি ধরবে তখন কিছু ভরে দিয়ো।"

"আপনি তাই করছেন বুঝি?"—হাসতে হাসতে ও জিজ্ঞাসা করলো।

"হ্যাঁ—নইলে উপায় কি?"

অথচ খাবার যে সিমলায় খুব খারাপ পেয়েছিলাম তা নয়। রুটি, কলায়ের দাল আর ঢ্যাঁড়শ-চচ্চড়ি। অবশ্য রুটি শুকনো ও মোটা, দালটা পচা, আর ঢ্যাঁড়শ-চচ্চড়িতে নুন কম। আমি জানতাম এর চেয়েও খারাপ খাবার খেতে হবে।

শ্রীযুক্ত 'প-ম' আগেও আমাকে দেখেছেন। বললেন—"আসছিলাম সঙ্গোলে দে'। দেখলাম আপনারা সারবন্দী ব্যাজ লাগিয়ে ফৌজ হয়ে চলেছেন। হ্যাঁ মশায়, কি হোলো ছোটোলাটের ওখানে?"

আমি নমস্কারপর্ব সমাধা করে বললাম,—"কেমন আছেন? ভালো তো? বাড়ীর খবর ভালো?"

একটিপ নস্য নিয়ে (লেগে রইল নাকের গোড়ায়, গোঁপের ওপর; ভ্রূক্ষেপ নেই) বললেন—"এই চলে যাচ্ছে।...বলুন না মশায়, ছোটোলাটের ওখানে হচ্ছিল কি?...আমি ভাবি কি বুঝি একটা জবর চলেছে!"

চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত এসে বললেন—"জবর; জবর নয় তো আবার কি? স্বয়ং হিমাচল সরকার নিমন্ত্রণ করে এনেছেন ভারতের যুবজাগরণ এই অরণ্যের গভীরে। সাড়া জাগাবেন এই দুর্গমের হৃদয়ে। প্রথম নয় মশায়, প্রথম নয়। ভগীরথও এসেছিলেন নীচে থেকে এই ওপরে, জল-কল্লোলের কাকলী দিয়ে হিমাচলের অন্তঃপুরকে মুখরিত করে তুলতে। ভগীরথ তখন যুবক।"

পণ্ডিতের সঙ্গে 'প-ম'র কথা যেন একটা 'অঙ্গদ রায়বার'। মজা লাগতো শুনতে।

রসিক 'প-ম' বললেন—"বাংলায় বলুন না মশায়, বুঝতে পারি। জানেন তো বিদ্যের দৌড়।" 'প-ম' সুসাহিত্যিক লোক! তবু ঠাট্টা করলেন পণ্ডিতকে।

আমি বিনীতভাবে বললাম—"তিব্বত যাবার পথ তৈরী করতে হবে। একশো পঁচিশজন যুবক-ছাত্র ভারতবর্ষের নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে এই কাজে এগিয়ে।"

"বলেন কি।" আশ্চর্য হয়ে যান ভদ্রলোক, "একশো পঁচিশজন ছাত্র কেটে সাফ্ করে দেবে গোটা হিমালয়? তেমন তাগড়া তো দেখলাম না।" স্বরে শ্লেষের ছুঁচ নেই। অভিনয়দক্ষ লোক। হঠাৎ ন্যাকা সাজতে জানেন। আর ওই ন্যাকামি দেখে পণ্ডিত মরেন রেগে।

হেসে ফেললাম। বললাম—"তা কি পারে? গরমের বন্ধ ওদের। শারীরিক শ্রম দিয়ে, দেশের খানিকটা কাজে, ধুলো বালি ঘাঁটুক।"

হাঁফ ছেড়ে বললেন 'প-ম'—"বুঝলাম। গরমের ছুটিটা কাটাতে এসেছে। বেশ, তা বেশ।" খুশীর সঙ্গেই উনি অনুমোদন করলেন।

চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত রেগে গেলেন, "ছুটিটা কাটানোই দেখলেন। আচ্ছা লোক তো!"

বিহ্বল ও অনন্যোপায় হবার দৃষ্টিতে বললেন 'প-ম'—"আরও ব্যাপার আছে বুঝি তলায় তলায়?..." খাটোগলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন—"স্বদেশী-টদেশী বুঝি? বোমা-টোমা নয় তো? হ্যাঁ মশায়? তিব্বতে নাকি আবার লাল-পিঁপড়েয় ছেয়ে গেছে। ওদের সাথে যোগাযোগের ফিকির বুঝি?...তবে আর লাটবাড়ীতে কেন? হ্যাঁ মশায়? ভারি ফ্যাসাদের কথা হলো দেখছি।"

চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত হাত ছুঁড়ে বললেন—"মরুন আপনার ফ্যাসাদ নিয়ে আপনি। ভদ্রলোকের ছেলেরা সারা বছর খাটাখাটুনির পর পরীক্ষা দিয়ে বিশ্রাম না নিয়ে কোদাল, শাবল, গাঁইতি মারতে এলো—ধুলো-কাদায় ডোবাডুবি করতে এলো, সমুদ্রতীর থেকে দশহাজার ফুটের মাথায় চড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে মোলো—এসব কিছু নয়, কোথা থেকে গোলা, বারুদ, স্বদেশী, চীনী সব এনে ফেললেন।"

ভ্যাবাচাকা খাবার ভান দেখিয়ে 'প-ম' বললেন,—"জানেনই তো আমার বুদ্ধি কম। বুঝি দেরীতে। আমার ওসবে দরকার কি? আমি বলছিলাম হোলো কি জঙ্গীলাটের বাড়ীতে? ফটাফট্‌ বাল্‌ব্‌ ফাটছিলো!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, ফোটো নিচ্ছিল সাংবাদিকেরা। এখন তো ওটা জঙ্গীলাট বাড়ী নয়। ওটা জঙ্গীলাটের বাড়ী ছিল এককালে, এখন হাসপাতাল। ওখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। আমরা সারবেঁধে দাঁড়িয়েছিলাম—শ্রীযুক্ত মহামান্য হিমাচলপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী হিম্মৎসিংজী আমাদের অভ্যর্থনা করে অভিনন্দন জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত পারমার ও শিক্ষামন্ত্রী পণ্ডিত পদ্মদেবও ছিলেন। বেশ অমায়িক ব্যবস্থা।"

"আর খাওয়া?"

"ওঁরাই ব্যবস্থা করেছেন।"

"হোটেলে? না কোনো Contractor?"

"তাই হবে। Contractor-ই বোধ হোলো।"

"অ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—জানাতে হয়। এমন দাঁওটা ফস্কে গেলো! আমিও তো মশাই এই কম্মো করি। যদি পেয়ে যেতাম দাঁওটা। বিকেলেও তো ফৌজবন্দী হয়ে সারা মল-রোড টহল দিয়ে এই কালীবাড়ীর তলা দিয়ে

উদ্দিগ্‌ পানে গেলেন ঝাণ্ডা ডাণ্ডা নিয়ে কি-সব গাইতে গাইতে—হ্যাঁ মশায়—কোথায় গেলেন ? লাটবাড়ী বুঝি ?

ঠিক ধরেছিলেন ভদ্রলোক। আমরা চারটা আন্দাজ মিছিল করে বের হয়েছিলাম। দুটো উদ্দেশ্য—এক, সিমলা শহরের বুকে চাঞ্চল্য জাগিয়ে দেওয়া যে 'আমরা চলেছি' ; দ্বিতীয়, সিমলায় রাষ্ট্রপতি-ভবন দেখা।

*

সিমলা আমার চেনা শহর। আগে এসেছি।

১৯৪০ সন। ভারতে তখন লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো বড়লাট। জুন মাসে আমি সিমলায়। বড়-চাকুরে একজন আত্মীয়-প্রসাদাৎ ভোজের নিমন্ত্রণ পেলাম লাটবাড়ীতে। লেখা ছিল তাতে কী কী ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ শোভন হবে। আমার মাথায় বজ্রাঘাত! বাদই দিতাম ভোজ। সেটাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু লেখক-মানুষ। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের লোভ সামলানো দুরূহ হয়ে উঠলো। শেষ অবধি যে পরিপূর্ণ পরিচ্ছদে লম্বশাটপটাবৃত হয়ে গেলাম অতবড় ভোজেও, সে-পরিচ্ছদের পানে চেয়ে চেয়ে অনেককেই দেখতে হয়েছিল! ওরই মধ্যে চপল বয়সের তন্বী দু'চারজন আমার পানে চেয়ে চেয়ে হেসেছিলেন 'দুই চোখে কথাভরা আভা' নিয়ে,—নিশ্চয় সে আমার মনোরঞ্জন-প্রসাদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সম্মোহন-শক্তিতে! অন্ততঃ তখন তাই ভেবেই লজ্জায়-ঘেমে-ওঠা থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছিলাম।

সে এক অভিজ্ঞতা! প্রাণ নেই, স্ফুরণ নেই, কেবল দস্তুর হাস্য ও লোষ্ট্রবৎ সম্বর্ধনা। দপ্তরের বড়-ছোটোর মাপে হাসি ও নমস্কারের মাপ ঠিক হচ্ছে। অল্পক্ষণেই সব দেখা হোলো। এইখানে খদ্দরের টুপী-পরা 'চারজনকে দেখেছিলাম। ঠিক মনে নেই ; বোধহয় কৃষ্ণমূর্তি ও ভুলাভাই শাইকে।

খানিকটা পরে English Anthem ব্যাণ্ডে সাড়া জাগালে। অর্থাৎ লাট সছেন। অতিথিদের আসার জন্য কোনো গান বা ব্যাণ্ড বা বিশেষ আয়োজন নেই ; নিমন্ত্রণ-কর্তা দয়া করে অতিথিদের দেখা দিতে আসছেন এই ব্যাপার-ঘোষণা করা হোলো। তারপর সাবধানে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ছে বেছে করমর্দন চলতে লাগলো। তারপর জনগণপরিবৃত লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো পত্নী চলে গেলেন বাগানের পিছনের দিকে। দলবদ্ধ অতিথিরা স্তবকে

স্তবকে উড়ে বেড়াতে লাগলেন। বৃহৎ হল্‌ঘরে সাজানো উঁচু টেব্‌লে খানসামারা সাজিয়ে রেখেছে নানা ভোজ্য ও পানীয়। তাই যে যার নিজে নাও। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাও। আর ফ্যা-ফ্যা করো। মনে মনে বিরাট আত্মপ্রসাদ লাভ করো যে 'লাটের বাড়ীর খানা খাচ্ছি'।

ভাবলাম কবে পরিত্রাণ পাবে জাতি এই বীভৎসতা থেকে। এই নিষ্প্রাণ, সকরুণ, ধিক্‌কৃত, তথাকথিত সম্মান ও সম্মানিতদের উঞ্ছবৃত্তি থেকে।

ভেবেছিলাম, দেশ স্বাধীন হলে হবে। দেশ স্বাধীন হোলো। পণ্ডিত নেহেরুর ওখানেও অনুরূপ পার্টিতে গেছি। কাঠামোটা ঠিক তাই আছে। কেবল মানুষগুলো বদলানোর দরুন প্রাণের জৌলস খানিকটা বেড়েছে বটে।

এখন আবার সেই লাট-ভবন। সেই বাগান। সেই বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা।

এখানে এসে এক বিপদে পড়লাম।

সিমলা তখন এমন একটি রানী, যার রাজা তিনটি। এই পাহাড়দেশে এক নারীর বহুস্বামী গ্রহণ প্রথা আজও নাকি পূর্ণভাবে আছে। সে কথা পরে বলবো। কিন্তু তারই প্রতীক হিসাবে সিমলা নগরীর ভর্তা তিনটি। একটি ভারত সরকার নিজে। তাঁর গ্রীষ্মাবাস সিমলা। দ্বিতীয় পাঞ্জাব সরকার। তাঁরও সাময়িক রাজধানী সিমলা। তৃতীয় হিমাচল-প্রদেশ সরকার। তাঁরও রাজধানী সিমলা। এঁদের মধ্যে কৌলীন্য আছে। ছোটো-বড় আছে। বিবাহের ক্ষেত্রে ছোটোর আদর বড়র চেয়ে বেশী। নবীনের আদর প্রাচীনের চেয়ে বেশী। সরকারী দৃষ্টিতে precedence এবং convention-ই হোলো নজীর ও কৌলীন্য। যে হিসাবে সিমলা নগরীর বড়কর্তা ভারত সরকার। তিনি এই তিনজনের মধ্যে সবার বড়, কেননা সবার আগের নায়ক। তারপর পাঞ্জাব সরকার। কিন্তু হিমাচল-প্রদেশ তো এই সেদিন জোড়াতালি মেরে দেশী রাজ্যকর্তারা রচনা করে ছেড়ে দিয়েছেন। ত্রিভুবন-ললামভূতা সিমলা নগরীকে যে এই সদ্যপ্রসূত শিশু-প্রদেশটি ভোগ করছে, সে শুধু অপর নায়কদের দাক্ষিণ্য বলেই। যেন ক্লিওপেট্রার শয্যায় তরুণ অক্টেভিয়াস্‌। জুলিয়াস যার নায়ক তার কোলে অক্টেভিয়াস্‌কে দেখলে জুলিয়াস তো হাসবেই। তাই হিমাচল-প্রদেশের মাতব্বরি দেখে ভারত

সরকারের সিমলাস্থ কর্মচারীরা তো হাসেই, পাঞ্জাব সরকারও হাসে। অবশ্য এই তুচ্ছতা কাগজে-পত্রে নয়, মনে ও ব্যবহারে। হাসাহাসি-কানাকানিও হয়।

সিমলার লোয়ার-বাজারটা নীচুস্তরের বাজার। মাল্-টা হোলো উঁচুস্তরের। অনেকে দেখেছি চুপিসাড়ে নীচের বাজার থেকে মাল কি'নে ওপরের বাজারে পায়চারি করেন। নীচের বাজারে আমার পরিচিত মনোহারী-দোকানদার লাক্কুরাম। দেখলেই নমস্কার করে। গম্‌গমে দোকান। লক্ষ্মীর বসতি ছিল। এখন হতশ্রী। লাক্কুরামও বুড়ো। অন্য দোকান—বাঙালী মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের (লক্ষ্মী ভাণ্ডার) অবাঙালী মালিক রামচরণ। আমি ডাকতাম স্ববাদে 'জ্যেঠামশাই' বলে। চমৎকার বাংলা বলতেন। অনেকদিন জানতাম না যে বাঙালী নন্। মারা গেছেন তিনি। দোকানে আছে নলিনী সরকার মশায় এবং নীলরতন সরকার মশায়ের প্রশংসাপত্র গণেশের ছবির সঙ্গে একসারে টাঙানো, আর তাঁর পোষ্যপুত্র 'গীতারাম'।

একটা ঘটি, কিছু লজেঞ্চুস ও চিউইং-গাম্ কিনে ফিরলাম একটা হোটেলের সন্ধানে। কিছু খাওয়া দরকার।

খাওয়া সেরে যখন ফিরছি তখন রাত্রি গভীর। নর-নারীর দল হাত ধরা-রি করে ইতি-উতি ঘুরছে। নিয়ন্-ল্যাম্প-উদ্ভাসিত পথ ছেড়ে এগিয়ে যাবার আগে হঠাৎ ভাবলাম যাই এই রাতে বেম্‌লোর খড্ডে, ভাট্টিখানার পাশে। াজ সেখান দিয়ে প্রশস্ত মোটর-পথ। আমি যখন প্রথম এই স্বপ্নময় রাজ্যে াসেছিলাম তখন এ-পাড়াটা ছিল পল্লীললনার ভীরু চাহনির মতো গভীর, নিভৃত ও মাদক সলজ্জতায় রসঘন।

পা নামছিল পথ ধরে। মন নামছিল বছর ধরে। পিছিয়ে গেলো বারোটি ছর। ১৯৪০ সালের জুন-মাসের বুকে।—

ওপারে তারাদেবীর পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বসে পড়লাম একটা পাথরের ওপর। এইখানে বারোবছর আগে বসেছিলাম দুজনে। আজ সমস্ত শহরটার প বদলে গেছে। একদিন সিমলার পথেঘাটে যে রূপ, যে ছটা দেখে ভেবে-লাম আভিজাত্যের চটুল এবং বাহ্যিক আড়ম্বর উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে ই শহরে, আজ সেই পথেঘাটে যেন নওরোজের কম্পিটিশন। নেই সেই

গরিমা এবং সম্পদ। আছে ডাকের সাজের ঝলমলানি। নির্লজ্জ লাস্যের কারবারী বিভ্রম।

হঠাৎ একটা গানের রেশ শুনতে পেলাম। নির্জন পথ। কে গান গাইতে গাইতে আসছে। সঙ্গে চিরপরিচিত ঢং-ঢং শব্দ খচ্চরের গলায় বাঁধা ঘণ্টা থেকে আসছে।

লোকটা মদ খেয়েছে। পাহাড়ে মদের চল খুব বেশী। সিমলা পার হয়ে হতো ভেতরের দিকে গেছি, পথের ধারে ধারে পানাগার। এরা গম চুইয়ে রস বার করে। ভারি প্রিয় এদের এই মদ। শীতের মধ্যে থাকে ছ'মাস। বরফে ঘরে বন্ধ থাকে তিনমাস। গরম হয় মদে ও মাংসতে। একসাথে দুটো-তিনটে পাঁঠা বা ভেড়া কেটে মাংস শুকিয়ে রাখে। সারা শীত বরফে বন্ধ থাকে যখন, তখন সেই মাংস রেঁধে খায়, আর খায় ঐ মদ। ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে খায়।

তাই মদ খাওয়া এদের অন্যায় বা অসামাজিক ব্যবস্থা নয়। লোকট একেবারে কাছে এসে পড়েছিল। আমায় চুপ করে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলো হাতে বাঁধা লাল ব্যাজে লেখা—'খাদরালা ইয়ুং ক্যাম্প'। তারপরে বললো—"জয় হিন্দ্!"

আমিও 'জয় হিন্দ্' বলে ওকে বসতে বললাম। বছর আঠারো বয়সে পাহাড়ী যুবক। খচ্চরের পিঠে বেঁধে নানা দ্রব্যসম্ভার নিয়ে গাঁয়ে চলেছে বললাম—"কী গান গাইছিলে? গাও-না।"

হাসতে হাসতে বললো—"বুঝবে পাহাড়ী গান তুমি?"

"বোঝাও। বুঝবোনা কেন?"

বেশ গাইতে লাগলো ছোকরা—

"ছোটো আমার পাহাড়
ছোটো তোমার খোঁপা
তোমার বুক-দুটোও ছোটো—
তোমার চোখের মতো আমার নতুন-কেনা আরশী
জাপানী আরশী—
যখন তুমি মুখ দেখবে
তোমার খোঁপা দেখবে

তোমার বুক দেখবে
তখন কেলুগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসব আমি
খুলে দেব তোমার খোঁপা
ভেঙে দেব আরশী
ঝাঁপাবো বুকে—
তুমি চেয়ে থাকবে আর
আমি চেয়ে থাকবো
তুমি রাগ করবে
আমি রাশি রাশি আরশী দেব তোমায়
জাপানী আর জার্মানী …"

একটা মাউথ-অর্গান বার করলো পকেট থেকে। বাজাতে লাগলো নানা সুরে। মদের নেশা ওর চোখে। প্রেমের বাণ ওর বুকে। ওর খচ্চরের পিঠে বাঝাই সোনার-পাহাড়—মায়াপুরীর ধনদৌলত! ও গান গাইলো আর-একখানা—

"গাঁয়ের মালিকের ছেলে
ভালবেসেছে আমার প্রিয়াকে
তার বাড়ী ঝর্ণাতলায়
গম পেষে তার জাঁতা
জাঁতা চলে জলের স্রোতে
পিষে দেয় সোনালী গম
গুঁড়ো কোরে করে সাদা
গুঁড়িয়ে দিয়েছে আমার সোনার গান
গুঁড়িয়ে গেছে আমার সোনার ফসল
গুঁড়িয়ে গেছে আমার সোনার স্বপ্ন
জাঁতার তলায় পড়েছে
একটা পাথর তোমার বুক
অন্যটা গাঁয়ের মালিকের রাশি রাশি ধনদৌলত
—সাদা হয়ে গেল
গুঁড়িয়ে গেল

আমার সোনালী প্রেম
তোমার ঝর্ণাতলার জাঁতায়।" ...

আমি অস্থির হয়ে পড়লাম ওর গানে। বললাম—"তুমি ভালবাসো বুঝি কাউকে? পীতম আছে তোমার?"

মদের নেশা ওর মনে, চোখে, আশায়।

ও বললে—"আমার পীতমকে আমি ঘরে এনেছি। সে আমার পথ চেয়ে বসে আছে।"

"তবে তোমার এতো বিরহের গান কেন?"

"জান না? সে চলে যেতে চায় 'পীহর'—বাপের বাড়ী।"

"তাতে কি?"

"তা তো জানোনা। তোমাদের দেশে মেয়েদের একটা বিয়ে। আমি গরীব। পীতম আমার বড়লোকের মেয়ে। তার খুড়ো তাকে আবার বিয়ে দিতে চায়। তাই আমার ভয় লাগে।"

কথাবার্তার মধ্যে যেন জলের ছোঁয়াচ লাগছিল। আমি বললাম—"পাগল তুমি! বোকা মেয়ে, নইলে তোমার মতো জোয়ান মরদকে ভালো না বেসে পারে? এমন ব্যবসা যার, এমন গলা যার? আমিই তোমায় ভালবাসি। নাম কি তোমার বৌয়ের?"

"ভীরা।"

"বাঃ, বেশ নাম। ভীরাকে বোলো তোমায় যদি সে শহরে যেতে দেয় নীচে, তোমায় চারটে বৌ দেব আমি। আর এই নাও—আমার উপহার তাকে—" ব'লে আমি কি আর দিই,—পকেট থেকে সিল্কের রুমাল আর একটা টিনের যতটা বাকী ছিল '৫৫৫' দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দেওয়া মিষ্টান্নগুলি।

এমনই বাতাস এ-দেশের। দিতে ইচ্ছে করে—আনন্দের পসরা ভাগ করে দিতে-নিতে সাধ যায়।

উঠলাম। একা একা ফিরতে লাগলাম। অতো রাত্রিতেও চার্চের পাশে বাগানের সারগুলোতে প্রকাণ্ড দালিয়াগুলোকে দেখে হিংসে হতে লাগলো। অসময়ের দালিয়া। আর সাদা-সাদা চন্দ্রমল্লিকাগুলোর ওপরে চাঁদের আলো পড়ে যেন ঝক্‌ঝক্ করছিল। উত্তর দিক থেকে বাতাস দিচ্ছিলো। পাইনের

পাতাগুলোর গান কুন্ কুন্ করে যেন ঝরে পড়ছে। অচেনা ফুলের গন্ধ চেনা-লোকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাড়ীতে যখন ফিরলাম দেখি একটি সপ্রতিভ ছেলে আমার বিছানার পাশে বসে ডায়েরি লিখছে। আমায় দেখে বললে—"বড় সাহস বেড়ে গেছে আমার—আপনাকে এই ঘরে দেখে। আমি ভাবলাম পাছে আপনি আমায় ছেড়ে চলে যান তাই আপনার বিছানা খুলে বিছিয়ে রেখেছি।"

দেখলাম সত্যিই পরিপাটী বিছানা পেতে রেখেছে। আমার টিনটা দিয়ে এসেছিলাম। ও একটা সিগারেট দিলো, আর দিলো পান।

দেখলাম ছেলেটি পান-প্রিয়।

নাম গোপী কুলশ্রেষ্ঠ। জাতিতে কায়স্থ। ইউ.পি.-র 'এটা' শহরে থাকে। ম্.এ. পাস করে এল্.এল্.বি. পড়ছে। চন্‌চনে মন—চক্‌চকে চোখ—ছিমছাম্ ফিট্‌ফাট্ যৌবনশ্রীতে গরীয়ান্।

"ভয় কেন তোমার গোপীভাই?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"জানেন না? ওধারের বাড়ীটায় কিছু ক্যাম্পার আছে। ওখানেই ড়রা আছে। আপনি তো অ্যাড্‌ভাইসর। ভাবলাম ডাইরেক্টরের সাথে াকবেন।"

হেসে, স্যুট ছেড়ে স্লীপিং-স্যুট পরতে পরতে বললাম—"এখানে আমরা বাই ক্যাম্পার। সবাই একবয়সী—এক-ধরনের কুলী। এখানে আবার ড়-ছোটো কি?"

ছেলেটি অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললো—"বড়-ছোটো আছেই। আজ সছেন, দেখবেন শেষ অবধি অনিচ্ছাতেও আমার সঙ্গ আপনাকে ছাড়তে বে। মতবাদ আর ব্যবহার এক জিনিস নয়।"

শুয়ে পড়লাম অন্য কিছু না ব'লে।

৪ঠা জুন সকালবেলা—আজ খাদরালায় রওনা হব।

বিউগ্‌ল্ বাজলো যখন—তখন সাড়ে ছ'টা। জিনিসপত্র নিয়ে ছেলেরা ড়ো হোলো বাসের ধারে। সারি সারি ছ'খানা বাস ও একখানা জীপ্। াসের গায়ে গায়ে আমাদের নিশান বাঁধা। লাল কাপড়ের গায়ে লেখা রাজী সাদা অক্ষরে *Khadrala Youth Camp*। তখন আবার দেখলাম

মালপত্রের পাহাড়। গাড়ীর ছাদে তুলতে বেশ বেগ পেতে হোলো। শেষ অবধি একটা ট্রাক-এর ব্যবস্থা করা হোলো মালের জন্য।

এখানে পাহাড়ী রাস্তার কথা একটু সেরে নেওয়া যাক্। পাহাড় কেটে-কেটে কোনোওমতে সাত ফুট থেকে বারো ফুটের রাস্তা। কিন্তু কাটার পরেও ওপরে পাথর ঝুলে থাকে। তখন কুরে কুরে একধারের দেয়ালেই বলা যাক্ বা পাহাড়ের গায়েই বলা যাক্, একটা ঘোড়ার পায়ের নালের আকারে গর্ত করা হয়। কাজেই ওপরটা মাথার ওপর ঝুলতে থাকে যেন সাপের ফণার মতো। অন্য ধারটা গভীর খাদ।

খুব উঁচু করে গাড়ীর ছাদে মাল নিলে সেই ঝোলা-পাহাড়ে লাগে এবং বিশেষ করে মোড়ে পাক নেবার সময়ে টাল সামলানো যায় না। তাতে আবার পাহাড়ে বৃষ্টি লেগেই আছে। পথ পিছল থাকে—চড়াইয়ের সময় পিছল-পথে skid করার দায় আছে। এ ছাড়া landslide তো আছেই। বাসে যাওয়া মানে সুখে যাওয়া মোটেই নয়। পাহাড়-পথে সবচেয়ে সুখ হাঁটায়, তারপর ঘোড়ায়, তারপর বাসে। মানুষের পিঠে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার নেই, এবং না-হোক্। বাসে চড়ার একটা বড় সার্থকতা পরিশ্রম বাঁচে এবং মাল নিয়ে যাওয়া যায়। এ ছাড়া তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। এর জন্য যে-পরিমাণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তার তুলনায় পদব্রজে যাওয়া অনেক নিরাপদ।

পাহাড়ী পথে তাড়াতাড়ি যাওয়ার কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাইনা। তাড়াতাড়ি অর্থে আমি মোটরের বা ট্রেনের গতির কথা বলছি। শহর, সমতল, আরাম ছেড়ে টাকাকড়ি খরচ করে পাহাড়ে চলার একমাত্র উদ্দেশ্য নবতর আনন্দ ও রসের অনুসন্ধান। হেঁটে গেলে সেই আনন্দ ও রস যেন কিছু কিছু করে আস্বাদন করা যায়। গতিপথে পদে পদে অজ্ঞাত তার আতিথেয়তা জানায়। পথের ধূলি ও শিলা, উপল ও জীর্ণপত্র এরা যেন পরিচয় এনে দেয় সেই দেশের ও দেশবাসীর। প্রতিটি পাহাড়ের অলক্ষিত আবর্তে লুকিয়ে আছে আগন্তুকের জন্য বিস্ময়, তার চোখের জন্য সুষমা, তার শ্রবণের জন্য কাকলী, তার গন্ধের জন্য সৌরভ—সবই অপরিচিতির, অনাস্বাদিতের রোমাঞ্চ-বিলেপিত। শ্রম-মদালসে শ্লথগতি পথিক যখন শিলাতলে নিকুঞ্জছায়ায় ব'সে পড়ে তখন তার সেই তৃপ্তির বর্ণনা নেই। পা থেকে মাথা অবধি রক্তকণিকার চঞ্চল শিহরন ও কলিত গুঞ্জন

যেন অনুভব করা যায় 'ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে'। দারুণ শীতের মধ্যে সেই পরমকামিত দেহতাপ মনে করিয়ে দেয়ঃ "আমি জীবন্ত, স্ফুটন্ত ;—বীজ হতে মহীরুহ, মহীরুহ হতে বীজ—আমার ক্ষয় নেই, শেষ নেই, লুপ্তি নেই ; আমি অজর অমর।"—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে

ঝতে পারা যায় যে, যাঁরা ব্রহ্মরসাস্বাদন করে গেছেন তাঁরা সব পাহাড়ে এসেছিলেন এবং পদব্রজে অতিক্রম করেছেন গিরিপথ। ...

রওনা হ'লাম তখন ঠিক সাড়ে ছ'টা। এখান থেকে সোজা পথ গেছে থিয়োগ্ পর্যন্ত। পীচ-ঢালা বাঁধানো পথ। সিমলার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহর না হ'লেও, পাহাড়ের শ্রী সিমলার পাহাড়ের মতোই। সকালে রোদ উঠেছিল ব'লে চারিধার ঝলমল করছিল। সিমলা থেকে প্রথমে সঞ্জৌলী; এখানে টোলের পর টোল, কোনোটা পাঞ্জাব সরকারের, কোনোটা হিমালয় সরকারের, কোনোটা ভারত সরকারের। সঞ্জৌলীতে একটি শ্মশান ও একটি কালী পাগ্‌লা-কালী নামে খ্যাত)-মন্দির আছে। এখন সঞ্জৌলী দিব্যি বসতিপূর্ণ। আগেকার মতো নির্জন বৈরাগ্যে সমাহিত নয়। সঞ্জৌলী থেকে পথ গেছে মশোব্রা। মশোব্রা পৌঁছাবার আগেই পথ গেছে তিব্বতের দিকে বেঁকে ; উত্তরে পাহাড়ের উপর চড়াই ; মশোব্রার রাস্তা পশ্চিম ঘেঁষে উৎরাই।

খাড়া চড়াই চড়তে লাগলো বাস। আটটায় পৌঁছলাম barrier—সেই থিয়োগ, আগে করদ রাজ্য ছিল, এখন হিমাচল সরকারের। শেষ তারঘর এইখানে। স্কুল, থানা সবই আছে। আর আছে দুধ, জিলিপি আর চায়ের দোকান। বাজারটা বেশ বড়।

গরম দুধ ও জিলিপি খেয়ে নিলাম। একটি ছেলে,—নাম পরে জেনেছিলাম গোপালকৃষ্ণ অগ্রওয়াল—শুকনো-মুখে দাঁড়িয়ে। বললাম—"এসো—খাও।" কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে—"আর খাবো স্যার, খাওয়া আমার মাথায় উঠে গেছে। আগাগোড়া রাস্তাটা বমি করতে করতেই মরেছি!"

"শুধু তুমি না আরও আছে?"

"আমাদের বাসের সবাই।"

বললাম—"বেশ, এসো জিলিপি খাও, তারপর দাওয়াই দেবো। খালি-পেটে থেকোনা, আরও কষ্ট হবে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেটি খেলো। খাবার পর বেশ খানিকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলো।

তারপর আমার থলের ভিতর থেকে দাওয়াই যা দিলাম তার চক্ষুস্থির। "অ্যাঁ! বলেন কি? এ-যে নিমের দাঁতন?"

আমি বললাম—"এখন ও আর নিমের দাঁতন নয়, দাওয়াই। একটা নয়, ত্বটো রাখো তুমি। যতক্ষণ বাসে থাকবে, চিবিয়ে যেয়ো। বমি হ'লে তখন সংবাদ দিয়ো।"

খানিক বিস্ময়ে, খানিক অপ্রত্যয়ে গোপালকৃষ্ণ মোটের ওপর দাঁতন ত্বটো নিলো। ব্যবহারও করেছিল; পরে জানিয়েছিল যে ও আর বমি করেনি।

থিয়োগের আর একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে না করে পারবো না।

Barrier-টা খোলেনি, খুলতে দেরী আছে। আমরা পাহাড়ের যে-পাশটায় দাঁড়িয়ে সেটা পশ্চিম-দক্ষিণ দিক। রোদ উঠেছে। পশ্চিম দিকে খাদ, তারপর অন্য পাহাড়। ও পাহাড়টার গায়ে রোদ পড়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ক্ষেত—ধাপে ধাপে কেয়ারী করে সাজানো। ছবির মতো গ্রামগুলো দেখা যাচ্ছে। একদল পাখী মাঝের জায়গাটাতে ক্রমাগত পাকই খাচ্ছে আর পাকই খাচ্ছে। রাগ হচ্ছিল ঐ পাখীগুলোকে চিনতে পাচ্ছিনা ব'লে। এদিকে মন একেবারে পানকৌড়ির মতো ডুব মারছিল রসের সরোবরে।

সহসা মোড়ের মাথায় একটি আদি ও অকৃত্রিম চেহারা চোখে পড়লো বয়স ষাটের কাছাকাছি বোধহয়। চেহারা থেকে চেপেচুপে পেন্সন আটকে রাখার হেঁচকা হয়তো চলছে তলে তলে জানিনা। এমন লোকেরা দাড়ি-গোঁফ রাখতেও ভরসা পাননা, খালি-মাথাতেও বড় থাকেন না। লোকটির মুখ দিব্যি কামানো, ঈষৎ ছোঁয়াচ আছে গোঁফের—সেটুকু নাকের তলায়। বোধকরি ব প্রতিবেশীদের ত্বর্দশা দেখে যে-ক'টা কর্তন থেকে রক্ষা পেয়েছে সে-ক'টা মুখগহ্বরে ঢুকে প্রাণ বাঁচাতে চায়। মাথায় বেনেলী কালো বনাতের টুপি। তার ওপর দিয়ে কম্ফর্টার জড়ানো। হাতে পরিপুষ্ট লাঠি, পরনে গলাবন্ধ কোট আর প্যাণ্ট—ত্বটোই পুরোনো হ'লেও দামী সার্জের। গালের ভাঁজ, চোখের দৃষ্টি

নাকের ডগার গোলত্ব, সর্বোপরি ঐ কম্ফর্টরটি আমায় শ্রেফ মনে করিয়ে দিলো বাংলার মাটি।

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"বাঙালী, নয় ?"

তারপরেই বুঝে নিয়ে বললাম—"আমিও বাঙালী।"

বলা নিরর্থক; কিন্তু গলার মুরুব্বিয়ানাটুকু ঢাকবার জন্য এই ন্যাকামিটুকু করলাম।

ভদ্রলোক লাঠির উপর হাতটি রেখে পা দুটো ফাঁক করে একটা সিগারের ঠ্যাং চুষতে চুষতে দৃষ্টিটুকু মেলে ধরলেন দেওদারগাছের টিকির দিকে;—একটা পা সামান্য একটু নড়তে লাগলো, যাতে প্রকাশ পাচ্ছিলো ওটা উনি চব্বিশ-বছরের যুবকের মতো নাচাতে চান।

"আপনি বুঝি থিয়োগেই থাকেন ?"

নাছোড়বান্দা আমি। সুধাদার কাছে শিক্ষানবিশী করেছি—কথা না বলিয়ে ছাড়বো না। যাকে বলে 'মূকং করোতি বাচালং'।

এক সিলেবেলের জবাব—"না।"

কৌতুক হোলো; বললাম—"আমিও থাকিনা।"

ভদ্রলোক কি যেন বুঝলেন;—আপাদমস্তক আমায় দেখে বললেন—"কোথায় থাকা হয় ?" 'আপনি' বলতে বাধলো, 'তুমি' বলতে বোধহয় সাহসে কুলোয়নি।

আমি বললাম—"দিল্লী।"

"ও-ও-ও !!" ভ্রূ দুটো নাচলো। কপালের চামড়ায় কোঁচকানি লাগলো। "দিল্লী ? দিল্লীতে কি করা হয় ?"

"মাস্টারি করি।" বললাম সংক্ষেপে। ভ্রূ আরও নাচলো; কপালের চামড়া আরও কোঁচকালো।

এবার লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে ভদ্রলোক বললেন—"তোমার আবার এ দুর্বুদ্ধি কেন ? এদের সঙ্গে তুমি কেন ?"

মিথ্যা বিনয়ে নুয়ে পড়ে নববধূর মতো বললাম—"দুর্বুদ্ধি থাকলেই খেসারত দিতে হয়।...আপনি বুঝি কাজে এসেছেন এখানে ? ব্যাবসা-ট্যাবসা কিছু ? এখানে তো আলু আর নুনের ব্যাবসা প্রচুর।"

চুষলেন সেই সিগারের বাঁট। তার পশ্চাদ্দেশে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে

গুঁতুলেন। বার কয় থু-থু করলেন। তারপর 'বপ্' 'বপ্' শব্দে আবার ধরাতে গিয়ে বাঁধানো দাঁতটা পড়ে যায় আর কি!

"তোমার দুর্বুদ্ধি, আমার দুর্যোগ। নৈলে আজ আমার এই নরক ভুগতে আসা।"

"নরক? নরক বলছেন আপনি? এমন স্বর্গীয় রমণীয় জায়গা? এলে তো নবজীবন লাভ হয়।"

শাঁসেজলে ভর্তি হাসির নিঃশব্দ গমক চোখে, ঠোঁটে, গোঁফে ফুটিয়ে বললেন—"অনেক স্বর্গ দেখেছি। এই সিমলাতেই থাকি। কাজ করলাম চিরকাল খবরের কাগজে—কতো ঘুরলাম, কতো দেখলাম। এখন কি আর সয় এসব? কোথায় আরামে বসে এখন দু'চারটে 'কলাম' লিখব, দু'দশটা দেখব, তা নয় এখনও কি চলে?"

সর্বনাশ! একেবারে খবরের কাগজ! নাঃ, বেফাঁস কিছু বলা-কওয়া যাবেনা তো। ঢাকে কাঠি দিয়েই চুপ করে বসে বসে গমক শুনতে হবে।

"কী কাগজ? *Statesman*?"

চটিতং ভাবে—"ট্যাঁশদের কাগজ জীবনে ছুঁইনি।"

বললাম—"ও, *Hindusthan Standard* দিল্লীতে শাখা বিস্তার করেছে—তারই বুঝি?"

"ও তো সেদিনকার কাগজ। আমি লাহোরের—কাগজ। স্বনামধন্য 'ক—' বাবুর কাগজ। নাম শুনেছো তো। তাঁর নামে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেতো।"

বাঘ ও গোরু দুই-ই শুনলাম ও দেখলাম। বললাম—"এখন আপনারা বুঝি সিমলেয়?"

"হ্যাঁ, কর্তারা তো দিলেন দফা পুঁচিয়ে সাবড়ে। একঘায়ে ভারতবর্ষ খান-খান। নাদির পারেনি, গজনী পারেনি, আবদালী পারেনি,—এঁরা একেবারে আঁশবঁটি দিয়ে কাটলেন তো একেবারে কচুকাটা। তারপর মর্ শালারা। সেই তাগ্ড়া প্রেস নিয়ে কি নড়াচড়া যায়? সব ফেলে চলে এলাম। এই সেদিন লাখ দুই টাকা দিয়ে প্রেস কেনা হয়েছে।"

"আপনি বুঝি আমাদের এই অভিযান 'কভার' করতে চলেছেন?"

মুখ ফিরিয়ে বললেন—"আসতাম নাকি? ভাবলাম, যাচ্ছে ছেলেদের দল—দেখিই না মজাটা। কোদাল ধরে, না বিছানা ধরে।"

"এ কথা বলছেন কেন?"

"জানোনা তো এদেশের আবহাওয়া। আমি ঘুরেছি এসব দেশ। এই Election-এর সময় কম ঘুরেছি? Interior হ'তে interior-এ কতো গ্রাম, কতো জঙ্গল। রোঢ় যেয়ো। পথে একটা নদী পড়বে—মাছ হাতে ধরতে পার। চমৎকার। তা নয়, চলেছো খাদরালা। ভীষণ জঙ্গল সে। লোকজন ভয়ে যায়না ত্রিসীমানায়।"

"যাক্ আপনি চলেছেন যেকালে—দু'চার দিন কাটবে ভালো। আরও সাংবাদিক আছে নাকি?"

"হ্যাঁ—তা বলতে! আলুর গুদামে আগুন লেগেছে। কুড়ুবার লোকের অভাব?"

"কারা?"

বিরক্ত হয়ে বললেন—"ঐ তো শ্রীদ— এসেছে, কংগ্রেসের প্রচার-পত্রের সাংবাদিক—ঐ তো শ্রীজ— এসেছেন ভারত সরকারের তরফ থেকে—তা ছাড়া শুনছি আমেরিকান দু'চারটে আসবে। তা আসবে। এমন তামাসা লেগেছে আসবে না আর!" ব'লে নিজের রসিকতায় নিজে খুব হাসতে লাগলেন।

"আপনি যাচ্ছেন কোন্ গাড়ীতে?"

"আমি?—আমার গাড়ী সিমলাতেই। কে এখানে আনে মশায়! রাস্তার কি কোনো ঠিক আছে? আমি এলাম ঐ জীপে।"

এমন সময়ে ডাইরেক্টর আস্থানা এসেই বললেন—"প্রিন্সিপ্যাল-সাব, একবার চলুন, মহারাষ্ট্র-দলের দুটি ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

আমি ছোট্ট একটি নমস্কার করে চলে এলাম।

খানিক পরেই বাস ছাড়লো। আমি বসলাম গিয়ে মহারাষ্ট্র-দলের গাড়ীতে। ওদেরও মাথা ঘুরে বমি হচ্ছিল। সকলকে একটা করে চিউইং-গাম দিলাম। বললাম—"আপাততঃ এই, তারপর দেব লেমন্স্ ড্রপ্।"

সমস্বরে সব চিৎকার করে উঠলো—"থ্রি চিয়ার্স ফর্ মাস্টার-সাব—হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে!"

এর পরেই এলো হিমালয়ের বুকের স্বপ্নরাজ্য। পরতে পরতে খুলতে লাগলো তার অবগুণ্ঠন—যতো খোলে ততো অনির্বচনীয়, ততো বিস্ময়, ততো অপরূপ। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে মানুষ-মায়ের লালন-ললিত স্পর্শ। পাহাড়ের বুকে সাড়া লেগেছে। প্রাণস্পন্দন উঠেছে কেঁপে। তৃণে তৃণে যার রোমাঞ্চ, লতায় শাখায় যার আলিঙ্গন, পল্লবে পল্লবে যার উল্লাস,—যার প্রাণের গভীরতা গিয়ে পৌঁছায় ধরণীর গভীরে, শিকড় হ'তে শিকড় বেয়ে যার পুলক বয়ে নিয়ে যায় আলোর দেশের মিতালি অন্ধকারের গহনে, সূর্যের বার্তা তমোলোকে,—সেই জীবসত্তা, সেই বনবাণী যেন আঁচল বিছিয়ে বসে আছে মাইলের পর মাইল ব্যেপে। ঐ ক্ষেত্রগুলিতে, ঐ কুটীরের পর কুটীরে, ওই দেবদারু-কম্পিত ছায়ালোকে যে মা, যে বোন, যে কিশোর-কিশোরী আজ নীড় রচনা করেছে তাদের আমি নতি জানালাম।

এই দেখা যেন গান গেয়ে উঠলো অবচেতন লোকে। সেই সঙ্গীত আমার চৈতন্যলোক হতে ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলো—

"জেনেছি—সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধ রূপ। ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবের তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী, দিলে তারে পরম সম্মান,—"

মনে পড়লো কবির প্রণামের ভাষা—

"অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে অপক্ক ধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে গেয়ে যায় অকথিত এই বাণী
'আমি আনন্দিত' " ...

আমার বেলায় উদয়সূর্যই এই বাণী এনে দিলো।

কোথায় জুন মাস, আর কোথায় এই কিশোরীর চাহনির মতো নরম মিঃ রৌদ্রতাপ। বসন্তের ভারহীন বাতাসে ভেসে বেড়ায় প্রজাপতি। কোথাং

উঁচু খাড়াই, কোথাও পথ নীচে গড়িয়ে গেছে। সতর্ক চালক নিয়ে চলেছে গাড়ী। এই ছায়ায় ঢাকা পথ চলেছে; পাহাড়ের গা চুয়ে-চুয়ে বেয়ে পড়ছে জল; আশেপাশে সবুজ শ্যাওলা, অজ্ঞাত লতাবিতান। এই আবার খরচঞ্চল রৌদ্রতরঙ্গ নেমে গেছে ধাপে ধাপে খাদে খাদে আলোছায়ার আঁচল দোলাতে-দোলাতে।

আগাগোড়া পথে প্রায় আধ মাইল অন্তর এক-একটি কনেস্টবল দাঁড়িয়ে আছে। সেলাম ঠুকছে। চোখে সন্ত্রস্ত চকিত ভাব। জানেওনা কারা আসছে, কেন আসছে। আদিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথে। আর দেখলাম মাঝে মাঝে কুলী-গ্যাঙ কাজ করছে। এক একটা গ্যাঙে পাঁচ থেকে নিয়ে দশ-এগারো জন পর্যন্ত কাজ করছে। মেয়ে নেই একটাও ঐ দলে। ছোটো ছোটো দশ-বারো বছরের ছেলে আছে। মাথায় তাদের লালরঙের গান্ধী-ক্যাপের আকারের টুপী। সরকারী গ্যাঙের কুলীর পরিচয় ঐ লালটুপী।

জানতাম হিমাচলপ্রদেশের রাজ্যপাল বাগী আসবেন আমাদের যাত্রাপথকে আশীর্বাণীতে পূত করার সদুদ্দেশ্য নিয়ে। জানি হিমাচলপ্রদেশের সরকারের তরফ থেকে খানা পাব আমরা নারকাণ্ডায়। জানি যে এইসব রাষ্ট্রনায়কেরা ও শাসকেরা আজ গতিবিধি করবেন ও করেছেন ব'লেই পথে পুলিশ মোতায়েন —আমাদের জন্য নয়। তাই আমাদের দিক থেকে নীরবে এই অভিবাদন নিতে আমার বাধছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে এরা তো জানতে পারছেনা আজ আমাদের এদের দেশে আসা শাসিত-শাসকের সম্বন্ধে নয়। এমন কি, অতিথি ও গৃহস্থের সম্পর্কও নেই আমাদের মধ্যে। এ আয়োজন, এই সম্মান যে-সব দেবতাদের প্রাপ্য আমরা তারা নই। আমরা ওদেরই মতো মানুষ। পারব কিনা জানি না, কিন্তু মনে মনে তীব্র বাসনা যে, এই একটা মাস অন্ততঃ আমরা সত্যিকার কুলীর পর্যায়ে থাকতে চাই, মিশতে চাই। মনে পড়লো হিম্মৎসিংজী যখন বলেছিলেন—"খাদ্য যা তোমরা পাবে তা শুধু কুলীরই খাদ্য। আর বেশী কিছু নয়।" শুনে বড় ভালো লেগেছিল।

প্রত্যহের সবগুলি প্রয়োজনীয় ভারের বোঝা পিঠে বয়ে নিয়ে, ঘরের আরামকে বাইরে চালান করে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা নিয়ে যারা অভিযানে বের হয় তাদের আমি চিনিনা, চিনতে চাইনা। অভিযান মানে আমি বুঝি পিঠের ঝোলা আর হাতের লাঠি, এর বেশী কিছু নয়। তা ব'লে আমার

ট্রাঙ্ক ও বিছানা যে সবার ছোটো ছিল মোটেই নয়। বরং বেশী ভারই ছিল তাতে। তার প্রথম কারণ যে আস্থানাসাহেব এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছিলেন নিয়ে যেতে হবে ব'লে ; দ্বিতীয় কারণ আমার বই ও লেখার সরঞ্জাম। তবে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, আমি একটি প্যাণ্ট ও গায়ে আঁটা গেঞ্জী, শার্ট, পুলওভার ও একটি চামড়ার জারকিনের ওপর দিয়েই প্রায় সারা অভিযানটা কাটিয়েছি।

এমনটি না হ'লে এই দেশে এসে এদের সঙ্গে মাখামাখি করা যাবেনা। তাই মনে মনে ভাবতে লাগলাম কি করে চলন্ত বাসে থেকেও এদের সাথে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। কি করে ওদের ও আমাদের ভেতরকার দেয়ালটা ভেঙে দেওয়া যায়।

হঠাৎ ব'লে উঠলাম—"জয় হিন্দ্।"

গাড়ীর সবাই বললো—"জয় হিন্দ্।"

ব্যস্, দূর থেকে পুলিশ দেখি আর বলি 'জয় হিন্দ্'—তাড়াতাড়ি পুলিশটা বলে 'জয় হিন্দ্'—তারপরেই একগাল হাসি। গ্যাঙের লোক দেখলেই সবাই চিৎকার করি 'জয় হিন্দ্'—ওরা খুশীতে গেয়ে ওঠে 'জয় হিন্দ্'। ওরাও সেলাম করে, আমরাও সেলাম করি।

এতোক্ষণে মাতামাতি পড়ে গেল যেন। বাসের ছেলেগুলো যেন খুঁজে পেলে জীয়নকাঠি। একজন স্লোগ্যান ধরলো—"করেই ছাড়বো—তিব্বত রোড"; "করকে ছোড়েঙ্গে—তিব্বত রোড"—জানলো ওই কুলীর দল, ভ্রাম্যমাণ পথচারী, দূরাগত বণিক্, গোয়ালিনী, চাষী—সবাই ; চলেছে হিন্দুস্থানের ছেলের দল—রাস্তা তৈরী করতে। তাদের চোখে চঞ্চলতার তুফান, মনে অদম্য সাহস ও নিষ্ঠা, কণ্ঠে আশার বাণী, অন্তরে মিশে যাবার ব্যাকুলতা। ওরা যেন ভায়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে এ-দেশের বুকে। এতোটা স্বপ্ন, এতোটা কল্পনা করতে সাহস আমার হ'তনা—যদিনা ওদের পাল্টা চিৎকারে, ফিরিয়ে দেওয়া হাসিতে, ফেলে আসা কলগুঞ্জনে এই অপূর্ব মন-দেয়া-নেয়ার সাক্ষ্য পেতাম।

অল্পদিনেই এর আরও প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলাম।

এর মধ্যে তখন আবার ধরা হ'ল মীরার ভজন—"যোগী মত্ যা—মত্ যা" —আর গুজরাতের বিখ্যাত ভজন—"বৈষ্ণব জনতো তেনে কহিয়ে";—সারা দলটাই গাইতে লাগলো।

এমনই অপরূপ দৃশ্য তখন চারধারে। যা দেখিনি, যা ভাবিনি, তেমনি দেখা ক'বার গ্যাখে মানুষ। সবুজের যে এতো রং এতো শোভা কে জানতো আগে? তার ওপর পাহাড়েরই বা কতো রং! পাহাড় তো বর্ণের রাজ্য শুধু—ওপরে নীল, বুকে সবুজ, গায়ে গায়ে রামধনু, ফুলে ফুলে নানান্ বর্ণ, জলের রেখায় চাক্‌চিক্য—সবই যেন তুলির কাজ। বাঁশী এখানে বাজেনা, বীণা এখানে নীরব।

হয়তো বা বাসের ইঞ্জিনই রাহুর মতো গ্রাস করেছে সুরের চাঁদকে। তা যদি হয়, গ্রাসমুক্ত হব। তখন শুনবো সুর।

ক্যামেরাওলারা ক্যামেরা ফিট্ করতে লেগে গেছে। বাসওলাকে বলে—"একটু থামাও ভাই, মেরে নিই একটা শট্।"

বাসওলা রসিক। জবাব দেয়—"ক'টাই বা ফিল্ম এনেছো। সামলে রাখো। যে রাজ্যে যাচ্ছ তার কাছে এসব আশীবছরের বুড়ী!"

হাসাহাসির রব পড়ে যায়। বেশ বলেছে ছোকরা।

এমনি করতে করতেই নারকাণ্ডা।

নারকাণ্ডায় চমৎকার ও প্রশস্ত এক ডাকবাংলো।

ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ে নিশানা-দেওয়া ফলক—৯,৩০০ ফুট—আর *To Tibet* একদিকে, উত্তর; *To Rampur* অন্যদিকে, পশ্চিম।

ছেলেরা হুড়মুড় করে নেমে পড়লো।

বিউগ্‌লার ছেলেটি ভারি মজা লাগিয়েছিল। খাস আমেদাবাদে ওর বাড়ী। বিড়ির ব্যাবসা করতো ছোকরা—মস্তবড় ওর ব্যাবসা। সেবার কাজ করার জন্য এতো খ্যাতি যে, আমেদাবাদ কংগ্রেস থেকে ওকে পাঠিয়েছে।

কুচ্‌কুচে কালো রং, লম্বাটে চেহারা, গলার টুঁটিটা কোণ বার করে উচিয়ে আছে, ঘ্যানঘ্যেনে স্বর, হেসেই আছে সারাক্ষণ, পরনে পুরোহাতা খাকী শার্টের হাতা উল্টে কনুই অবধি ভাঁজ করা, তার ওপরে সোয়েটার এবং কোট আর খাকী হাফ্‌প্যাণ্ট। নাম—পটেল, বাকীটা ভুলে গেছি, কারণ সবাই ডাকতাম বিউগ্‌লার ব'লে।

মজার কথাটা এই যে, ও মোটেই ইংরাজী জানতো না, অথচ মোটামুটি আন্তঃপ্রাদেশিক কথাবার্তা আমরা ইংরাজীতেই চালাচ্ছিলাম। বিউগ্‌লার

গোপন করেনি। ও সরলভাবেই জানিয়েছে যে ও ইংরাজী জানেনা। কিন্তু আস্থানা-সাহেব বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেই ইংরাজী বলতে থাকেন। এবং তখনই হয় কৌতুকের সৃষ্টি। আস্থানা ইংরাজীতে আদেশ দেন, আর বিউগ্‌লার নিজের বুদ্ধিমতো বাজিয়ে যায়। বিশেষ গোলমাল দেখলে কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করে নেয়।

আস্থানা ওকে একত্র হবার বিউগ্‌ল্‌ দিতে বললেন। ও দিলে যথেচ্ছ ভ্রমণের বিউগ্‌ল্‌। ছাড়া পেয়ে ছেলেরা যে যেদিক পানে ইচ্ছা দৌড়তে লাগলো।

রাগ করতে লাগলেন আস্থানা। ইংরাজীতে তড়্‌বড়্‌ করে বকে যেতে লাগলেন।

যেন কতো ভুল করেছে এমনি করে ও শুনে যেতে লাগলো সবিনয়ে।

আস্থানা আবার বললেন ওকে একত্র করার তূর্যধ্বনি করতে।

যখন ও বাজিয়ে দিলে তখন আমি গোপনে জিজ্ঞাসা করলাম—"এবার বুঝলে কি করে পটেল?"

হাসিতে নুয়ে পড়ে বললো—"আগেরটা ভুল করেছি তাতেই বুঝলাম। হ্রস্ব-ই নইলেই দীর্ঘ-ঈ।"

বললেন আস্থানা—"বাসন বেশী নেই। ত্রিশজনার দল করে খেতে যেতে হবে।"

হিমালয় সরকারের তরফ থেকে খাওয়া। ভালোই। ছোলার দাল, ভিণ্ডির 'শুখা', এবং আলু ও টিণ্ডার রসাদার। চাটনী ও লুচি। এর চেয়ে আর কি রাজভোগ পাব ৯,০০০ ফুটের ওপরে।

আমি অবশ্য পেছনের বাবুর্চিখানায় গিয়ে দেখে এসেছিলাম দুটো মুর্গী জবাই হ'ল। সেটা বড়কর্তাদের জন্য।

নারকাণ্ডা জায়গাটা বড় একটা বাজার। এখান থেকে রামপুর হয়ে কাশ্মীর পর্যন্ত পথ গিয়েছে। সামনেটায় মস্ত একটা উপত্যকাকে ঘিরে বড় বড় পাহাড়ের সার। খুব উঁচু কিন্তু বরফ নেই। সাদা সাদা মেঘের দল এলোমেলো উড়ছে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তা থেকে নীচে। অর্থাৎ আমরা মেঘের পিঠ দেখতে পাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি ঐ মেঘ ধরণীর বুকে যে-ছায়া ফেলছে।

এদেশের চীফ-ইঞ্জিনীয়ার এখানে আমাদের এক দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিলেন পাহাড়ে রাস্তা করার কী প্রয়োজনীয়তা, এবং সেটা করতে মানুষিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ছাড়াও দক্ষতা ও নিপুণতার ব্যবহার কী মাত্রায় পরিহার্য।

আবার সব রওনা হলাম। পরের হল্ট্—বাগী পর্যন্ত। নারকাণ্ডা থেকে বাগী, একখানা জীপ যাত্রী নিয়ে কোনোক্রমে যাতায়াত করে মাত্র। বাসের পথ নেই। তবু আমাদের বাস চললো। কিছুদূর যেতেই দেখা পেলাম হিমালয়ের জঙ্গল। সে যে কী বিরাট জঙ্গল আর কী ভয়াবহ তার কথা এখন বলবোনা। পরে এই ভীষণ জঙ্গলের কথা বলার অবসর ও অবকাশ অনেক পাবো।

এখন শুধু প্রথম প্রণাম রাখলাম এই বিরাট বনভূমির পায়ে। আগাগোড়া রাস্তা ছায়া-সুনিবিড়, ভিজে, পচা পাতার গন্ধে ভরা। এতক্ষণ অন্যধারে খাদের ঢালটা ও তারপর পর্বতান্তর দেখা যাচ্ছিল। এখন আর কিছু নাই। এধারে বিরাট বৃক্ষ তো, ওধারে বিরাট মহীরুহ,—এধারে মহীরুহ তো, ওধারে বনস্পতি এমনি শাখায়-প্রশাখায় জড়িয়ে উঠে গেছে গভীর একটা জগৎ—যার মধ্যে শতসহস্র জীবন জন্মাচ্ছে, বাড়ছে, মরছে, হাসছে, খেলছে, যুদ্ধ করছে।

এমন সবুজের মধ্যে ডুবিনি জীবনে। এমন সরসতা, এমন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর সংগ্রামের বিজয়তোরণের বৈজয়ন্তী সমাবেশ, এমন স্নিগ্ধ অথচ কঠোর, জীবন্ত অথচ অনড় রাজ্য আমার অভিজ্ঞতায় নেই।

"… মৃত্তিকার হে বীর সন্তান
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হ'তে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়;
দুরন্ত শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যান-লিপি লিখে দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ। …"

আত্মভোলা মনে ব'লে চলেছি; চোখ মেলে দিয়েছে পাখা, শাখায় শাখায় রচনা করা নীড়ের মধ্য দিয়ে তার গতি। হঠাৎ পাশের ছেলেটি বললো—"কি ব'লে চলেছেন স্যার? ট্যাগোর?"

হেসে বললাম, "হ্যাঁ।—বুঝলে কি করে?"

"এমন দেশে এলে জাতীয় কবিকে মনে পড়ে। আমরা বলি সে-ভাষা কৈ! ট্যাগোর নিশ্চয় জঙ্গলের ওপর কবিতা লিখেছেন? নিশ্চয়, যেরকম sublime subject!"

বাগী এলাম তখন দেড়টা হবে। ছোট্ট একটা জায়গা। ডাকবাংলো আছে একটা। সেখানে আমরা সার বেঁধে দাঁড়ালাম। বিউগ্‌লারের রকম দেখে রাজ্যপাল হিম্মৎসিংজী হাসতে লাগলেন—যেন Falstaff-এর সৈন্য—ডাইনে বললে বাঁয়ে, দাঁড়াতে বললে দৌড়য়। শ্রীমতী ইন্দিরাও হাসিতে যোগ দিলেন।

ছেলেরা বুঝছিল ভুল হচ্ছে। কিন্তু উপায় ছিল না। তখনই আমরা বরণ করলাম সেনাপতি-পদে শ্রীযুক্ত ওমপ্রকাশ সেইনীকে। ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ফেরত, খুব অ্যাথ্‌লেটিক শরীর, লম্বা, চট্‌পটে। কিন্তু একটি দোষ—আমাদের জাতির ডিসিপ্লিন না থাকার জন্য ওর ঘেন্না ধরে যায় বড় তাড়াতাড়ি। কোথায় যেন একটু ভারসাম্যের অভাব আছে! 'কমাণ্ড' দিলেই হাসির হরূরা পড়ে যায়; আর ফিরে আমার পানে বা আস্থানাজীর পানে চেয়ে বিহ্বলকণ্ঠে বলে—"বলুন বলুন, এমন বেসরম, বেহায়া নওজোয়ান নিয়ে লজ্জায় পড়তে হবে দেশের, ব'লে দিলাম আমি।"

আমরাও অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করতাম।

এখান থেকে হেঁটে যাব। সাত মাইল খাড়া উঠে যেতে হবে। সে জঙ্গলটা শেষ হয়েছে। খাদরালার ভীষণ জঙ্গল আরম্ভ হবার আগে এই সাত মাইল পথ ফাঁকা পাহাড়ের গায়ে গায়ে।

খচ্চরের পাল জোটানো হয়েছে মালপত্র বইবার জন্য। আমি ভার নিলাম যে, মালপত্রের আমি ব্যবস্থা করে দেব। ছেলেরা বেরিয়ে যাক্। ওরা ছাড়া পেয়েই ছুট্। যেন বন্যার জল বাঁধ ভাঙলো। ৩২টি খচ্চর দু'বার করে যাতায়াত করে সেই পাহাড়ের মতো মালপত্র তো পৌছে দিলো। দুটি মাত্র ঘোড়া দুজন সাংবাদিককে নিয়ে অনেক আগে চলে গেছে।

আমি ভাবতে লাগলাম কি করে যাব এই সাত মাইল খাড়াই।

সুশ্রী সুন্দর একটি যুবক—পাহাড়ী—আমায় দেখে হাসতে লাগলো।

"স্যার, হেঁটে যাচ্ছেন তো?"

আমি বললাম—"তাই তো যেতে হবে।"

নাম ভুলে গেছি আজ যুবকটির। সে ওখানকার জঙ্গলের—আমায় বললে S D.O.।

"সরকারী ঘোড়া আছে আমার। জানেন ঘোড়ায় চড়তে?"

ও-কম্মো হয়নি জীবনে। কিন্তু ভাবলাম নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে এসে এটা হাতছাড়া করি কেন। পথের ভীষণতার কোনো ধারণাই ছিল না। বললাম—"খুব জানি, কতো ঘোড়ায় চড়েছি!"

ইঙ্গিত করতেই একটা ঘোড়া এসে হাজির। পাহাড়ী টাট্টু—সাদা ধবধবে রং। গায়ে আঁটা ঝকঝকে চামড়ার জিন। পেশীগুলো যেন নড়াচড়া করছে আর রং ফেলছে অভ্রের ঝলকের মতো। কান দুটো খাড়া, লেজ একেবারে পা অবধি ঝোলা।

"Thin mane, thick tail, broad buttock, tender hide ;
Look ! What a horse should have ···"

মনে পড়লো line-গুলো। কিন্তু রেকাবে পা দিয়ে এই উড়ন-তুবড়ির ওপর চড়ি কি করে!

S.D.O. সন্দেহ করবার আগেই লাফিয়ে উঠলাম পিঠে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়া চললো। খানিকটা এগুতেই বুঝতে পারলাম ঘোড়ার সহিস আসছে সঙ্গে সঙ্গে। নাম মাঙ্গারাম। সরকার থেকে ষাট টাকা মাইনে পায় ও ঘোড়ার দানার জন্য দিন দেড়টাকা পায়। ঘোড়ার স্বাস্থ্যের জন্য সে দায়ী। ঘোড়ার ওজন যদি সন্তোষজনক না থাকে, চাকরি থাকবে না।

কথায় কথায় মনে নেই আমি পায়ের রেকাব দুটো পেটের দিকে একটু ঠেলে দিয়েছি। আর যাবে কোথায়, কদম ছেড়ে ঘোড়া একেবারে দুল্‌কি ধরলো। আমি প্রথমটা টাল সামলাতে গিয়ে জিন ধরে প্রায় ঝুলে পড়ছিলাম। মনে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠে জকিদের ছবি। আমি ঝুঁকে পড়লাম ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর, রাশ দুটো ছোট করে হাতে চেপে ধরলাম আর যতটা সম্ভব দেহভার রেকাবে রাখলাম। এসব করতে করতে ঘোড়া তো মাইলটাক অতিক্রম করে গেছে। কোথায় মাঙ্গারাম আর কোথায় কে! ছুটছে তো ছুটছেই ঘোড়া।

পাহাড়ের নিতান্ত গা ঘেঁষে বড়জোর চার-পাঁচ ফুটের পথ, তারপরেই গভীর খাদ। ঘোড়াটা কিছুতেই পাহাড়ের গা ধরে দৌড়বে না। যতই চেষ্টা করি কেবল খাদের ধার দিয়েই দৌড়বে। নীচে চোখ পড়লে মাথা ঘুরে যায়, আরও ঝুঁকে পড়ি, ঘোড়া আরও দৌড়য়। সেই পাহাড়ের মাথাতেও ঘাম ছুটে গেল। পাহাড়ের মোড় নেবার সময় আমি চোখ বুঁজে নিচ্ছি। ঘোড়া ছুটছে। আর থামাতে পারিনা।

অগত্যা মরিয়া হয়ে রাশ একেবারে টেনে ধরলাম। দুটো পা ওপরে তুলেই লাফিয়ে পড়ল সামনে। দু'বার লাফ মেরে থমকে দাঁড়ালো। আমি দাঁড় করিয়ে রাখলাম ঘোড়া। মাঙ্গারামের আশায়।

প্রায় বিশ মিনিট পর দৌড়তে দৌড়তে মাঙ্গারাম এসে উপস্থিত। ঘোড়াকে আর আমাকে দেখেই ও ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

যত বলি—"ওকি রে, কাঁদিস্ কেন ?"—ততই ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

ভারি অপ্রস্তত বোধ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"হ্যাঁরে মাঙ্গারাম, কাঁদছিস্ কেন ?" (অবশ্য সুবিধা পেলে আমিও কাঁদতাম।)

"কাঁদবোনা বাবু! ভেবেছিলাম মরেই গেছ। এই ঘোড়ার পিঠে এমনি ছুট্! আর যা পাহাড়ী পথ! দুটো সওয়ারি এর মধ্যে ও ফেলে দিয়েছে—জখম হয়েছে দুজনই।"

"আর এই ঘোড়া আমায় দিয়েছ হতভাগা!"

"কী লক্ষ্মী ঘোড়া! চুপচাপ চালাতে হয়। ওকে তাড়া দিলে ও একেবারে দশ-বিশ মাইলের ছুট্ লাগায়। আপনাকে পাব এ আশাই ছিলনা আমার।" বলে আর কাঁদে। আর পরম আদরে ঘোড়ার গাল থাবড়ায়।

ইচ্ছে করছিল নেমে পড়ি। আলোচাল আর কাঁচকলা খাওয়া রক্তে পুষ্ট দেহ—কত সাহস আর সঞ্চয় করি! কিন্তু নেহাত মানের গোড়ায় ছাই দিতে হবে ব'লে ঐ ফ্লাইং-সসারে সওয়ারি হয়ে বসে রইলাম।

কিন্তু এখন আর ধীরে ধীরে চলতে ভালো লাগেনা। এখানে জায়গাটাও ঊষর এবং বন্ধ্যা। কেবল কক্টাসের নানা জাতি এধার ওধার। নৈলে স্ট্রবেরির ঝাড়। বাকীটা পাথর-ঢাকা বিস্তৃতি। বড় গাছ একটাও নেই।

বললাম—"আমি ছুটেই যাই রে। পড়বো না।"

শুনে মাঙ্গারাম তো চোখ কপালে তুললো!

কিন্তু ও লাগাম ধরে ধরে হেঁটে যাবে আর আমি ঘোড়ার পিঠে চলতে থাকব, এতো কটু দৃশ্য বরদাস্ত করতে পারছিলাম না।

কিছু না ব'লে রাশটা ঢিল দিলাম ও একটু সামান্য খোঁচা দিলাম। মারলো ছুট্। তেমন নয়। হাত তুলে মাঙ্গারামকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম।

ঘোড়ায় চড়া হয়তো আয়ত্ত হয়নি, কিন্তু ঐ ঘোড়ায় চড়া আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। বেশ লাগছিল চলতে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এলো এমন একটা বনে ঢুকলাম। গাছের নূতনত্ব নেই। তবে সব বয়সহীন গাছ। সেই কেলু, দেওদার আর পাইন—বরাসও আছে মাঝে মাঝে। আর অসংখ্য লতাগুল্ম। তলাগুলো হালকা নীলরঙের ফুলে ভর্তি। প্রজাপতির মেলা যেন। খাদটা এতো গভীর যে তলা দেখতে পাচ্ছিনা।

ঘোড়াটা কিন্তু সাবধানে চলতে লাগলো।

হঠাৎ একটা জায়গায় এসে ঘোড়া আর পথে থাকতে চায়না। অন্যদিকে যেতে চায়। প্রথমটায় যাও বা একটু চেষ্টা করলাম ওকে পথে আনার জন্য, পরে আর করলাম না। পশুদের স্বভাব-বৃত্তির ওপরে আস্থা ছিল। মনে করে ছেড়ে দিলাম ওকে ওর স্বতন্ত্র পথে। মাঙ্গারাম কোথায় জানিনা। এসে আমায় পথে না দেখে কী করবে জানিনা। তবু ছেড়ে দিলাম ওকে ওর পথে।

খানিকটা আসতেই ঝর্ণার শব্দ পেলাম। তবে কি ও জল খেতে এলো?

হ্যাঁ, একটা ঝর্ণাই বটে।

পাহাড়ের গা বেয়ে জল পড়ছে। খুব বেশী বড় নয় যে প্রপাত বলবো। জোরে পড়ছে; বাড়ীতে কল থেকে যেমন পড়ে তার চেয়ে খানিকটা জোরে। একটা পাইনগাছের লম্বা গুঁড়ি—প্রায় ন'দশ ফুট হবে—বেশ করে ভেতরটা কুরে নেওয়া হয়েছে। দুটো প্রান্ত বন্ধ। এটা তলায় পাতা একটা পাথরের চবুতরার ওপর। তার মধ্যে জলটা পড়ছে। উদ্বৃত্ত জল উপ্‌চিয়ে পড়ে পাহাড়-পথে নেমে যাচ্ছে।

এটা পথের ওপর জল খাবার জায়গা। ঐ পাইনের গুঁড়ির পাত্রে জল খায় ঘোড়া, খচ্চর। ঘোড়াটা জানে যে এখন ছ'মাইলের মধ্যে আর জল নেই। তাই জল খেতে এসেছে। আমি আর ঘোড়া থেকে নামলাম না। আবার উঠতে হবে, এবং সেটা ভরসা করতে পারছিলাম না।

অনেকগুলি খচ্চর এখানে জড়ো হয়েছে। আর প্রায় শ'খানেক ঝকঝকে খালি কেরোসিনের টিন। দেখলাম জল ভরা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম— "এ জল কোথায় যাবে?" শুনলাম, খাদরালা ক্যাম্পে। এখানে মূল্যবান খবর পেলাম যে খাদরালায় জল নেই এবং এইখান থেকে জল বহন করে নিয়ে যেতে হবে। প্রায় দু'হাজার টাকার কণ্ট্রাক্ট একমাস জল যোগাবার। নাইতে পাবনা এই জলে খাদরালায় বসে। নাইতে গেলে আসতে হবে এইখানে— বড় বিপজ্জনক কথা।

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ফিরতে যাবো—একটা খচ্চর ক্ষেপে উঠলো। ঘোড়াটা হঠাৎ ঘাব্‌ড়ে ছুট্ মারতে গেল। আমি প্রস্তুত ছিলাম না। একেবারে জিন থেকে পড়ে গেলাম। কোনোমতে ঝুলে আছি। পড়লে, তলার কাদায় মাখামাখি থেকে কেউ বাঁচাবে না। এই সমূহ বিপদের সময় যার দু'খানা হাত আমায় মূল্যবান সম্পদের মতো তুলে ধরে জিনে বসিয়ে দিলে—সে মাঙ্গারাম।

আর ছাড়লাম না মাঙ্গারামের সঙ্গ। এ কয়মাইল পথ গল্পে গল্পে কাটিয়ে দিলাম। হঠাৎ খুব বড় একটা জলপ্রপাতের শব্দ কানে এলো। মাঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করতেই, ও বীরবিক্রমে মাথা নেড়ে জানালে ধারে কাছে কোথাও কোনো জলপ্রপাত নেই। শব্দটা কিন্তু সত্যি। ও বললো—"খাদরালার জঙ্গল পথের ওপরে—আমাদের মাথার ওপর। সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার গভীর শব্দ।"

তবে এ খাদরালার স্বাগতাভিনন্দন! সারা গায়ে যেন পুলক-দোলা দোল দিলো। যার সঙ্গীত এতো গভীর, যার আবাহন এতো অবাধ—তার অন্তর না জানি কতো গভীর, তার আগ্রহ না জানি কতো দুর্নিবার! খাদরালা জঙ্গলের গভীরতার নির্ণয় একমাসের মধ্যেও করতে পারিনি। নমস্কার জানালাম খাদরালাকে।

এইবার পথে দেখতে পেলাম পুরোগামী সেই দুজন অশ্ববাহিত সাংবাদিককে। পথচারী একটি ছেলে আমায় ঘোড়ায় দেখে একটি ছবি নিলো।

চমক লাগলো ছোট্ট একখানা ফলক দেখে। নতুন মনে হ'লনা, অথচ নতুনই। লেখা *Khadrala Hotel*। এখানে চটি থাকতে পারে, থাকতে পারে পান্থনিবাস; কিন্তু ইংরাজীতে লেখা *Khadrala Hotel* এখানে কেন? ব্যবসায়ী-মাত্রের বুদ্ধি সর্বত্র সমান।

মোড়টা ঘুরতেই চোখে পড়লো খাড়া চড়াই একটা পাহাড়। একেবারে ল্লিশ ডিগ্রীর চড়াই; তারও কম হবে, আরও বেশী তো নয়ই। তলায় কয়েকটা াবু, একটা ডাকবাংলো, একসার দোতলা ঘর। কিন্তু ওপরটায় অনেকগুলি াবু; আর সদ্য চাঁচা একটা একফুটের পথ খাড়া উঠে গেছে। পথ বলতে কছু নেই। কেবল পাহাড়ের গায়ের ঘাসটা চেঁচে বার করে নিয়েছে। কধারে পাথরের টুকরো বসানো, তাতে চুন লেপা। মাঝে মাঝে পাইনের াখা পুঁতে দিয়েছে। একেবারে চূড়ায় একটা তোরণ গোছের করা। তার াথায় লাল কাপড়ের ওপর সাদা হরফে লেখা *Khadrala Youth Camp*,— বটা ঘোড়ার পিঠে বসে দেখলাম।

মাঙ্গারাম বললে, এই খাড়া পাহাড়ে ঘোড়া চড়বেনা। নামতে হবে। কন্তু খাড়াই দেখে বুক টিপটিপ করতে লাগলো। বললাম—"যাবেনা কেন াড়া—যাবে।" ব'লেই দিলাম রাশ টেনে বুকে রেকাবের ঠেলা। ঘাড়ের াামগুলো ঝাঁকরে ঘোড়াটা উঠতে লাগলো।

কিন্তু সেই চল্লিশ ডিগ্রীর খাড়াইতে ঘোড়া যখন উঠতে লাগলো আমার দশা খন পিসার স্তম্ভের মতো। পড়ি-কি-মরি!

এদিকে ক্যাম্পের ছেলেরা কতক নীচে কতক ওপরে জড়ো হয়েছে ঃozenante-র পিঠে Don Quixote-কে দেখার মজা উপভোগ করতে। াসাহাসির ধুম পড়ে গেলো।

যাক্, কোনোমতে ওপরে চ'ড়ে নামলাম ঘোড়া থেকে। চারধার থেকে খন congratulations-এর ধুম।

*

মাত্র সন্ধ্যার খানিকটা আগে এসে পৌঁছেছি। এইখানে আমাদের তিনটি প্তাহ কাটাতে হবে। একবার দেখেই বুঝলাম এ তল্লাটের সবচেয়ে উঁচু াহাড়টার মাথায় আমরা আছি। ঠিক মাথাটা আর পাঁচশো ফুট ওপরে। কিন্তু ার কোলেই একটু জায়গা;—পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। লম্বায় একশো ট, চওড়ায় পঞ্চাশ ফুট। এর মধ্যেই চারপাশে সবসুদ্ধ ১৫টি তাঁবু। ছোট ছাট তাঁবু। দুজনায় থাকতে পারে, কোনো-কোনোটায় তিনজন বা চারজন।

হিমাচল সরকার এখানে যতটা সম্ভব ভালো করে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। ালের কষ্ট। তাই বড় বড় লোহার পিপা এনে জল ভরে রেখেছে। পাইনের

ছাউনি করে ছোট ছোট ঘর করেছে। কোনোটায় লেখা 'পানীয় জল', কোনোটায় 'জল', কোনোটায় শুধু লেখা 'পুরুষ'। খানিকদূরে সারি সারি আটটা ঘর—বুঝলাম পায়খানা। করতে যে কতো কষ্ট হয়েছে তা ওখানে না গেলে বোঝা কষ্টকর।

মাঝখানটায় টিন-ছাওয়া চৌকো জায়গা, সেখানে জলছে আগুন। তার পাশেই খুব উঁচু একটা ধ্বজস্তম্ভ; কাল তার ওপরে জাতীয়-পতাকা ওড়াবেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী।

খাবার-ঘর, রান্নাঘর, ডাক্তারখানা, এমনকি একটা ডাকঘরও নিচে করা হয়েছে ঐ ডাকবাংলো ও তার আশেপাশে। ডাকবাংলো দুটো। একটায় ইন্দিরা গান্ধী ও আরও দু'চারজন গণ্যমান্য আছেন। তার নিচের বাংলোটায় রান্নাঘর ও খাবার-ঘর; তা ছাড়া একটা কমন-রুম।

পাশে ডাক্তারখানা। সৌম্যদর্শন ডাক্তারটি। দেখে এতো ভালো লাগলো যে, মনে হ'ল ওষুধ দিতে না জানলেও ওর ওপর আমি রাগ করতে পারবোনা। বড়বাজারের পাঞ্জাবী ফলওলাদের মতো লাল্‌চে, স্বাস্থ্যবান।

তারপর গেলাম সেই হোটেলে। একটা টিন কিনলাম Capstan-এর আর রোজ দুধ পাওয়া যাবে বারো আনা ক'রে ঠিক করলাম। তখনকার মতো এক কাপ চা খেলাম। তাঁবুতে ফিরে এসেই দেখি একটি ছেলে এসে ধরেছে—"বাঃ দাদা, আমি চা নিয়ে ঘুরছি, কোথায় ছিলেন?"

বাঙালী ছেলে। নাম অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—এম.এ. পড়ছে এর দাদা এখন একজন নামকরা সাংবাদিক। আমায় বললে—"আমায় আপনি চেনেন না বোধহয়।" মুখে একেবারে হাসি টু-দি-পাওয়ার বত্রিশ। খোকা-খোকা ভাব।

আমি সাবলীলভাবে বললাম—"খুব জানি তোমায়, শৈলেনদার ভাই তো! বুদ্ধু তোমার নাম? আগ্রায় তোমায় দেখেছি তখন তুমি খুব ছোট।"

"আপনি চিনতে পারতেন আমায়?"

"না, তা পারতাম না; কিন্তু সামনে দাঁড়ালে বুঝতাম, কারণ জানতাম শৈলেনদার ভাই আসছে সঙ্গে। আর তোমার দাদার মুখের সঙ্গে তোমার তো খুব মিল।"

"আপনি কোন্‌ তাঁবুতে?"

"আমি জানিনা। মালপত্র এই তাঁবুতে ছিল। এখন এসে দেখছি নেই।"

"তাই নাকি! কোথায় গেল?" একটু সন্ত্রস্ত হবার ভাব দেখালে ছেলেটি। পরে অবশ্য জেনে নিতে পেরেছিলাম ত্রস্ত হবার পাত্রই নয় ও। তখন নেহাত প্রথম পরিচয় তাই অমনটা করলো।

আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম—"ভয় নেই; এখান থেকে চুরি যাবেনা জিনিস। কেউ হয়তো নিয়ে গেছে ভালোর জন্যই।"

"চলুন-না আমাদের তাঁবুতে।"

"কোন্‌টা?"

"ঐ যে—"

চেয়ে দেখলাম তাঁবুর প্রবেশমুখে ফলক—*Director*।

বললাম—"ও তো আস্থানার তাঁবু; ওখানে যে তুমি?"

শেয়ালের মতো দুষ্টু হাসি হেসে বললো—"চলুন তো। তারপর হবে। Grand তাঁবুটা—জানেন দাদা, এই এতো উঁচু করে পাইনের পাতা বিছানো। তার ওপরে 'দরী' (সতরঞ্চি)। বসলে নরম যা লাগে! Grand! তা ছাড়া ante-room একটা আছে। চলুন না।"

শিক্ষকতা করি। এই ধরনের সরল বাক্যবাগীশ, উন্মুখ চপলতার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত আমি। দেখলেই চক্‌চকে চোখে চাওয়া; নমস্কার জানিয়েই খুশী হওয়া, কিছু করতে পারার জন্য ব্যস্ততা, কাজ দিলে তার ভারে দমে যাওয়া, আর সবার তলে তলে চপল তরল পরিহাসপ্রিয়তা—এ যেন চিরতরুণের বাঁধাধরা ছবি। সামনে এলে বালক, চোখের আড়াল হ'লেই যুবক হবার বাসনায় দাপাদাপি। সামনে বসে জানা এবং ঠিক কথাগুলিই কতো সসঙ্কোচ ভীরুতায় জড়িয়ে বলে; আড়ালে ওদের দলে নিতান্ত সারহীন কথাও কতে তুমুল তর্কজালে আবদ্ধ ক'রে চিৎকার ক'রে ঘোষণা করে।

আমি বললাম—"তুমি ডাকছো এই ঢের। আমি নিরিবিলি ভালবাসি।"

এমন সময় কোঠারী এসে বললে—"স্যার, আমাদের একটু তাঁবুতে আপনি!"

খুশী হয়ে বললাম—"বেশ, বেশ। তোমাদেরই খুঁজছিলাম।"

"আপনার জিনিসপত্র কই?"

"সে তো জানিনা। দেখতে হবে।"

যে তাঁবুটায় জিনিস ছিল সেখানে ততক্ষণে দুটি ছেলে বিছানাপত্র বিছাচ্ছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম—"আমার মালপত্র কোথায় গেল হে ?"

তারা বললে—"কতো বারণ করলাম। কিন্তু দুটি ছেলে এসে বললো, আপনার বিশেষ ইচ্ছাতেই ওরা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা আর কিছু বলতে পারিনি।"

হাসতে লাগলো কোঠারী, হাসতে লাগলো বুদ্ধ। আমিও হাসতে লাগলাম। বম্বে-দলের তাঁবুতে গিয়ে দেখি একটা তাঁবুতে ওরা ন'জন। আমি বললাম—"না ভাই, এর মধ্যে আমি এলে তোমাদের কষ্টের অবধি থাকবেনা।"

তারপর খোঁজে বেরুলাম নিজের বিছানাপত্রের। শিবিরের একপ্রান্তে, ঢালু জমির শেষ ঢালের ওপর ছোট্ট একটা তাঁবু অন্য তাঁবুগুলোর আড়ালে। সেখানে সেই গোপী কুলশ্রেষ্ঠ এবং তার মাসতুতো ভাই বিক্রম কুলশ্রেষ্ঠ।

আমায় দেখেই বললে—"আসুন আসুন, আজও আপনার বিছানা করে রেখেছি। আমরা মাত্র দুজন। তাঁবুটা খারাপ ব'লে কেউ নেয়নি। বেশ একটেরে আছে, হৈ-হল্লা নেই। তিনজনার পক্ষে একেবারে চমৎকার তাঁবু ঢুকে পড়ুন। কী জবর শীত দেখেছেন ?"

হাসতে হাসতে বললাম—"আসল ইউ.পি.-র কায়েত তুমি। তোমাদে শত্রুতাও ভদ্রতার মধ্য দিয়ে। বেশরম বেহায়া হ'লেও তোমরা বেআদ হ'তে পারনা। বেশ, বেশ—তোমাদের সঙ্গেই আমার মিশ খাবে।"

* * *

*ইউ.পি.-র কায়েতদের ভদ্রতা সম্বন্ধে গল্প আছে ঃ*

চোর এসেছে। রাতে গৃহস্বামীকে হত্যা করে বামাল নিয়ে পাচার হবে গৃহস্বামী সুপ্ত। তাকে জাগিয়ে চোর বললে—"অনুগ্রহ করে একবার কৃপাকটাক্ষ এদিকপানে হানবার অবসর পাবেন কি? আপনার চমৎকার ঐ আকাশের মতো বুকখানা এদিকে ফেরাবার কষ্ট করবেন কি? আমা ছুরিখানা আপনার হৃদয়ের প্রেমে ডুবে যেতে চায়। এ প্রণয়ে আপনার মহ অন্তঃকরণকে সাহায্য করতে আদেশ করবেন কি ?"

গৃহস্বামী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসে বললেন—"বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! অভাগা কুটীরে আজ সত্য প্রেমের পদরজ পড়লো। অভাগা আজ ধন্য। সবই হবে

আগে একখিলি পান দিই জনাবকে, নইলে বান্দা যে প্রণয়ে পীড়িতই হবে, তার মধু যে নাগালের বাইরেই থেকে যাবে।"

এর পরে একখিলি পান মাঝে রেখে 'আপনি নিন্' আর 'আপনি নিন্' করতে করতে সকাল।

চোরকে অন্যরাত্রির জন্য নিমন্ত্রণ করে গৃহস্বামী দোর অবধি এগিয়ে দিয়ে এলেন।

চোর চলে গেলে পানটি মুছে তুলে রেখে দিলেন।

এমনি অনেক গল্প প্রচলিত আছে ইউ.পি.-র কায়েতদের ভদ্রতা-জ্ঞান নিয়ে।

সত্যই কোথা থেকে যেন কন্‌কনে শীতের বাতাস এসে থরহরি-কম্প লাগিয়ে দিলো। ঘন গভীর কুয়াশায় দেখতে দেখতে চারধার ছেয়ে গেলো। জঙ্গলের মধ্য থেকে কোনো দৈত্য যেন ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারধার আচ্ছন্ন করে দিলো। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মতোও পড়তে লাগলো। বেশীর-ভাগ ছেলেরা ছুটে গিয়ে বিছানায় লেপ-কম্বল মুড়ি দিলো।

কাব্য-করার অবসর নেই তখন আমার। কয়েকটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার না সেরে আমি তাঁবুতে ঢুকতে পারছিনা।

প্রথম আমায় জানতে হবে রাতে আলো পাওয়া যায় কিনা; দ্বিতীয়, চা-পাবার ব্যবস্থা কিরকম; তৃতীয়, খাবার ব্যবস্থা কী ও কোথায়; চতুর্থ এবং প্রধান, কার্যালয়টি কোথায় হবে এবং সেখানে আমার উপস্থিতির নিয়ম কী।

Director-এর তাঁবুতে দেখলাম তিনি নেই। একজন পাকাচুল লোক গম্ভীরভাবে বললে—"নীচে আছেন।"

পাহাড়ে পথ বলতে নীচে আর ওপরে। এসব দেশে আমরা বলি 'একটু এগিয়ে' বা 'পিছিয়ে', 'ডাহিনে' বা 'বাঁয়ে'—কিন্তু পাহাড়ে ও-কথার মানে নেই। বলতে গেলে 'নেমে' বা 'উঠে', 'নীচে' বা 'ওপরে'।

আগেই বলেছি পাহাড়টার গায়ে কোনো পথ নেই, কারণ কেউ কোনোদিন পাহাড়টা ব্যবহার করেনি। আমাদের জন্যই ওটা প্রথম বাসযোগ্য (?) করা হয়েছিল। তার গা বেয়ে একফুটের চাঁচা পথ। অন্ধকারে অস্পষ্ট। তবে সেই চুন-মাখানো নুড়িগুলি নির্দেশ জানায়।

সন্তর্পণে আমি নেমে গেলাম। আমার হাতে টর্চ।

প্রথম তাঁবুতেই গিয়ে দেখি বাইরে সারি সারি নতুন লণ্ঠন। দুজন ছেলে টিন থেকে তেল ভরছে। বুঝলাম রাতে আলো পাওয়া যাবে। কানে কানে একটি ছেলে বললে—"আপনি নিজেই একটা পাবেন। তাঁবুর জন্য আর একটা।"

ছোট্ট করে বললাম—"ধন্যবাদ।"

আস্থানার সঙ্গে দেখা হচ্ছেনা। আরও নেমে প্রথম ডাকবাংলোয় গেলাম। বাইরে থেকেই দেখলাম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সঙ্গিনী, আছেন একটি ঘরে, সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পদ্মদেবজী, এবং আমাদের তদ্বির করার জন্য হিমাচল-প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারি শ্রী মহাজনও আছেন। অন্যঘরে সেই সাংবাদিক-মশায় ও দু'চারজন আরও নতুন লোক।

আরও নামলাম। ডাক্তারখানা, তারপরে রন্ধনশালা। তারপরে আর-একটি বাংলো। সেখানে ঘোরাফেরা করছেন শ্রী আস্থানা।

লোকটির কথা এখনও অবধি বলিনি। আমাদের দলের মধ্যে সবচেয়ে বেঁটে, সবচেয়ে রোগা। বয়স অল্প, কারণ সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে; কিন্তু দেখায় অনেক বয়স—এতো রোগা আর ভাঁজ-কাটা মুখ। একমাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। চোখ-দুটো গর্তের মধ্যে ঢোকা। কিন্তু চক্চক্ করে খুব। বাঁ-হাত দিয়ে তলার ঠোঁটের বাঁ দিকটা কেবলই দাঁতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খুঁটতে থাকে। আর কিছু শুনতে হলেই ক্রমাগত—'হুঁ' 'হুঁ' করতে থাকে। তখন দৃষ্টিটা থাকে অন্য কোনোখানে। অর্থাৎ মনে হয় অত্যন্ত বদমেজাজী লোক, সহজে মতান্তর সহ্য করতে পারেনা, নার্ভাস ও নিউরটিক। অত্যন্ত এনার্জি, কিন্তু সেই অনুপাতে স্থৈর্য ধীরতা নেই। বুদ্ধি যা আছে তা সর্বদাই short-cut খোঁজে, সোজাপথে চলতে সাহসে বাধে।

আমার ওপর ওর এতোটুকু নির্ভর ছিলনা। থাকার দরকার ছিলনা। তবে নিরাপদ এবং সসম্মান দূরত্ব বজায় রেখে ও বরাবর গেয়ে গেছে যে আমিই ক্যাম্পের সব-কিছু। কিন্তু এখনও অবধি সাধারণভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া আর আমি কিছু করিনি।

'আস্থানা'-ও ইউ.পি.-র কায়স্থ গোত্র।

আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম খাওয়া-দাওয়া হবে রোজ এখানেই। রাতে খাবার বিউগ্‌ল্ বাজবে। তখন খাবার পর কমন-রুম-এ একত্র হয়ে রোজকার

প্রোগ্রাম ব'লে দেওয়া হবে, এবং কালকের বিশেষ প্রোগ্রাম বলা হবে। তাড়াতাড়ি ব'লে দিলো—"ওপরে ওঠবার আগে আসবেন। কথা আছে।"

"আচ্ছা"—ব'লে আমি ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ জুড়লাম।

ডাক্তারটি—মুখ দেখলেই বাড়া-ভাতের পাশে নিতান্ত শিষ্ট আলুভাতে মাখার দলাটি মনে পড়ে—তখনও ব'সে। ওর ডিস্পেন্সারিতে একটা গ্যাস জলছে। আমি ঢুকে বললাম—"নমস্কার, ডাক্তার।"

ও বললে—"নমস্কার।"

পড়ছিলো Somerset Maugham-এর গল্পের চয়নিকা।

আমি বললাম—"এসবও চলে? আমি ভাবছিলাম বুঝি পড়ছিলে 'Last Word on T.B.' বা 'First Reflections on Polio'।"

ডাক্তার বললো—" 'Books in brooks, sermon in stones'—কি-সব বলেন আপনারা—Wordsworth কি Shelley-র হবে বোধ হয়। জগতের মানুষ প'ড়ে প'ড়েই জানলাম। জানেন, মালায়াতে যখন ছিলাম—"

"ওঃ, তাই Somerset Maugham! মালায়া আর South Sea Islands নিয়ে তো ওঁর অর্ধেক গল্প।"

"বেড়ে লেখে, মশায়! ডাক্তার লেখক কিনা।"

ডাক্তার! হ্যাঁ, আরেকটা যোগসূত্র আছে ডাক্তারের।

আমি বললাম—"ডাক্তার, মালায়াতে কফি খাওয়া অভ্যাস করোনি বুঝি?"

ডাক্তার বললে—"চলে নাকি? আমি তো সব এনেছি। এবং ইচ্ছা আছে বাগী থেকে আবার আনিয়ে নেব। তা ছাড়া ভালো পোর্ট আছে। বলবেন না কারুকে; আপনাকে দেবো।"

সেরেছে! হিমালয়ের মাথায় পোর্ট!

কিন্তু আসল কথা ফাঁস করে কফি হারাই আর কি!

বললাম—"বেশ, জানা রইলো। কফি কোথায়?"

"আসছে।"

গরম জল আনিয়ে চট্‌পট্ কফি তৈরি হ'ল। কফির কাপে চুমুক মারতে-মারতে এতোক্ষণে আমি বাইরের দিকে তাকালাম।

ঘোর অন্ধকার। থরে থরে স্তূপে স্তূপে অন্ধকার। শরৎচন্দ্রের 'অন্ধকারের রূপ' পড়ার পর থেকে, অন্ধকার দেখলেই ঐ পঙ্‌ক্তিগুলি মনে ক'রে ক'রে ভাবতে চেষ্টা করি সত্যি-সত্যি অন্ধকারের ঐ রূপ দেখতে পাই কিনা।

মনে পড়ছে পঙ্‌ক্তিগুলি—"বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্পন্দ, নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং এই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করালদংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি একপ্রকারের অপরূপ স্তিমিতদ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসি বিচ্ছুরিত হইতেছে।"

এই বর্ণনার মধ্যে সত্যকার অন্ধকার বা তার রূপ কোথায় আছে দেখা যাক। 'নিশীথিনী', 'কালীমূর্তি', 'নিবিড় কালো', 'সূচীভেদ্য অন্ধকার'—এই কয়টি শব্দ ছাড়া কালো বা অন্ধকার দ্যোতক কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। অথচ এই কালীমূর্তি-সমতুল ব্যাপক বিরাটত্বের অনুভূতি প্রকৃত অন্ধকারে তো হয়ই না, বরং মনে হয় প্রকাশ যেমন নিকটকে দূরে নিয়ে যায়, প্রকাশে দিগন্ত যেমন ছড়িয়ে পড়ে, অন্ধকারে হয় ঠিক তার বিপরীত। দূর যেন কাছে এসে ভীড় করে ঠেসে ধরতে থাকে, দিগন্ত একেবারে মুছে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। অন্ধকার যেন গলা ধরে ঠাসে, আলো যেমন মনকে প্রসারের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। অন্ধকারের বিরাট রূপ, জানিনা; হয়তো নদীর চরে, সমুদ্রের বুকে দেখা যায়; কিন্তু পাহাড়ের বুকে, যেখানে চারধারে সান্ত্রীর মতো খাড়া পাহাড়, মাঝখানটায় একটা বড় গামলার মতো খালি জায়গা, যেখানে আকাশও পরিমিত, সেখানে অন্ধকারের বিরাট রূপ দেখিনি।

মানবজীবনে অন্ধকারের অনুভূতি একটি বিশিষ্ট অনুভূতি। মনে করে দেখলে অনেকেই মনে করতে পারবেন যে, প্রথম অন্ধকারের রূপ কবে তিনি দেখেছিলেন! অন্ধকারের সঙ্গে ভয়ের অনুভূতির এতো নিকট সম্বন্ধ যে, ভয়ের সব উপাদানকে আমরা কালো রঙে সাজাই—কালোতে অপ্রীতি আমাদের, কালো এবং ভীতি পাশাপাশি রাখি আমরা। চেনা ঘরেও আলো নিবলে যেন আমরা ঘাবড়ে যাই। চেনা পথে অন্ধকারে গা ছম্‌ছম্‌ করে। তাই অন্ধকারের রূপ বলতে মনশ্চক্ষে কোনো রূপ আছে ব'লে আমি জানিনা। অন্ধকার একটা প্রাকৃতিক সত্য, এবং সে-সত্যের সম্মুখীন হতে গেলেই আমরা সঙ্কুচিত হই, এবং আশু মুক্তি চাই অন্ধকার হ'তে আলোতে—"তমসো মা জ্যোতির্গময়"।

ছেলেবেলায় রাত্রে বাবা যেতেন চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর মন্দিরে মালা দিতে। নিত্য যেতেন তিনি। আমায় সঙ্গে নিতেন। পথটুকু তিনি অমরকোষের শ্লোক বলতেন, আমি আবৃত্তি করতাম। রোজ দুটি তিনটি শ্লোক ক'রে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল অমরকোষ।

পথটা অন্ধকার ছিল। একদিন বাবা পড়াচ্ছেন—"নিশা নিশীথিনী রাত্রি ত্রিযামা ক্ষণদা ক্ষপা। বিভাবরী তমস্বিন্যৌ রজনী যামিনী তমী॥"—এই শ্লোকটা পড়তে পড়তে আমি যেন অন্ধকারের ভীষণ রূপের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।—বাবার হাত চেপে ধরলাম।

বাবা বললেন—"কি রে, ভয় করছে?"

আমি বললাম—"রজনী যামিনী তমী—"

বাড়ী ফিরেছি। বাবা আমাকে খাইয়ে দিচ্ছেন। ঘুম-কাতুরে ছিলাম। ঢুলে-ঢুলে খাচ্ছি। ভেসে আসছে কানে বাবার কথা, মাকে বলছেন—"অনুভব-শক্তি এতো প্রখর তোমার ছেলের—'রজনী যামিনী তমী' বলতে-বলতেই অন্ধকার যেন ওর বুক চেপে বসলো।" বলতে লাগলেন আর হাসতে লাগলেন।

আমার বিশ্বাস কাব্যে এই শব্দঝঙ্কার, এই ধ্বনির স্থান অসামান্য। তন্ত্রের মন্ত্রগুলি ভালো করে কেউ যদি আবৃত্তি করে, বুঝতে পারবে ধ্বনির আবেশ কী। "ওঁ ক্রীঁ ক্লিঁ মারয় মারয়, ঘাতয় ঘাতয়, উৎপাটয় উৎপাটয়" ইত্যাদি দ্বিত্ব যেন অনুরণনের ইচ্ছায় রচিত। Mesmerism বা মোহ-আবেশে আচ্ছন্ন করার একটা বড় উপায় ধ্বনি। যুদ্ধের আগে তাই উভয়পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধ চলতো। একই কথা বার বার বললে শেষ অবধি তার প্রভাব হয়। 'জপাৎ সিদ্ধি'র মধ্যেও এ-কথার তত্ত্ব পাওয়া যায়।

"নিশা নিশীথিনী রাত্রি"—এই জপের মধ্যে অন্ধকারের সমাবেশ। তেমনি শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় নিশীথিনী, কালীমূর্তি, নিবিড় কালো এবং সূচীভেদ্য অন্ধকার—কথা কয়টির সমাবেশ মোহগ্রস্ত করে। প্রকৃত অন্ধকারের রূপটি যেন হারিয়ে যায় মনের আকাশে যে অন্ধকার জমা হ'ল তার মধ্যে। যা ছিল sensuous (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) তা হয়ে গেল intellectual (বুদ্ধিগ্রাহ্য)। একহিসাবে একে বলা যায় সৎকবির সৎ-চৌর্য।

আসল কবিরা দু-এক কথায় সারেন—কালিদাস বলছেন "সূচীভেদ্যৈস্তমোভিঃ" বা "রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে"; বিদ্যাপতির "তিমিরপাতন";

রবীন্দ্রনাথের "লও লও তুমি সব কেড়ে লও, মাগিতেছি অকপটে—তিমিরতূলিকা বুলাইয়া দাও আকাশচিত্রপটে" বা "অতল আঁধার নিশা পারাবার"; —বেশীক্ষণ ধরে কিছু বলেননি। খুচ্‌খাচ্‌ করে এখানে একটু ওখানে একটু পরশ রেখে গেছেন যেন গোপাল ঘোষের ছবি, পিকাসোর তূলির Dab। Milton বলেছেন—"O dark dark dark, amid the blaze of noon, irrevocably dark, total eclipse without all hope of day—"—সেই ধ্বনি। কিন্তু Milton ছিলেন অন্ধ, তাই অন্ধকারকে অনুভব করেছেন নিবিড় করে। বিরাট দেখেননি। দেখেছেন ছোট করে। দিগন্ত যেন বুকে চেপে ধরেছে।—

Myself my sepulchre, a moving Grave,
Buried, yet not exempt
By privilege of death and burial—

অন্ধকারের রূপ এমনি ঠেসে ধরে, চোখকে কাছে টানে, দূরে টানেনা। অন্ধকার রাতের একটি তারা, অন্ধকার প্রান্তরের একটি দীপ মুহূর্তে দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যায়।

এমনি একটা আলো দেখলাম তলার দিকে বহুদূরে। সারি-সারি থরে থরে নেমে গেছে ঘন পাইনের অরণ্য। আকাশ দেখতে গেলে সামনে তাকাতে হয়। দূরের আকাশ দেখা যায়, কাছের আকাশ জমাট অন্ধকারে বাঁধা পড়েছে। চাপ-চাপ থক্‌থকে অন্ধকার, তাতে চোখের দ্যুতিও ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসে। সমস্ত উত্তরদিকটা ঘিরে অরণ্যসঙ্কুল বিরাট পর্বত-প্রাচীর। তলার দিকে অনেক গম্ভীরে একছিটে আলোর স্ফুলিঙ্গ।

ঐখানে একটি কুটীর আছে। তার পাশে আছে ঝর্ণা। পাশাপাশি একটু জায়গা খালি করে নিয়ে সেখানে মাটি ঢেলে চাষ করছে কে যেন পাহাড়ী দম্পতী। তাদের কুটীরে ক্ষীণ প্রদীপশিখা জ্বলছে হয়তো সাপের চর্বিতে। তার পাশে পাহাড়ী মা পিষছে জাঁতা, পাহাড়ী বাপ ছাড়াচ্ছে কাঁচা-চামড়ার উদ্‌বৃত্ত মাংসগুলি।

তারা কি জানে সুদূর বাংলাদেশ থেকে কে একজন বহুদূরের পর্বতশিখরে বসে তাদের ঐ ম্লান দীপশিখাকে অন্ধকারের সমুদ্রে আবিষ্কার করেছে মোহগ্রস্ত চৈতন্যসাগরে গুরুবাক্যের মতো। সে চেয়ে আছে শুধু এই আলোর বিন্দুটির পানে, আর ভাবছে—"Thereby hangs a tale!"

আমার তখন এক দ্বন্দ্ব। উঠে যাবো পাহাড়ের মাথার তাঁবুতে এবং পরে খাবার জন্য নামবো ; না, এখন থেকে যাবো, একেবারে খেয়ে উঠবো। পাহাড়ী পথে এই উঠে-নেমে পথ-চলার অভিজ্ঞতা যাঁদের না আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন না এতো সহজ ব্যাপারটাকে দ্বন্দ্ব বললাম কেন।

যাক্, নিষ্পত্তি হয়ে গেলো। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো, আর কন্‌কনে বাতাস। হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিতে লাগলো। বলা যায়, অন্ধকার যেন গায়ে কালো কম্বল জড়িয়ে নিলো। পাইনের বন ঝড়ে কাঁপতে লাগলো। হঠাৎ পিছনে কে যেন দাঁড়ালো। ঘাড় ফেরাবার আগেই কণ্ঠ শোনা গেলো— 'কলকাতায় থাকতে বাঙালীর সঙ্গে মিশেছি। প্রকৃতির প্রেমিক বটে এই জাত। প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাবার ক্ষমতা না থাকলে বাংলার গ্রামের মতো ভীষণ জায়গায় মানুষ থাকতে পেতনা।"

আমি ধরা পড়ে গিয়ে বললাম—"ডাক্তার যে ! বোসো।"

ডাক্তার বললে—"এখুনিই বরফ পড়বে। তোমার মতো মাথা-খারাপ তো হয়নি যে এই দারুণ দুর্যোগে বাইরে বসবো। গায়ে তো বর্ষাতি নেই দেখতে পাচ্ছি"—ব'লে গায়ে হাত ঠেকালে। বন্ধুর স্পর্শ।

আমি বললাম—"চামড়ার জার্কিন। চট্ করে ভিজবনা। তা ছাড়া বেশ গরম বোধ করছি।"

"তোমাদের এক কবি লিখেছেন ব'লে শুনেছি যে, তোমাদের বাস চিতা, সাপ, কুমীর, বাঘ নিয়ে—সত্যি কথা। পারো বটে তোমরা।"

আমি খুশী হয়ে বললাম—"হ্যাঁ—বাংলার কীট্‌স্ এবং সুইন্‌বার্ন—কবি সত্যেন্দ্রনাথ। তুমি জানলে কি করে ?"

"অবাঙালীর কাছে নিজের কাব্যের গৌরব করেনা এমন বাঙালী আছে নাকি মাস্টার ? আমি কলকাতায় তিনবছর ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতায় পাইনি। কতো কাব্যকথা বলবো তোমায় শুনো। এখন ওঠো, নইলে আমার এখানে হাসপাতাল নেই।"

এমন সময় বিউগ্‌ল্ বাজলো। ডাক্তার ও আমি খাবার-ঘরে গেলাম।

দিব্যি ব্যবস্থা। লম্বা করে দু'সার টেবিল পাতা। একখানাও চেয়ার নেই। প্রায় চল্লিশজন একসঙ্গে খাওয়া যায় দাঁড়িয়ে। ঘরে চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। ঝক্‌ঝকে চিনামাটির প্লেট ও দুটো করে বাটি,—কাঁচের গেলাসে

জল। গরম দাল, গরম আলু-টম্যাটোর তরকারি এবং রুটি। তেল-ঘি'র সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। মশলা থাকলেও টের পাওয়া যায়না। ডাক্তার বলে—"রিস্‌ক্‌ নেবোনা—বাজে জিনিস খেতে দেবোনা। খেয়েই মরে বেশী—না খেলে মরবেনা কেউ। ক্ষিধে থাকলে খাবে—hunger is the best sauce।"

বেশ লাগলো প্রথম দিন। বেশ খেলাম। কিন্তু ভারী বিব্রত বোধ করলাম সংবাদ শুনে যে দুধ মিলবে না। ইউ.পি. এবং গুজরাত তো ক্ষেপে গেলো শুনে। শুনতে রাজী নয় তারা। দুধের ব্যবস্থা চাই। ডাক্তার বললে—"কাল দেখা যাবে। আজ তো কথা ওঠেই না।"

বুঝলাম Khadrala Hotel-এর খবর এরা পায়নি।

তখন চুপিসাড়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা ভাই, কথাটা কি সত্যি যে জলের অভাবে নাইতে পাবোনা?"

ডাক্তার বললে—জগতে জন্ম নেবার পর দ্বিতীয় মিছেকথা সে শুনলো যার আর জবাব নেই।

"প্রথমটি কী"—জিজ্ঞাসা করলাম আস্তে আস্তে।

ডাক্তার চুপিচুপি কানে কানে বললে—"ইংরাজরা নাকি বদান্যতা করে আমাদের স্বাধীনতা 'দিয়ে' গেছে।—এর জবাব আছে কিছু?"

আমি ডাক্তারের মুখের পানে তাকালাম।

ও কি বুঝলো। হেসে বললো—"দেখছো কি?—ভুলছো তিনবছর কলকাতা, তারপর মালায়া, সিঙ্গাপুর—I.N.A.-র জন্মভূমি—নেতাজীর তীর্থ।"

আমি বললাম—"চান্‌ করা যাবেনা তাহলে?"

ডাক্তার বললে—"আলবাৎ! জলের অভাব কে বললে? তার বুদ্ধির অভাব, শক্তির অভাব। এইতো দু'মাইল গেলেই ঝর্ণা। অভাব কি?"

বুঝলাম ডাক্তার ঠাট্টা করছে।

ডাক্তার নিজের রসিকতায় নিজে হাসতে লাগলো।

আমি বললাম—"মরে যাবো ভাই, যদি নাইতে না পারি। ঐ ভয়ে আমার বিলাত যাওয়া হারাম হয়ে রইলো।"

ডাক্তার বললে—"তোলা জল, দু'হাজার টাকার contract—নাইবে সেই জলে? Contractor দেখলে আর রক্ষে রাখবে না।"

ওপরে ওঠবার আগে আস্তানার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম।

তাঁবুর মধ্যে ডাইরেক্টর আস্থানার বৈঠক। সাঙ্গোপাঙ্গ চারধারে বসে। ক্যাম্প-কম্যাণ্ডার সেহ্নী; বিউগ্লার পাটেল; এ ছাড়া তিনটি স্তাবক— ভর্মা, চতুর্বেদী এবং বাইসারিয়া। শেষ তিনটি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

পরিচয়পত্রের পর কথাবার্তা হোলো একটা ক্যাম্প-কোড খাড়া করা সম্বন্ধে। বিউগ্লারের হিন্দী-জ্ঞান এবং কম্যাণ্ডারের ডিসিপ্লিন-বাই মিলে যে জগঝম্প সিমলা-নারাকাণ্ডা পথে গেছে, তারপরে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা ওরা করতে চাইলেও আমাদের মনে কৌতুক। মনে মনে ভাবছি লরেন্স যদি কম্যাণ্ডার হয় আর হার্ডি বিউগ্লার, ক্যাম্প-কোড কতদূর কি করবে?

ক্যাম্প-কোড মোটামুটি হোলো এই: আটটায় কাজে হাজিরি, বারোটা পর্যন্ত কাজ। মাঝে একবার ছোলা-গুড় বিলি হবে। দুটোর মধ্যে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ। চারটেয় চা সেরে ইকনমিক সার্ভে আর সোশ্যাল স্টাডিজের জন্য এক একটি গ্রামে গিয়ে আলাপ পরিচয় করা; আটটায় রাতের খাওয়া সেরে ক্যাম্প-ফায়ারে দশটা পর্যন্ত হাজির থাকা। জলের দারুণ অভাব। জল ব্যবহার সম্বন্ধে কড়া র‍্যাশনিং হোলো।

সেহ্নী বলে—"রোজ একবার কুচ হওয়া দরকার।"

ভর্মা জবাব দেয়—"পল্টন দাঁড় করিয়ো গাছের মাথায়। জমি ব'লে তো কিছু নেই। সবই ঢালু। এর ওপর দাঁড়ানোই যায় না, তার কুচ!"

"জমিটাই ইন্-ডিসিপ্লিন্ড্!···এখানে ডিসিপ্লিন রাখা দায়।"

"জমিটাকে দুরুস্ত করার জন্যই তো আমাদের আসা"—বলি আমি।

ততক্ষণে বাতাস জোর হয়েছে। ভেতরের চুল্লীতে দেবদারু-কাঠের গুঁড়িতে গন্‌গনে আগুন, শিখা নেই। বাহির থেকে পাইন-নাড়া বাতাসের শব্দ সোঁ-সোঁ। গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ। ঝির-ঝির, ঝির-ঝির—একটা কেমন শব্দ বরফ পড়ার। নিঃশব্দ, অথচ স্পষ্ট। যেন ঘুমন্ত কুমারীর গভীর নিশ্বাস।

আমাকে প্রোগ্রাম তৈরী করতে বলতেই হেসে বললাম, "আমার মগজে মোটর চা-পেট্রল ছাড়া অচল, আস্থানা।"

"চা!" বিরক্ত ভর্মা বললো। "হাঙর এক শালাকে কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে—ঐ বালজী! দু-আনা এক কাপ। ফকির হ'তে হবে!"

যাক্ আমার জন্য ঢালাও চায়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলো। আমিও ওদের দৈনিক প্রোগ্রাম এবং আফিসের ভার নিলাম।

বাইরে এসে দেখি মেঘ সরে গেছে। চাঁদের আলোর বন্যা চারধার ছেয়ে গেছে। গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা-মাথা গাছ, পথ, খাদ ঝক্‌মক্ তো করছেই, দূরের হিমানীশিখরগুলোর শান্ত প্রভা জ্যোতি-সাগরে ভাসা স্বপ্নের নৌকা যেন।

গোপী আর বিক্রম চলেছে তাঁবুর দিকে। নীচের খাবার-ঘর থেকে ছেলেরা উপরে তাঁবুর দিকে আসছে।

অর্ধেক পথে বড়ো একটি পাকা লম্বা বাড়ী। কয়েকখানা ঘর এতে। আছেন শ্রীমতী ইন্দিরা এবং প্রেস-রিপোর্টাররা; তা ছাড়া হিমাচলপ্রদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট কর্মচারী। ভাবলাম ঘুরে যাই ওদিক। আর কারুর সঙ্গে না হোক, সাংবাদিক সেই শ্রীনাক মশায়ের দেখা তো পাবোই; আর বাগী-তে যে রিটায়ার্ড প্রিন্সিপ্যাল-মশায় বার বার সাবধান করেছিলেন "হিমালয়ের ঠাণ্ডায় 'টামী' (পেট)-টাকে ভালো করে ঢেকে রাখবে। টামী-তে ঠাণ্ডা লাগলেই নির্ঘাৎ ডিসেন্ট্রি"—সেই তাঁকেও দেখা যাবে।

ঘরে ঢুকে দেখি, ঘরে বসে দুটি বুড়ো, দুটি জোয়ান, একটি ড্যাঁটো আর দুটি বুড়ো-খোকা। সপ্তরথীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। আশ্চর্য নয়;—আশ্চর্য যে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছিলাম।

মুখে-সিগার সেই সাংবাদিকের নাক জবাকুসুম-সঙ্কাশং। ক্রমাগত রগ্‌ড়ে-রগ্‌ড়ে এই হাল! চোখের জল ঝরছেই, যেন এই-মাত্তোর পেঁয়াজ কুটে এলেন। কথা বলছেন সামলে, যেন নাক দিয়ে হাওয়া না বার হয়; হ'লেই হ্যাঁ-চ্চো!

আমাকে দেখে হাঁচলেন। বললেন—"এই যে; আসা হোলো? কেমন লাগছে? এর মধ্যে শাবল-গাঁইতি চালাবে এইসব ট্রাউজার-পন্থী খোকারা?··· যত্তো-সব নিকুচীর পাল্লায় পড়া গেছে!"

এমন লোককে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করার দুরন্ত লোভ সংবরণ করা নেহাত অরসিকের দুষ্কর্ম। আমি যেন কতো ঘাবড়ে গেছি। বাংলায় না ব'লে ইংরিজীতে বলি—"এঃ—বড্ড সর্দি ধরেছে তো আপনাকে। বুড়ো মানুষ—নিউমোনিয়া না হয়। টেম্পারেচার নেই তো?···সঙ্গে M.B. 693 আছে? নৈলে তো বিপদ···!"

শ্রীযুক্ত টামী, সেই অদ্ভুত ডাঁটো রিটায়ার্ডটি বলেন,—"জালিয়ো না বাপু বুড়োকে তুমি। সংবাদের জন্য এদের কুমীরের পেটে ঢুকতে হয়; কাবুলে ব'সে গান শুনতে হয়। কিন্তু তার বয়স আছে। এখন কি এসব পোষায়? তাতে ত্যাখো না…কথ্খনো খাদরালায় এমন সময় এই ডিসেম্বরী আবহাওয়া হয়না! হঠাৎ কাণ্ডখানা দেখছো?"

"ক্যাম্পের অবস্থা যা দেখছি…" ছাড়লেন শ্রীনাক। কী রাগ তাঁর!

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীডাঁটোর সান্ত্বনা। "আবহাওয়া নিয়ে ঘাবড়াবেন না। চীফ-এঞ্জিনীয়র সঙ্গে আছেন। কোনো ভয় নেই।"

অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কথাটিকে স্বীকার করা হোলো পরমসিদ্ধ বাণী হিসেবে, কারণ শ্রীডাঁটো হিমাচল-ক্যাবিনেটের নেট্ কেউ!

শিক্ষা-বিভাগের পদস্থ কর্মচারী অন্যতম বুড়ো-খোকা। দ্বিতীয়টি জঙ্গল-বিভাগ। শ্রীডাঁটোর সামনে শিক্ষা-বিভাগ খোকাতর হয়ে কৃতকৃতার্থ; জঙ্গল-বিভাগ খোকাতম। সমস্ত বাক্যের নির্গলিতার্থ—একটি মাত্র অনুনাসিক ঘোঁৎকার: 'হেঁ-হেঁ! হেঁ-হেঁ!' ওতেই সব কথার তুষ্টি, পুষ্টি, সমর্থন।

শিক্ষা-বিভাগ কুণ্ঠিত। "এ সময়ে এ আবহাওয়া সাতবছরের মধ্যে দেখিনি। কোথা থেকে ছেলেরা এলো। কী কষ্ট! যদিও আমাদের হাত নেই, তবু বেশ কুণ্ঠিত বোধ করছি।"

শ্রীডাঁটো মুরুব্বিয়ানা করে বলেন,—"হিমাচলপ্রদেশের অতিথিবৎসলতা সুপ্রসিদ্ধ।…এমন আবহাওয়া বাইরের আমদানি। অতিথিরা নিজেরাই হয়তো এনেছেন।"

তারপর শ্রীডাঁটোর তৃপ্তিকল্প সবার কী হাসি!

আমি বলি,—"আমাদের কষ্ট হচ্ছেনা। নতুন ব'লেই ভালোই লাগছে। আপনাদের অবশ্য খুবই কষ্ট হচ্ছে।"

শ্রীনাক কী বলতে যেতেই একটি ভ্রাম্যমান হাঁচির সুড়সুড়ি অনুভব করে নাকটি ঈষৎ তুলে মুখটিকে পুকুর থেকে সদ্য তোলা মাছের মতো বারকতোক 'হাঁপ্' 'হাঁপ্' করতে করতে হাঁচির বহিঃনিক্রমণের প্রতীক্ষা ও আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। আমরাও সেই অপরূপ দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইলাম। হাঁচি বেরুলো; সশব্দে। রুমাল বেরুলো পকেট থেকে, নীরবে। চোখের জলে গাল সিক্ত। বরুণদেবের কৃপাবর্ষণ ঘর্ষণে পরিষ্কার করে তিনি বললেন,—"এজাতীয়

করুণার…" আবার হাঁচির বেগ ; আবার হাঁচি ; আবার মোছা…এবং বাক্য পূরণ করা—"… কারণ ?"

"কারণ বয়স। এ বয়সে দুর্গম, দুর্জয়কে স্পর্ধাভরে আক্রমণ করাই স্বভাবধর্ম। ভয়ঙ্করের প্রেমে পড়েই পা-বাড়ানো আমাদের।"

শ্রীডাঁটো হেসে বললেন—"মানতেই হলো আপনি সাহিত্যিক।"

"মানবেনই ; কারণ বয়স হলেও, ও প্রেমে মন রাঙানো আপনারও।"

শ্রীক্যাবিনেট বলেন—"সেকি ! জানলেন কি করে ?"

হেসে বলি—"Elementary Mr. Watson ! আর কিছু জানিনা ব'লে। Simple elemenation."

"Splendid !" বলেন ডাঁটো। "ঠিক তাই। আমি ভাবলাম ছাত্রেরা আসছে ! সেই কবে লাহোর থেকে ছাত্রেরা যেতো হেথা-হোথা। এখন তো সেসব স্বপ্ন হয়ে গেছে। তাই যখন শুনলাম এতোবড় একটা ছাত্রদল আসছে প্রেমের টানেই যেন চলে এলাম। হার মানবেনা ভাই, হার মানবেনা। তবে জলটি ফুটিয়ে খাবে। আর ওই টামী ! ওটি সর্বদা ঢেকে রাখবে।"

শ্রীনাক ক্ষাপ্ চুরিয়াস্ ! "জল ফোটাবে ? ঐ জল ফোটাবে ? ও জল ফোটালেই সাবান। ও জল তেলে ভর্তি।"

শ্রীফরেস্ট-ডিপার্টমেণ্ট বলেন, "সত্যিই ; বড় বেশী তেল আছে জলে। কেরোসিন।"

চটে গেলেন শ্রীশিক্ষা-বিভাগ। "কেরোসিন ! যা সিগারেট চালাচ্ছো, কেরোসিন হ'লে পেটে আগুন ধরে যেতো এতোক্ষণ ! জানো এখানে এই জলের ব্যবস্থা করতে দু'হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট দিতে হয়েছে ? টিন কিনে, কস্টিক-সোডায় ধুয়ে, সেই টিনে খচ্চরের পিঠে করে জল আসছে চার মাইল দূর থেকে। কেরোসিন বসে আছে এখনও ! হ্যাঁ, গন্ধ থাকতে পারে। গন্ধ হোলো তোমার মাথার বোকামির মতো। সহজে যায়না। গন্ধে আর কী এলো-গেলো ?"

"কিছু না !" ছাড়লেন শ্রীনাক। "বিশেষ করে নাকই যখন বন্ধ। তবে এই জল দিয়ে যদি চা খেতে হয়—" বিরক্তির আধিক্যে কথাটা আর শেষ করলেন না শ্রীনাক।

"তবে কি শিক্ষা-বিভাগের মাথা ফাটাবে ?" শ্রীটামী প্রশ্ন করেন।

"নাঃ ! লিখবো ঠেসে আর্টিক্‌ল্‌ ।"

আমি উঠতে উঠতে বললাম, "বেশ, বেশ, তাই করুন । গুড্‌ নাইট !"

আকাশের তারা হিমের লেপে ঢাকা । পাইন-বনের ঘুমন্ত চুল বাতাস এসে নাড়া দিচ্ছে : জাগো, খাদরালা জাগো ! নতুন প্রাণ এসেছে—নতুন যৌবন । ঘুমিয়োনা ; জাগো । গান গাও—ঘুম-জাগানিয়া গান—

"তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখো
নিদ্‌-জাগানিয়া
তোমায় গান শোনাবো ।..."

রাত গভীর । ঘুম আসছেনা ।

স্নায়ুপ্রবণতা দোষ না গুণ, আমি জানিনা । জানিনা চিত্তকে বীণার মতো পেতে রাখা ভালো, না, জমাট কাদার মতো তাল পাকিয়ে রাখা ভালো । Ruskin-এর কথা মনে পড়ে *if we were sponges* আর *if we were earth-worms*,—মনে পড়ে *sensitiveness* আর *feeling*-কেই তিনি শিল্পীমনের চরম উপাদান ব'লে স্বীকার করেছেন ।

কেউ নেই জেগে । সমস্ত ক্যাম্প শুয়ে পড়েছে । জেগে আছি আমি, জেগে হিমালয় পাহাড়, আকাশের স্তব্ধতা আর দৈত্যের করালতায় ভীষণ ঐ খাদরালার বিরাট জঙ্গল । জেগে আছি আমি । জেগে আছে সত্যলোক, সপ্তর্ষি-মাল্য-চর্চিত মহামৌন, জেগে আছে দেববসতি হিমালয়ের পরতে-পরতে রহস্যের লতাতন্তুজাল । বাতাস তেমনি জোরে ; ঝিরঝির করে পড়ছে হালকা হিমের গুঁড়ো পেঁজা-তুলোর আঁশের মতো । চামড়ার জার্কিনটার ভাঁজে ভাঁজে জমে উঠলো সাদার বলিরেখা । নীচে পাতা রেন-কোটটা যেন পেঁজা-তুলোয় ভরে গেল ; ঝেড়ে নিতে হবে । মেঘের জাল কেটে গেছে । কুয়াশায় আচ্ছন্ন আকাশ । তার ওপারে "Queen Mab is in her throne" !

কিন্তু মন নেই এই নিকটের প্রয়োজনে । মন গেছে দূরের, নিশ্চিহ্ন নিরালম্ব দূরের অপ্রয়োজনে । একি "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু"—একি মর্মকোষে বদ্ধ মধুকরের গুঞ্জরন ! একি সহস্রদলে সঞ্চারিত যোগমায়ার লীলাবিভ্রম ! এই আমার মন, মাতাল হয়ে উঠলো নিঃশব্দতার নেশায়, প্রকৃতির মহাসমাধির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যেন নৃত্য করে উঠলো ।

হঠাৎ ডেকে উঠলো—পাখীই হবে। কোন্ পাখী জানিনা। ভারী মিষ্টি শব্দ। একসঙ্গে অনেকক্ষণ জিদ্ করে ডেকে গেল হালকা শিসের পরে শিস্। চমক ভাঙলো আমার। যেতে হবে তাঁবুতে। মাথা ভিজে গেছে, কারণ হ্যাট্টা হাতে ধরে রেখেছি।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেলাম। হাতে টর্চ।

জুন মাসের চার তারিখ। শুক্লপক্ষ, একাদশী তিথি। চাঁদ আর সারারাত চোখ বুজবেনা। আমার সাথী আজ সে। "আজি শুক্লা একাদশী হের তন্দ্রাহারা শশী"। রয়ে-রয়ে প্রাণে কেবল সাড়া জাগছে—"এ কোথায় এলাম, এ কোথায়!"

তাঁবুতে ওরা দুজনে ঘুমুচ্ছে। অন্যান্য তাঁবুতে সবাই নিঝুম। মাঝের টিনের শেডের তলায় আগুন জ্বলছে। ওধারে উনুনে বিরাট ডেক্‌চিতে জল ফুটছে। উনুনে জ্বলছে আরও বিরাট গাছের গুঁড়ি। দিব্যি জ্বলছে আগুন। তাঁবুর ভেতরটা তবু গরম। আমার বিছানায় আমি শুয়ে পড়লাম লেপ ও কম্বল চাপা দিয়ে।

উচিত ছিল ঘুমিয়ে পড়ি। সারাদিন টৈ-টৈ গেছে। ঘোড়ায় চড়ার কসরত গেছে। সুনিদ্রা হবার কথা। কিন্তু সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীতে তখন খিচ্ ধরিয়ে দিয়েছে অজ্ঞাতের, অপরিচিতির, নতুনত্বের টান। আমি পাইন-বন আগে দেখিনি। জোরে বাতাস দিলে কি-যে একটা দীর্ঘ-বিরহকাতর মর্মছেঁড়া ধ্বনি জাগে তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবেনা। চোখ বুজলেই সেই শব্দ যেন মনের দরজায় এসে ঘা মারে। তা ছাড়া সদ্য-ছেঁড়া পাইনের ডালের ওপর সতরঞ্চি পেতে বিছানা। পাইনের টাট্‌কা গন্ধ। নয়ন নয় মুদলাম। কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ সবাই যে জেগে-জেগে কাজ করে যাচ্ছে। তার কি? চোখ বুজলেই দেখতে পাই দু'শো ফুট ওপরের গভীর জঙ্গল আমার কেবল ডাক দিচ্ছে। আর সামনে জেগে উঠছে "অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্রতুষার কিরীটিনী": সেই রূপ। আর মনে পড়ছে ইক্‌বালের গান—

"পর্‌ওয়ত্ হ্যয় সবসে উঁচা
হমশায়া আসমাঁ কা
ওয়্হ্ সন্তরী হমারা, ওয়্হ্ পসার্বাঁ হমারা ···"

—সেই হিমালয় তার উদ্যত পাণি তুলে অভিবাদন জানাবে গঙ্গা-কাবেরী-গোদাবরী-যমুনার ছেলেদের। আমরা এলাম নদীধারের পরমতৃপ্ত ধরণীর

ভরা-বুকের আশ্রয় ছেড়ে বন্ধুর দুর্গম, কর্কশ পরশের লোভে। সেই লোভ যেন আমায় পেয়ে বসল। কেবল মনে হ'তে লাগল কখন হবে সকাল, কখন দেখব ঐ বিরাট বনভূমি, কখন দেখব স্তরে স্তরে, দলে দলে হিমালয় গিরি-শিখর-শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিবাদন। এই কথাই বুকে।

বলছিলাম কোন্ পাখী যেন ডাকছিল। বাইরে আসার মতো সাহস তখন নেই এমনি শীত, আর লেপের মধ্যে গরম। তাঁবুর মাথায় চড়বড় করে জল পড়ছে। তবু ভেতর থেকে পাখীর ডাকটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

খানিকটা পরে ঘুম ভেঙে দেখি শীতে যেন জমে গেছি। তলার হিম কাঁচা-পাইনের পাতা ভেদ করে দু'খানা কম্বল ও তোশক ভিজিয়ে দিয়েছে যেন। পায়ের দিকটা অসাড়-মতো। ওরা দু'ভাই বেশ ঘুমুচ্ছে। আমার শরীর যেন জবাব দিতে চায় এমন ঠাণ্ডা বোধ হ'তে লাগলো। একটা একটানা হিমশীতল বাতাসের স্রোত। চেয়ে দেখি পায়ের দিকে তাঁবুটার ছাত ঢালু হয়ে যেখানে থেমেছে সেখান থেকে মাটি প্রায় সাত-আট ইঞ্চি নীচে। তাঁবুতে আর জমিতে তাই ফাঁক। সেই ফাঁক বয়ে বাতাস ঢুকছে সোঁ-সোঁ করে। ঠেকাই সে-সাধ্য নেই।

একটা সিগারেট ধরালাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি চারটে। বেশ হ'ত এক কাপ চা পেলে।

Stevenson-এর কথা পড়া ছিল। Cadbury এক টিন ছিল, আর চিনির cubes। বাইরে উনুনে জল ফুটছিলই। গেলাস নিয়ে তাতে জল এনে গুললাম খানিকটা কোকো, দিলাম চিনি আর একটা জমাট টফি, একেবারে Parry-র। দিব্যি লাগলো খেতে। হঠাৎ গোপীর গলা; বললে—"এখন চা? গজব করলেন।"

বিক্রমও জেগে গেছে; বললে—"সত্যিই গজব; না দিয়ে খাবেন কি করে?"

বিক্রম খেলো। গোপী ভক্ত মানুষ; পূজা না সেরে খাবেনা। খেলোনা।

আবার সিগারেট ধরাচ্ছি যখন তখনও ঝরঝর ধারে বৃষ্টি। বেশ জোরেই পড়তে লাগলো।

একি দুর্যোগ! চিন্তায় পড়লাম। এমনি দুর্যোগে আজ পারমার-ই বা আসবেন কি করে; পতাকা-উত্তোলনই বা হবে কি করে? বাগী থেকে

এখানকার পথ এতো ভীষণ যে, বৃষ্টি পড়লে যাতায়াত একেবারে বন্ধ। তা ছাড়া বোম্বে, গুজরাত, বাংলা, উড়িষ্যার ছেলেরা এই শীত সহ্য করে থাকবে কি করে? ভাবতে ভাবতে কখন আবার তন্দ্রামতো এসেছে। কিন্তু ঘুমুতে পারিনি, এমনি বাতাস ও এমনি হিম।

উঠে আবার বসলাম। তলায় দুটো সোয়েটার চাপিয়ে তার ওপরে জার্কিন, তার ওপরে রেন-কোটটা প'রে টর্চ নিয়ে বেরুলাম। জুতো পরিনি পাছে ভিজে যায় ব'লে। নিবে গেছে মাঝের চুল্লীটা। ধারের আগুন জ্বলছে। জল ফুটছে সে-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আকাশ ধূসর। দু'হাত এগিয়ে দেখা যাচ্ছেনা এমনি মেঘ। বম্বের দলের তাঁবুটায় সোরগোল। দেখি ওরা সব শীতে কাঁদাকাটি লাগিয়েছে। শীত সম্বন্ধে ক্ষীণ অভিজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে ওরা প্রায় কিছুই আনেনি। দুজনার অবস্থা খারাপই দেখলাম।

মজায় আছে মির্জাপুর-দল। সবক'টা ছেলেরই বয়স কুড়ির কম। চোদ্দ-বছরও আছে। সর্বদাই ফষ্টিনষ্টি হৈ-হল্লা নিয়ে আছে। ওরা কিন্তু ঘুমুচ্ছে। উড়িষ্যার তাঁবুতে ওরা কথা বলছে;—কি বলছে বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। বাকী সব ঘুমুচ্ছে।

আমি Director-এর তাঁবুতে ব্যাটারি সহযোগে লাউড-স্পীকারটা ফিট্ করে চলে এলাম। জানতাম কেউ ব্যবহার করবে। ক্যাম্পে রসিক আছে কিনা দেখতে চাই।

হ'লও তাই। আমি তখন তাঁবু থেকে খানিকটা দূরে গেছি। হিমালয় মুখ দেখতে দেবেনা ঠিক করেছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে আদ্যিকালের বোমভোলা হয়ে বসে আছে। মনে-মনে অনেকটা হতকাম হয়ে ফিরে আসছি তাঁবুতে—হঠাৎ লাউড-স্পীকারে—

"Good morning, everybody—Today is the fifth of June, nineteen fifty two—It is Khadrala Radio speaking—Now it is six thirty in the morning ..." ইত্যাদির পরেই গান এলো ভেসে—"জাগো মুসাফীর ভোর ভই অব রৈন কাহাঁ হ্যয়্ সোনে কা"। তাঁবুতে বসে-বসে চকোলেট গুলছি আর শুনছি বাংলায়—"ডাকিল মোরে জাগার সাথী"।

বৃষ্টির জোর তখন খুব। খাদরালার জঙ্গল দাঁড়িয়ে ভিজছে। তার ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বাতাসে আর জলে মিশে, ভারী ডালপালার চাঞ্চল্যে

জড়িয়ে আসছে। নিবিড় সিক্ত পল্লবের মন্থর চাহনির মতো তার ব্যঞ্জনা আছে, চমক নেই। আমি দাড়ি পরিষ্কার করে মাথার চুল আঁচড়ে, জুৎ করে লেপে কম্বলে চাপা দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে লণ্ঠনের আলোয় পড়তে লাগলাম 'নৈবেদ্য'—আমার বহুদিনের সাথী চিরনূতন 'নৈবেদ্য'।

গোপী বললো—"আটটায় চা দেবে ওরা। যাবো কি করে?"

আমি বললাম—"যাবো না।"

"তবে চা খাবেননা বলুন?"

বিক্রম বললো—"এতো শীত আর বৃষ্টিকে নিয়ে সারারাত দার্শনিকতা করলাম চায়ের দোহাই দিয়ে।"

গোপী একঝলক হাসি উছলে বললো—"তার মানেটা কি হ'ল? কী দার্শনিকতা?"

"ভাবছিলাম জীবনে কতো চা-ই তো খেলাম। ভালো, মন্দ, এ-হাত, সে-হাত, দু-পয়সার ভাঁড় আর তিনটাকার সেট্—কিন্তু এই দুরন্ত শীত আর দুর্যোগের পরে চা—এ তো কখনও খাইনি। Hunger যদি খাদ্যের best sauce হয়, shiver পানের, চা পানের best sauce—আর আপনি কিনা অম্লানবদনে বললেন—চা খাবেন না।"

"না, খাবোনা তো বলিনি, যাবোনা বলেছি। এই বৃষ্টি আর শীতে ভিজে পেছল পথ দিয়ে তিনশো ফুট নেমে এক কাপ চা খেতে পারবোনা।"

"ঐ একই কথা। যাবেননা তো খাবেন কি করে?"

"পাবো, যাবোনা।"

"না—না—আপনি না গেলে আমরাও যাবোনা। আপনি ভাবছেন আমরা তো যাবোই, আপনার জন্য আনবো?"

"আদৌ নয়। তোমরা এতো ছোটলোক নও যে খামোকা একটা নিঃস্বার্থ উপকার করবে।"

"তবে পাবেন কি করে?" বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো গোপী।

আমি বললাম—"গীতা পড়োনি, যোগক্ষেম বহন করার ভার আছে একজনার। যোগের মধ্যে না পড়লেও ক্ষেমের মধ্যে পড়ে চা।...তবে তদ্গত হয়ে চা-উপাসনা করো।"

ছোট্ট একখানা মুখ, মাথায় খুলি-ঢাকা নোংরা একটা টুপী, পিট্‌পিটে চোখ-সুদ্ধু তাঁবুর পর্দাটা তুলে ভেতরে চাইলো।

জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম পাশের জলগরম-করা উনুনের তত্ত্বাবধায়ক ও। অগ্নিরক্ষারূপ ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্যটি পালন করছে। নিজেই কুড়ুল হাতে কাঠ কেটে এনে উনুনের আগুন রাখবে। শীতে আমরা কেমন আছি জানতে এসেছে। ভেতরের মতলব একটা সিগারেট। ভেতরে আসতে বললাম, বসতে বললাম; একটা সিগারেট দিয়ে নিজে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলাম। তারপর 'আত্মতাই' করতে লাগলাম, যাকে বলে তোয়াজ—pampering। নাম বললে—কুর্মীরাম।

অবশেষে ও খুশী হয়ে রাজী হ'ল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি ঘটি ভরতি গরম চা ও তিনখানা আলুর পরোটা এনে হাজির করলো।

গোপী বললে—"ধন্য আপনার তপোধন। যোগক্ষেম হাতে হাতে।"

অন্যান্য তাঁবু থেকে ছেলেদের ঈর্ষা-কষায়িত চাহনি বিদ্ধ করছিল আমাদের তাঁবুর মধ্যেকার বিলাস। কিন্তু ঝিরঝির করে বৃষ্টি, রাতের বরফের ধকল, সব মিলিয়ে সহজ গতিবিধিকে নিষেধ-নিরস্ত করে রেখেছিল। চা-পর্বের পর সিগারেট সেরে লেপ চাপা দিলাম। এখন একটু ঝিমিয়ে পড়েছি। অন্যায় নয়। সারারাত ঘুম তো হয়নি। এদিকে ঘটি হাতে নিয়ে রেন-কোট চড়িয়ে গোপী ও বিক্রম বেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে পুলকিত হয়ে জেগে গেলাম।

একি! একেবারে অন্য দেশ, অন্য দৃশ্য। কয়মিনিটের মধ্যে সমস্ত মেঘ ও কুয়াশা উড়ে গিয়েছে। আকাশ সুনিবিড় নীল, তাতে ঝক্‌ঝকে রোদ যেন খাপ থেকে খোলা ইস্পাতের ধার। ছেলেদের চাঞ্চল্য, ঘোরাফেরা—আর লাউড-স্পীকারের গান চলেছে—"তোমার বীণা আমার মনোমাঝে কখনও শুনি কখনও ভুলি কখনও শুনিনা যে"। ভৈরবী তখন দারুণ জমেছে। আমি যেন আলোর সমুদ্রে হঠাৎ তলিয়ে গেছি, খুঁজে পেয়েছি আনন্দের স্বপ্নপুরী। কোনওমতে জার্কিনটা চড়িয়ে জুতো প'রে বেরিয়ে এলাম।

চারধার থেকে—"Good morning, professor", "Splendid weather, professor", "Exuberant"!—ইত্যাদি প্রাণচঞ্চল অভিবাদন ও অভ্যর্থনা।

ফিরে তাকালাম বহুপ্রতীক্ষিত আজীবনের স্বপ্নসাধনা দেবতাত্মা হিমালয়ের পানে। যেন প্রথম-সমাগম-লজ্জিত সেই চারিচক্ষুর শিহরিত চাহনি। এই সেই হিমালয়। খাদরালার জঙ্গল আমাদের ছাউনীর পশ্চিমে, খাদরালার উপত্যকার ঢাল নেমে গেছে পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে। উত্তর ও পূর্বে জড়িয়ে অর্ধবৃত্তাকারে গিরিশ্রেণী ওপরমুখী হয়ে দেখতে হয়। দক্ষিণে নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা একটার পর একটা পাহাড়। হিমালয়—চিরদিনের আকিঞ্চন—মনের লোভ, প্রাণের সাড়া—জীবনের আদর্শ—হিমালয়।

সূর্য পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে উঠেছে। উত্তরের পাহাড়ের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে তার সদ্যধৌত কিরণ। চাওয়া যাচ্ছেনা যেন তাদের অদ্ভুত সেই রজতগিরিনিভ মহিমার পানে। নিকটের পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে জমাট বরফ যেন গলে পড়েছে হিমানীর ধারায়। তার ওপরে পাহাড়, তারও ওপরে পাহাড়—পর পর পাঁচটা শ্রেণী উঁচু, আরও উঁচু হয়ে গেছে। ওরই ওধারে তিব্বত। একবার উঠতে পারলে কেবল সমতল। কিন্তু এখান থেকে ঐ পাহাড়ের দূরত্ব হাঁটাপথে নব্বুই মাইল, অর্থাৎ একসপ্তাহের পথ তো বটেই। উচ্চতা যোলো হাজার ফুট। মানে আরও দু'হাজার ফুট। কিন্তু সারবন্দী বরফের ঢেউএর পর ঢেউ দাঁড়িয়ে আছে, যেন ফেনিল সমুদ্রের বীচিমালা জমাট হয়ে গেছে মহামৌনের সংস্পর্শে এসে।

এর বর্ণনা দেবো এ-লেখনী আমার নেই। অবশ হয়ে আসে অনুভূতির সূক্ষ্মতন্ত্রীগুলি। শ্যামলিমা নেই কোনও দিকে কোথাও। কেবল বর্ণ-বৈচিত্র্য; সাদা, কালো, তামাটে, বেগনীর নানা ছায়াপাতের নীরব কাকলিতে সদাজীবন্ত ঐ দিগন্ত। পরতে পরতে, স্তরে স্তরে, একটা কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, সমগ্র কাঞ্চনময় দেহের লীলাতরঙ্গ এখানে নর্মভূমি পেয়ে মেতে রয়েছে যেন। আমি যেন 'নিবাত-নিষ্কম্প যোগাধিরূঢ়' সেই রূপটি পেলাম না। পেলাম নিতম্বিনী গরবিনীর রৌপ্যমেখলামণ্ডিত লাস্যময়ী পদবিভ্রম। স্তরে স্তরে সাদা মেঘের উত্তরীয় ক্ষণে ক্ষণে ছুঁতে চাইছিল চটুলার দেহলাবণ্যকে; কিন্তু পারছিল না। নীলের অশেষে সে উত্তরীয় ভেসে যাচ্ছিল, আর সচকিতা দিগ্বলয়িতা সেই সুন্দরীর দেহতরঙ্গে তার লাস্যময় উপহাস খল-খল মৌন প্রগল্‌ভতায় ঝলক দিচ্ছিল।

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—কে সে দেবতা, কোন্ সে হবি? কিন্তু

উদয়ভানুর জ্যোতিঃপুঞ্জে জীবন্ত এই তুষার-শিখাগুলির সম্মিলিত রূপ কোন্ সে মহাদেবতার স্তব আমি জানিনা। ইনি যদি সেই দেবতা হন, আমি একনিমেষে বুঝলাম, আমিই সেই হবি। নিজেকে বিলিয়ে দেবার এমন অবসর বুঝি আর নেই।

শুধু যে কবিতা নয় তা বুঝি। এই হিমালয়েরই পরতে-পরতে, ঝর্ণার ধারে, জঙ্গলের কোলে ছোট ছোট গ্রাম আছে। তার ভেতরে নিরক্ষর, অর্ধনগ্ন, বুভুক্ষিত নরনারী নিরন্তর কঠিন সংগ্রাম করে চলেছে দিনান্তে তু'মুঠো খেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। জানি ওদেরই মধ্যে অনেকে অনেকসময়ে ঈর্ষা করে বনের পশুকে। ভাবে: "ওরাও তো খায়, খেয়ে বাঁচে। কিন্তু পাথর কেটে জল ছেঁচে এই তুর্নিবার সংগ্রাম চালিয়ে ওদের বাঁচতে হয়না।" ওরা সেই সংগ্রামের মধ্যে একবারও ভাবেনা কী চমৎকার এই হিমালয়। জানি আমার এ কবিতা সমতলভূমির সুখলালিত মানবশিশুর মনোবিলাস, রম্য-তাগাদা। ওদের জীবনে এ ছন্দ, এ স্তব জাগেনা।

শুধু তাই নয়। এই হিমালয়কে কেন্দ্র করে চীন, তিব্বত, রুশ ও আফগানিস্তানের কতো পলিটিক্স। এখন আবার পাকিস্তানও যোগ দিয়েছে; এই হিমালয়ের অফুরন্ত কাঁচামাল দূর-দূরান্ত থেকে বিদেশী ব্যবসায়ীকে টেনে এনে বসিয়েছে এদের মধ্যে। নুন দিয়ে বোরাক্স নিচ্ছে, দেশলাই দিয়ে শিলাজতু, তামাক দিয়ে কস্তুরী, তুলো দিয়ে পশম—আরো কতো বলবো। এই চমৎকার ফন্দী দিয়ে সাজানো লুঠতরাজ ব্যবসার নামে দিব্য চলে যাচ্ছে। দেশের শাসন-কাজের ভার যাঁদের, তাঁরা এসব দেখার সময় এখনও পাননি।

তাই বলছিলাম আমার চোখে আজ এই নগাধিরাজ পরমধাম দেবভূমির মূর্তিতে প্রতিভাত হ'ল, সত্য। তাই ব'লে এই ফুলের মধ্যে যে কীট আছে তাকে আমি ভুলিনি। আমি দেখব তাকে; পারি-না-পারি তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। আমি এদের সঙ্গে মিশবো।

চমক ভাঙলো পালিশ-করা কণ্ঠস্বরে—"আপনারা সব কে কেমন আছেন, দেখতে এলাম।"

লোকটির কথা আগে বলেছি। শ্রী মহাজন। সিমলার রাষ্ট্রপতি-ভবনে এঁরই লাঞ্ছনা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি-ভবনের দ্বারপালের কাছে। ইনিই আমাদের সুবিধা-অসুবিধার তত্ত্বাবধায়ক। চমৎকার কর্মনিষ্ঠ, সদালাপী ও কর্তব্যানুরাগী

ভদ্রলোক। সুপ্রীম-কোর্টের মাননীয় বিচারপতি মহাজনের নিকট-আত্মীয়।

তাঁর পিছনেই শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পদ্মদেবজী। এমন সচকিত করে এলেন যে, না ভেবে-চিন্তেই বললাম—"বেশ আছি, বেশ চমৎকার। চমৎকার ব্যবস্থা, এই দুরন্ত জঙ্গলে আর এর বেশী কি হবে?"

এই বলার জন্য গোপীর কী রাগ! "আচ্ছা মশাই, মাস্টার হ'লে কি বুদ্ধি থাকতেই নেই? একেবারে লেখা? সারারাত শীতে কাঁপলেন, আর তাঁবুটা ঠিক করার কথা বললেন না?—আর অন্ততঃ চায়ের ব্যবস্থাটা ওপরে রাখার কথা?"

বিক্রম বললো—"হোস্টেলে এবং বাড়ীতে গোপীভাইকে আমরা কী নামে ডাকি জানেন?—নবাব-সাব। পান থেকে চুন খসলেই অস্থির উনি।"

"ওহো, ঠিক বলেছ ভাই,—পান। পান যে আমার ফুরুবে ভাই, এর ব্যবস্থা কি করি।"

বিক্রম হাসতে লাগলো মুচকি-মুচকি।

"মজাক নঁহি য়্যার—না না, ঠাট্টার কথা নয়, ভাই। পান নইলে আমি বিলকুল মরে যাবো, বিক্রম—বিলকুল মরে যাবো। তখন শবদেহ জ্বালাবার মতো উত্তাপটুকুও কলেজায় পাবেনা তোমরা।"

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম—"আচ্ছা, যাতে বিলকুল না মরো সে-ব্যবস্থা আমি করবো। আপাততঃ চলো। চমৎকার আলো। একটু ঘুরতে বেরুই।"

মাথার ওপরেই খাদরালার বিরাট জঙ্গল। খাড়া পাহাড় উঠে গেছে প্রায় ৯০ ডিগ্রী, তবে কাত-করা বড় বড় চাঁই আছে, আর আছে বরাসের গাছ। আমি বললাম—"পারবে গোপী ঐ চূড়ায় উঠতে? পাহাড়-চড়া অভ্যাস আছে?"

"না, নেই। কখনও চড়িনি। তবে পারতেই হবে। আপনার অভ্যাস আছে?"

"না, অভ্যাস বলা চলেনা, তবে বিপদ পার হয়েছি অনেকবার। এ তো দেখছি ওপরে সব পাইনগাছ। যুগযুগান্ত পাতা ঝরে-ঝরে সারা পাহাড়টা

পাইনপাতায় ঢেকে রেখেছে। সাংঘাতিক এই পাহাড়গুলি। পায়ে-হাঁটা রাস্তার চিহ্ন নেই। পাহাড়ের ভাঁজগুলি পাতায় ভরাট হয়ে উঁচুনীচু একাকার হয়ে গেছে। সমান ভেবে ঐ খাঁজে পা পড়েছে কি একেবারে পিছলে পড়তে হবে। এখান থেকে পিছলে পড়লে আর দেখতে হবেনা!"

দেখলাম দুজনার মুখই সাদা। বললাম—"কি? চড়বেনা?"

দুজনাই বললে—"সেকি একটা কথা হ'ল নাকি?—চলুন।"

খানিকটা পথ ঘুরে বেছে বেছে চড়াই ওঠা গেল। কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ করলে এই রামখাড়াই চূড়ার মাথায় ওঠা যাবে। ঘুরে ঘুরে চেয়ে-চেয়ে কেবল তাই দেখতে লাগলাম। হঠাৎ বিক্রমের পা পিছলে গেল। একেবারে আট-দশ হাত গড়িয়ে একটা গাছ ধরে ফেললো।

হাসলাম সবাই। বিক্রমও।

বললাম—"জুতো খুলে ফেলো। পাইনপাতার ওপর চড়ার জন্য কাঁটা বা দাঁতওলা স্বতন্ত্র জুতো হয়। এখানে তোমার ঐ 'স্যাময়' চলবেনা।"

জুতা খোলা হ'ল।

"রাখবো কোথায়?"

এবার আমার হাসার পালা। "এখানে জুতো যেখানে খুশী রেখে যাও গাছের ডালে বেঁধে। নেবে কে?"

ওরা তাই করলো। আরও খানিকটা অতিকষ্টে উঠলাম। একটু দাঁড়াবার জায়গা নেই এমন খাড়াই। উবু হয়ে, প্রায় বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগলাম। হাঁপিয়ে পড়ি একটু পরেই। জিরুতে যা হয় তাও ঐ উবু হয়ে। তখন আমাদের এক লক্ষ্য ওপরে কোথাও একটু পাথরের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা যেখানে একটু বসা যায়। খানিকটা আরও উঠে একটা মস্ত চাঁই পাওয়া গেল। সেখানে এসে বসলাম। সবাই বিপুল হাঁপাচ্ছি। আমার কপালে তো বিন্দু বিন্দু ঘামই দেখা দিল।

গোপী বললে—"এর আগে কোথায় এমন খাড়াই চড়েছেন আপনি?"

মনে পড়ে গেল অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ চঞ্চল একটি মধ্যাহ্ন।

আমার প্রথম সিমলা যাবার তৃতীয় দিন। খাওয়া হয়ে গিয়েছে। রোদ

ঝলমল করছে। মনে হ'ল একবার বেড়িয়ে আসি। এমনিই বেরিয়ে পড়তে যাবো। প্রেয়সী বললেন—"কোথায় চললে এখন ?"

ডিসেম্বরে বিয়ে করেছি। জুনের ঘটনা। জবাবদিহি করার দায়িত্ব এখনও সম্পূর্ণ। বললাম—"এমনি বেড়াতে।"

তৎক্ষণাৎ আক্রমণ—"আমিও যাবো।"

গলে পড়ে বললাম—"আহা এমন ভাগ্য আমার! চলোনা।"

ব্যস্—এমনিই দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

তখন তো রাস্তা চিনিনা। বেম্লোর চড়াই ভেঙে মালে উঠেই বাঁ-হাত পথ ধরলাম। তারপর খানিকটা গিয়ে একটা সুন্দর পাহাড়ের গা-ঘেঁষা পথ পেলাম। পাহাড়টা যেমন বড় তেমনি খাড়া, আর তেমনি বিরাট বিরাট পাইনে ঢাকা। দেখেই ইচ্ছে হ'ল সোজা বেয়ে উঠি।

উনি বার বার নিষেধ করলেন। "অত খাড়াই পারবেনা। জুতো পরা—পারবে কেন ? কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, জানা নেই শোনা নেই…"

ততক্ষণে আমি অনেকটা উঠে গেছি। উনি সেই সরকারী রাস্তায় দাঁড়িয়ে হিতোপদেশ আওড়াচ্ছেন মিত্রলাভের আশায়। মিত্র আর নামেনা! অগত্যা উনিও উঠতে লাগলেন।

তারপর চড়ছি তো চড়ছি-ই। যখন আধাআধি শেষ করে এনেছি পাহাড়টা—তখন নীচের দিকে তাকিয়ে ভয় করতে লাগলো। একমাত্র পথ তখন উঠে যাওয়া। নামা দুঃসাধ্য এবং বিপজ্জনক। পাইনের পাতা কেবল হড়কাচ্ছে।

শেষ অবধি উঠলাম। পরে বুঝলাম পেছন দিক থেকে জ্যাকো-পাহাড়ের মন্দিরে এসেছি।

আজ সেই কথা ওদের বললাম।

"বলেন কি! মহিলা হয়ে উনি উঠে গেলেন খাড়া জ্যাকো-পাহাড় ?"

আমি বললাম—"দেখা হ'লে তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো।"

"তবে তো আমরা পারবই"—ব'লে ওরা আবার উঠতে সুরু করলো। কিন্তু এটা জ্যাকো-পাহাড় নয়, এবং কেদার-বদরীর পথও নয়। জ্যাকোর চেয়ে ঢের বেশী খাড়াই, এবং গভীর অজ্ঞাত অরণ্যে এর পরিণতি ; কেদার-

বদরীর মতো পথ নেই এর গায়ে, নেই পথচারীর সাহচর্য বা আশ্বাস। নিরঙ্কুশ, নির্মম খাড়াই। ওপরে চাইতে গেলে ঘাড় উঁচু করতে হয়, নীচের দিকে চাইবার মতো সাহস পাওয়া যায়না। পা হড়কেই চলেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু এতক্ষণে সয়ে গেছে।

মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা পাথর ঝুলছে। সেটাকে কি করে পার হওয়া যায় এই ভাবনা হ'ল। ওদের বললাম—"বোসো। আমি এই পাথরটার শেষ অবধি দেখে আসি—ঘুর-পথে যাওয়া চলে কিনা।"

ওদের কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই আমি চললাম। খানিকটা গিয়ে দেখি একটা গভীর খাদ—গহ্বরের মতো নেমে গেছে। তার ওপারে চালু পথ আছে। যেতে পারা যাবে। কিন্তু ওপারে যাওয়া যায় কি করে?

একটা বরাসগাছের ডাল ওপার অবধি গেছে। এখন গাছে চড়ে ডাল ধরে ঝুলে যাওয়া যেতে পারে; কিন্তু যদি···

নাঃ, এখানে ঐসব 'যদি'র কথা ভাবতে গেলে demoralised হয়ে যেতে হয়; বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। আমি এসে বললাম—"চলো, পথ পেয়েছি।"

ওদের উৎসাহ দমেনি। চললো। কিন্তু সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে পাথরটা জড়িয়ে জড়িয়ে যখন ওরা গহ্বরটার ধারে এলো তখন শুধু বললে—"এখন?"

আমি বাক্যব্যয় না করে গাছের ডালটা লাফিয়ে দু'হাতে বেড় দিয়ে ধরলাম এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই এপারে এসে হাসতে লাগলাম।

ওরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। আমি চলে আসার পর ওরাও সাহস করে একে একে এলো। কিন্তু আসল ভয়ের এখনও বাকী ছিল তা টের পাইনি।

এপারের ঢালু পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগলাম। খাদরালার চূড়ায় এলাম এবং সেই গভীর অরণ্যের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অরণ্যের রূপ দেখতে লাগলাম। এ ছোটনাগপুরের অরণ্য নয়, তরাইয়ের অরণ্য নয়, এ হ'ল হিমালয়ের গিরিচূড়ার বেণীবন্ধ; জটাজালও নয়। কুন্তল এ, কবরীর বন্ধনে যাবার কামনা এর বুকে। ঘন-সবুজ এত ঘন যে, কালো ব'লে বোধ হয়। সদাসর্বদা দোল খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, আর অনন্ত অশেষ কলগুঞ্জন—যেন একসঙ্গে দশখানা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জল নিচ্ছে।

হঠাৎ এই জায়গায় এসে মনে হ'ল খাদরালার জঙ্গল ভালুকের জন্য প্রসিদ্ধ।

বার বার সেই সাংবাদিক ব'লে দিয়েছিলেন এই ভালুকের কথা। যদি একটা ভালুক এই মুহূর্তে এসে দাঁড়ায়, বা একটা পাহাড়ী পাইথন ঝুপ করে গাছের ডাল থেকে লেজ ছেড়ে দিয়ে ঘাড়ে এসে পড়ে!

এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি স্থাণু হয়ে গেলাম। নড়তেও পারিনা, থম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারিনা। সে এক ন-যযৌ-ন-তস্থৌ অবস্থা। বুক দুরদুর করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি কোমর থেকে ছোরাখানা বার করে একটা বড় ডাল ভেঙে নিলাম।

ওরা দুজনে জিজ্ঞাসা করলো—"ডাল ভাঙলেন যে?"

বললাম—"বনচর হ'তে গেলে বনের অস্ত্র চাই। সঙ্গে দেশলাই আছে তো?"

ওরা যেন কি বুঝলো। বললে—"কেন?"

বললাম—"অচেনা জঙ্গল। যদি কিছু আসে। বন্যজন্তুর সবচেয়ে ভয় আগুনে। থাকুক দেশলাই আর শুকনো পাতা।"

পাতা তো সবই ভিজে আছে। কিন্তু তখন ঐ পর্যন্ত ব'লেই খালাস।

সমগ্র বনভূমিতে যেন রহস্য মাখানো। ইচ্ছা ছিল এরই একধার থেকে ভালো জায়গা দিয়ে নেমে যাবো। সাহস হ'লনা প্রবেশ করি। বড় রহস্য-নিবিড় এই অরণ্য। একেবারেই কুমারীর মন। চঞ্চল করে তোলে প্রাপ্তির সম্ভাবনা; পাওয়া দুঃসাধ্য—কেবল চরণশীল, পলাতকা, চটুল চপল রহস্যময়ী।

মনে তখন একটা আবেশ। হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি পাখী আর্তনাদ করে উঠলো। চেয়ে দেখি একটা প্রকাণ্ড ঈগলের মতো রুক্ষ পাখী এসে চেপে ধরেছে একটা গোসাপের শরীর; নিমেষে শূন্যে চলে গেল নখরে বিদ্ধ করে সেই গোসাপটা। অন্য একটা গোসাপ পলকে অদৃশ্য হ'য়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো।

হত্যা বিভীষিকা। খাদরালার জঙ্গলে এই হত্যা নানা ভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। তার কাহিনী যথাসময়ে বলবো। কিন্তু আজ এই আরম্ভ। হঠাৎ যেন সবাই হকচকিয়ে গেলাম। নামবার জন্য চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সেই গহ্বর পার হ'তে পারা যাবেনা। সে-সাহস কেমন করে জানিনা চলে গেল। নিরবয়ব ভয় কেমন করে যে পেশীকে শিথিল করে, ইচ্ছাকে

নিষ্ক্রিয় করে দিবালোকে, তা আজ এই প্রথম অনুভব করলাম। ভয়ানকের সঙ্গে মুখোমুখী হ'তেই ভীত হয়ে পড়েছি।

পথ পেতে হবেই। খানিকটা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতেই তলায় সারি সারি তাঁবু দেখতে পেলাম। কিন্তু পাহাড় একবারেই খাড়াই। নামা অসাধ্য। সে-আশা ত্যাগ করলাম। তবু শিবির দেখে যেন সাহস পেলাম। সামনে হিমালয়কে চোখ ভরে দেখতে লাগলাম, যেন মহিমাকে পূজা করতে লাগলাম। পিছনে গভীর নীল, সাহেব-বাচ্চার চোখের-চাওয়ার মতো, পুরীর সমুদ্রের দিগন্তের মতো; তার বুকে সাদা-সাদা গিরিশৃঙ্গগুলি জমাট মাখনের মতো কোথাও, কোথাও গলিত আইস-ক্রীমের মতো, কোথাও বা রূপোর পাতের মতো—দাঁড়িয়ে আছে। সাদার যে এতো রকম হয়, সাদার যে এতো তেজ হয়, এর আগে দেখিনি। অসিতগিরি, শুভ্রহংস, দুগ্ধফেননিভ, রজতগিরি, হিমানী-প্রবাহ, পেঁজা-তুলো—সাদার কত বর্ণনাই ছেলেবেলা থেকে পড়েছি। অন্নদাশঙ্করের লেখায় যেন কোথায় পড়েছি এদেশের কবিদের চোখে রঙের বৈচিত্র্য নেই, রং ফুটেছে শীতের দেশের কবিদের চোখে। ওদের চুলের নানা রং, চামড়ার নানা রং—ওদের কাব্যে সাহিত্যে তাই রং ধরবার ভাষা অফুরন্ত প্রাণবেগে বেগবতী। আমাদের কালো চুল আর কালো চোখ। তার বেশী নেই। কিন্তু আজ এই সাদার বর্ণনা করতে বসে কত সাদার কথাই যে মনে পড়লো! বাড়ীতে বসে জানতাম না সাদারও এতো রকম হয়। এখন বুঝছি বেকায়দায় পড়লে সবদেশের কবিদেরই রঙের জালে বাঁধা পড়তে হয়।

অবশেষে একটা ঢাল ধরলাম। বড় বেশী ঢাল। প্রায় শুয়ে শুয়ে চিৎ হয়ে একটু একটু হড়কে-হড়কে নামা। খুব সন্তর্পণে। পরে দেখা গেল, উপুড় হয়ে একটু একটু পিছু সরে সরে নামাই ভালো। সেইভাবে নামতে নামতে হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনলাম। বাঁ-চোখে আড়ে একবার দেখলাম বিক্রম ভীষণ বেগে গড়িয়ে চলেছে। তার আর বিরতি নেই। ঢালটা একেবারে হাজার-দেড়হাজার ফুটের তলায় খাদে গিয়ে নেমেছে। বিক্রমের আর আশা নেই! একমাত্র ভরসা যে, ও উপুড় হয়েই নেমে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি গড়াচ্ছেনা। আমি দু'হাত ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছা করে হড়কে গেলাম ও মিনিটখানেকের মধ্যেই পাইন-পাতার ওপরে বেগে হড়কে নামতে লাগলাম। হাতে ধরা লাঠিটা আর ছোরাখানা।

মিনিট তিন গড়ালাম। বিক্রম তখন আমার খুব কাছে; বললাম—"পা ধরে ফেলবার চেষ্টা করো, দাঁড়াবার চেষ্টা কোরোনা।" গোপী ভীতু সাবধানী ছেলে; একটু একটু করে নামছে। ছোরাখানা দাঁতে চেপে লাঠিটা মাথার ওপরে ধরলাম দু'হাতে দু'ধার চেপে। যা চাইছিলাম সেই লক্ষ্যটা আসতেই লাঠির দুটো ধার দুটো পাইনের গাছে আটকে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম জোরে ঝট্কা দিল। জুতো থাকলে, খুলে যেতো। কিন্তু পা খালি। বিক্রম সামলে নিলে। প্রায় তাঁবুর কাছাকাছি নেমে এসেছি। দাঁড়াতে পাবার পরেই দুজনার পানে দুজনে চেয়ে হেসে ফেললাম। এই আভযানে আমাদের হতাহতের তালিকা কম নয়—দুটি শার্ট, দুটি কোট, হাঁটুর ছাল, একটি কব্জি, থুঁতনির একটু অংশ এবং কোমর, সেটা উভয়ের। সেটা অবশ্য পরদিন সকালে বোঝা গেল। গোপীর শোক জুতোর জন্য। কিন্তু আমি জুতোগুলো আনিয়ে নিয়েছিলাম শ্রীমান তুস্‌সীরামকে দিয়ে।

এখন মনে হয়, প্রথম দিনের দুর্ঘটনা হ'য়ে ভালোই হ'য়েছিল। আমরা তিনজনে যেন একবয়সী হ'য়ে পড়েছিলাম। বিশেষ করে বিক্রম যেন আমায় একেবারে হৃদয়ে বসিয়ে নিলে সেইক্ষণ হ'তে।

জোর রোদ তখন। তুস্‌সীরাম বললো—"এক বালতি গরম জল এনে দিই তোমায়, ডাক্তার-সাব। চান করে নাও।"

"সেকি রে! ডাক্তার-সাব কি রে?"

উত্তর যা দিলে একেবারে অভ্রান্ত। "বাঃ রে, জংলী ব'লে কি আমি জানোয়ার? তোমার মতো জোয়ান চেহারা আর মোটা চশমা আর চামড়ার কোট কি ডাক্তার ছাড়া হয়?"

পরে জেনেছিলাম ওদের গাঁয়ে এসে যে সরকারী ডাক্তার অত্যাচার করে যায় তার গায়ে চামড়ার জার্কিন ও চোখে কালো ফ্রেমের মোটা চশমা। তবে তুস্‌সীরাম আমায় নিয়ে খোশমেজাজে ছিল। ওর গাঁয়ে যখন গিয়েছিলাম তখন সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এমনকি মদ ও সুন্দরী নারী উপঢৌকনও এনে দিয়েছিল—ডাক্তার-সাব যে আমি!!

যাক্, গরম জল নিলাম না। ঠাণ্ডা জলেই চান সারলাম। সবাই ভয় দেখালো। কিন্তু গরম জলে স্নান করা একেবারে অনভ্যাস। গরম জলে স্নান ক'রে স্নানের সুখ ঠাণ্ডা চা খাবার মতোই সুখাবহ। স্নান ক'রে এতো ভালো

লাগতে লাগলো যে, গান ধরলাম—"তোমায় নতুন ক'রে পাবো ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণে..."

তখন বেলা বারোটা পার।

বিক্রম বললে—"নবাব-সাবের পূজা শেষ। খেতে চলুন।"

সেই দাঁড়িয়ে খাওয়া। মেন্যু বদলেছে—রুটি, দাল, দই দিয়ে আলুর রায়তা। বাঙালীর পক্ষে মাথা ঠিক করে খাওয়া একটা পরীক্ষা-বিশেষ। কিন্তু রসনার রসে সিক্ত না করে খাদ্য-নামক ঐ fuel-গুলি সোজা জঠরানলে আহুতি দিলাম। অনলের শিখা আকণ্ঠ ছিল, তাই পড়তে-না-পড়তে ছাই হয়ে গেল।

আঁচাতে গিয়ে দেখি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে সেই বুদ্ধু চাটুজ্যে।

"দাদা, কেলেঙ্কারি!"

"কী ব্যাপার?"

"জানেন না? ওপরে ঝাণ্ডা ওড়ানো হবে।"

"হ্যাঁ, সে তো দুটোয়। এখনও তো একটাও বাজেনি।"

"নাঃ, আপনি কেলেঙ্কারি করবেন দেখছি। সকালে উঠে যে কোথায় গেলেন টের পাওয়া গেলোনা। আস্থানা তো ঘাবড়ে অস্থির। আপনি, আমি আর উৎকলের দুর্গাপ্রসাদ মিলে গাইবো জাতীয় সঙ্গীত,—বেড়ে হবে দাদা—grand idea! নয়?"

"এ ব্যবস্থা করলে কে?"

"কেন, গান জানেন তো আপনি!"

"ওঃ, তোমারই কেরামতি!"

"বাঃ, রাগের কথা হ'ল? কোরাস্‌টা মাটি হবে? জাতীয় সঙ্গীত,—বাঙালীরা গাইবেনা?"

"না, বাঙালীর জন্যই লেখা হয়নি ও-সঙ্গীত।"

"রাগ করছেন কেন?"

"তোমার এই অদ্ভুত প্রকৃতি দেখে। আগ্রার মাটিতে জন্ম; যমুনার জলে প্রাণ! তবু বাঙালীর প্রশংসা করতে গেলেই অবাঙালীকে তুচ্ছ করবে, এই মহাপাপ কতোদিন করবে বুদ্ধু? স্কুল, কলেজ, প্রতিবেশী, মৃত্যু, আনন্দ সব ওদের সঙ্গে মিলেমিশে,—আর জাতীয় সঙ্গীত বলতেই বাঙালী?"

"আমি জানতাম না আপনার রাগ হবে !"

"হ্যাঁ, দুর্গাপ্রসাদ গাইবে, আর তুমি।"

"আপনি ?"

"না, যদি না মারাঠী আর ইউ.পি.-র ছেলেরা গায়।"

"সে আপনি বুঝুন। কেলেঙ্কারি না হয়।"

"আরও কেলেঙ্কারি আছে বুঝি ?"

"আঃ, শুনুন না! ওরা তো জানেনা যে আপনি জানেননা আপনাকে গাইতে হবে। লাউড-স্পীকারে ক্রমাগত ডাকা হচ্ছে আপনাকে।"

"কিন্তু সেসব তো দুটোয়।"

"কথা ছিল তাই। এখন সময় বদলেছে।"

"কেন ?"

"সাংবাদিকেরা মহা খাপ্পা। তারা তাড়াতাড়ি যেতে চায়।"

"ওঃ, তাদের একোমোডেট করতে আস্থানা করেছে এ-কাজ !"

"ওপরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে আপনার অপেক্ষায়।"

"থাকুন। আমি সময়মতোই যাবো।"

বুদ্ধু ছুটে চলে গেলো।

বিক্রম ও গোপী খেয়ে নিয়েছিল।

সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম।

সেই ধীর নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে ওপরে গিয়ে দাঁড়াতেই সকলে হো-হো করে হেসে ফেললো।

বেশীর-ভাগই অচেনা মুখ।

সামনেই লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে শ্রীনাক। "বেশ মশাই, খোঁজ খোঁজ; ছিলেন কোথায় ?"

বললাম—"অধঃপথে।"

হেসে হিউমার করলেন তিনি—"যাক্, জাহান্নমে নয় !"

"না। সেটায় এসে সবে পৌঁছুলাম !"

তাকিয়ে দেখি এ-পাহাড়ের ওপর প্রায় পাঁচ-ছ'শো লোক এককাট্টা হয়েছে। বেশী ছেলেমেয়েরা যে যার বিশিষ্ট সাজ-পোশাক প'রে পাহাড়ের ঢালে ঢালে উঁচুতে বসে আছে। অপেক্ষাকৃত গণ্যমান্যেরা কাছাকাছি বসেছে।

একটা ব্যাণ্ডের দল এসে পড়লো দূর-গাঁ থেকে। রূপোর ঢাকের মতো বড় ঢোলক, কাড়া-নাকাড়া, বড় বড় লম্বায় প্রায় দশ-বারো ফুটের শিঙা, সাপের মতো আঁকাবাঁকা রামশিঙা, কাঁসর, খরতাল, বাঁশী—সব রূপোর—এসব নিয়ে একটা প্রায় পঁচিশজন লোকের দল। তারপরে প্রায় কুড়িটি পুরুষের একটি দল পার্বত্য-নাচ নাচতে-নাচতে এলো, এবং নাচতে লাগলো। আরেকটা দল এলো বাঁশী, ড্রাম ও কেট্‌ল্‌-ড্রাম বাজিয়ে। ওরা রামনগর স্কুলের স্কাউট-দল। এই সমারোহকে কেন্দ্র করে ওরাও তিনদিনের জন্য ছাউনি ফেলেছে।

আমার মনে ঘুরতে লাগলো রূপার ব্যাণ্ড আর অর্ধাশন; শ্রমবিমুখতা আর পাহাড়-কাটা;—এসবের একটা ককটেইল্‌ বানাই কি করে?

গান হ'ল; পতাকা-উত্তোলনও হ'ল; বক্তৃতা-ছোঁড়াছুঁড়ি তাও শেষ হ'ল;—এখন পালা নিচে নামার এবং পথ-কাটা স্বরুর।

চেয়ে দেখি, হঠাৎ সাংবাদিকদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। শ্রীনাক চটে গিয়ে কাকে যেন বলছেন—"কাজ হবে, না, ছাই! এতো বক্তৃতা আর ছবি-তোলা যেখানে, সেখানে আবার কাজ! খেয়ে-দেয়ে যেমন কাজ নেই এই কংগ্রেসের। দিশী রাজ্য হয়েছে, না, আমাদের 'নাকে-দম' হয়েছে। উচ্ছন্নে যাক, উচ্ছন্নে যাক!"

খুব দোষ দিইনা ভদ্রলোককে, কারণ সত্যিই ওঁর না-হক্‌ ভোগান্তি সার হচ্ছিল। কাশছেন, হাঁপাচ্ছেন, কম্ফর্টরে কম্ফর্ট দিচ্ছিলনা। আজ উনি চলে যাবেন।

খানিকটা পথ চুন দিয়ে দাগ কাটা। শ্রীমতী ইন্দিরা কোপ লাগালেন। চারিধারে হর্ষধ্বনি পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিউজ-রীল, নানা ক্যামেরার ক্রিং, ক্লিং-ফট্‌-ফট্‌ ধ্বনিতে মনে হ'ল বুঝি-বা তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের সাধনা স্বরু হ'ল।

চড়বড় করে বৃষ্টি নামলো, নামলো শিলার বর্ষণ। বহু ছাতা উঠলো এক মাথায়, বহু মাথা খালি রইলো ছাতা থাকতে। আকাশে ঘনঘটা, খাদরালার পর্বত-পরিবেষ্টিত বৃহৎ পাত্র ভরে গেল কুণ্ডলীকৃত কুয়াশা আর মেঘে।

গোলেমালে অনেকটা মাটি কাটা হয়ে গেল। আগাগোড়া পথটায় প্রায় ছ'মাইল হবে, নতুন শাবল গাঁইতি কোদাল কুড়ুল প্রভৃতি নিয়ে ছেলেরা অক্ষত-ধরণীর কৌমার্যকে আঘাত করে তাকে সামাজিক জীবনযাত্রার যোগ্য করতে

লেগে গেল। সেই প্রথম-পরিচয়ের ছবি তুললেন Information and Broadcast-এর দপ্তর হতে কোনো এক ফটোগ্রাফার।

সন্ধ্যা হতে হতেই সবাই জড়ো হলাম ডাইনিং-হলে। তারপর কমনরুমে গাদাগাদি করে বসে প্রথম জলসা—এরা বলতো soical gathering,—আসলে campfire—মাঠের মধ্যে আকাশের নিচে না হয়ে ঘরের মধ্যে, এই যা প্রভেদ।

আজ এই social gathering-এ চমক-লাগানো ছেলে বাইসিরিয়ার কৃতিত্বের প্রথম পরিচয় পেলাম। চক্‌চকে সুঠাম ছেলে, একমাথা কোঁকড়া চুল, সত্যিকারের গোলাপী ঠোঁট—পুরু, নিচের ঠোঁটটা একটু ঝুলে-পড়া। ওর প্রখর ইন্দ্রিয়বিলাসী মনের সেটা একটা অভিজ্ঞান। এদিকে হিন্দি-সাহিত্যের ছাত্র। বুদ্ধি ও মনন দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান ও গড়ে তুলেছে। গান হ'ল তিন-চারখানা, হাসির খোরাক দিল দু'একটা টুকিটাকি একক-অভিনয়, তা ছাড়া ওর নিজের কাজ ছিল। খুব আনন্দ হ'ল সবার।

কিন্তু এখন যে আবার উঠতে হবে। কাঠের আঁচে গরম ঘরে শ'দেড়েক লোক বসেছিলাম। তারপরেই বেরিয়ে একেবারে চল্লিশ ডিগ্রী বা তারও কম হবে। এদিকে এক-পশলা হয়ে গিয়েছে। কাঁচা মাটির নতুন পথে পা রাখতেই হড়কাচ্ছে। বিক্রম বেচারী তো পড়েই গেল। স্যুটটা একেবারে কাদায় কাদা। আমি না-পড়ার কৃতিত্বে মশগুল হয়ে তাঁবুতে ঢুকলাম!

কিন্তু পরের দিন এর খেসারত দিতে হয়েছিল।

সকালেই চা ইত্যাদির পর প্রথমদিনের কাজে বেরুতে হ'ল। প্রথমদিন আমি ভাবলাম কোনো একটা দলে থেকে সত্যিকার কোপানোর কাজে হাত দেবো। সেই আশায় ছয়নম্বর দলে যোগ দিলাম, কারণ ওরা সংখ্যায় ছিল কম, তা ছাড়া উড়িষ্যার দুর্গাপ্রসাদ ছিল ঐ দলের নায়ক। ভারতের ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কংগ্রেসের প্রতিভূ যদি হয় এই দুর্গাপ্রসাদের মতো ছেলে, মেনে নিতে হবে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং কংগ্রেস এখনও বহুদিন জনগণের মন দখল করে থাকবে।

স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ, স্পষ্টভাষী ছেলেটির বয়স বছর কুড়ি হবে। অনর্গল ইংরাজী বলে বটে, কিন্তু হৃদয়ের জোরের মুখে ভাষার কারুকার্য যত না থাক, স্ফুলিঙ্গ তার চেয়ে বেশী। দেশকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, কাজকে কাজ ব'লে জানে ও মানে, এবং কঠোর অদম্য উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে নিয়ম ও শৃঙ্খলার

সঙ্গে এগিয়ে যেতে চায়। তাই ব'লে সন্ন্যাসী নয় ও, নয় বীতরাগ। জীবন-রসের রসিক, হাস্য-পরিহাসের লঘু বাতাসে মনের দখিন-দুয়ার চঞ্চল। ও পোক্তহাতে শাবল চালালো পাথরের চাঙড়ে।

আমাদের ছয়নম্বর গ্যাং যে-চত্বরটায় কাজ করতে এলো সে-চত্বরটা পেয়ে আমাদের মন ভেঙে গেল। প্রত্যেক দলকে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যে-দল সকচেয়ে ভালো আর বেশী কাজ দেখাবে, তাকে অলঙ্কৃত ও পুরস্কৃত করা হবে। সেই লোভে সবাই কাজ করছে। যদিও চেষ্টা হ'ল কাজে প্রাদেশিকতা না আসে, শেষ অবধি দেখা গেল দলগুলিতে প্রায় সমপ্রদেশীয় ছেলেরা এক হয়েছে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ১নং-২নং ছেড়ে প্রাদেশিক বা ঐজাতীয় নামে সবাই অভিহিত করতে লাগলো ওদের। যথা—আমাদের ৬নং গ্যাং-এর নাম হ'ল উৎকল-গ্রুপ। আমাদের দলে ৩ জন ইউ.পি. এবং ২ জন পাঞ্জাবী ছিল। এমনই মহারাষ্ট্র গ্রুপ, মির্জাপুর গ্রুপ, বম্বে গ্রুপ, এলাহাবাদ গ্রুপ ইত্যাদি সব গ্রুপের নাম ছিল। কিন্তু দু'একটি গ্রুপ ছাড়া অন্য সব গ্রুপ-ই আন্তঃপ্রাদেশিক দল ছিল।

আমাদের চত্বরটা দেখে মন-খারাপ কেন হ'ল বলি। ইচ্ছে আর কার না হয়—ভালো কাজ দেখিয়ে বাজী মাৎ করি। কিন্তু এখানে পাথর-কাটার ব্যাপার, মানের ইজ্জতের ব্যাপার। হিমাচল-সরকারের ইঞ্জিনীয়র্সরা এসে কাজ দেখে নোট নেবেন এবং কাজ যারা পারবেনা তাদের শেখাবেন। ফাঁকি দেবার কথাই ওঠেনা। পাথর কাটতেই হবে। কিন্তু এ কী পাথর। দেখতে পাথর, আসলে ধুলোর চেয়েও ধুলো। মাটিতে অভ্র-মেশানো চাপের পরে চাপ। শাবল চালাও, গাঁইতি চালাও—আধ ইঞ্চি গেলো, একটু ধুলোর মতো খসে পড়লো। যাকে বলে 'by inches'—এক এক ইঞ্চি করে কাজ এগুতে লাগলো। এমন হতভাগা অংশটা পড়লো আমাদের গ্যাঙে।

অন্যান্য গ্যাঙে পাথরের চাঁই বা মাটির কাদার স্তূপ, গাছের সারি। কাজ করলে এগুচ্ছে টের পাওয়া যায়। পাথরের চাঙড় সরালে তো সরলো—অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল। আর একি! কুরে-কুরে এগুনো। দেখলে মনে হয়—এতো নরম জিনিস, কী দেরিই করছে! অথচ কার সাধ্য এগোয়।

প্রথম দিনে শাবল চালিয়ে দেখি হাঁপ ধরে যায়। পর পর বার চার পাঁচ চালিয়েই বিশ্রাম করতে হয়। বাবাঃ, একি পারবো? অসম্ভব। ভাঙলো

অনেকটা—পাথর নয়, হিমালয় নয়, মন। সেই ভাঙা মন নিয়ে যখন ডাইনিং-হলে পৌঁছুলাম তখন সাড়ে বারো। গোগ্রাসে খেলাম যা দিলে, যেভাবে দিলে। দুর্গন্ধ বড়ির ঝোল আর রুটি। লাউয়ের ছেঁচকি আর দাল। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়াব এই মনে ছিল। কিন্তু পাহাড়ের এমনি গুণ, অবসাদকে ধারে কাছে ঘেষঁতে দেয়না। ঝকঝকে রোদে চারিধার প্লাবিত। আমাদের তখন রক্তে চমক, মনে দাপাদাপি।

"যাবি তোরা অভিযানে?"

"আপনি যাবেন?"

"নিশ্চয়।"

"কোথায়?"

"নাম-বিহীন এই দেশে নাম দিই কি করে? যাবে জঙ্গলে।"

বিক্রম বললে—"চলুন যাই নীচের জঙ্গলে।" "তাই চলো।"

ক্যামেরা আর একখানা বড় ছুরি নিয়ে আমি আর বিক্রম চললাম। খানিকটা নেমে দেখি জীপ্ দাঁড়িয়ে আছে। সাংবাদিকরা যাচ্ছেন। শ্রীনাক ও শ্রীটামিও আছে। ওরা সব চললো। ক্যাম্প গোটাবার দিনেও আসবে। যাবার মুখে দেখলাম ওরা কেউ প্রসন্ন নয়। সারা অভিযানটা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে, ভস্মে ঘী ঢালা হবে, এ বিষয়ে ওরা নিঃসন্দেহ।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। আজ কাজ এগোয়নি। আজ তৃতীয় দিন। অথচ তিনফুট মাটিও আমরা কাটিনি। কাটতে হবে তিন মাইল, হাতে আর কুড়িটি দিন। হবে কি? হবে কি?

এদিকে জঙ্গল গাঢ় হয়ে আসছে। নামছি আর নামছি। গাছের ছায়া থেকে গাছের ছায়ায়। খাড়া পাহাড়। মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়ালে একদিকে পঞ্চাশ ডিগ্রী, অন্যদিকে একশো ত্রিশ ডিগ্রী। ছুরি দিয়ে একটা ডাল কেটে নিলাম—তৃতীয় পদ থাকলে চতুষ্পদের কাছাকাছি নিরাপত্তা মেলে।

একটা গাছের তলায় বসেছি। চারধার চেয়ে দেখছি। বিক্রম ছবি নেবে একটা। কী দেখে হঠাৎ বিক্রম হাসলো। আমিও পেছনে চেয়ে দেখি—ওমা, এটা যে তুলসীরাম! তুলসীরাম—যে আমায় তাঁবুতে চা এনে দেয় ভোরবেলা। বলতে গেলে এই বিদেশে আমার একমাত্র সহায়।

আমরা যে নেহাত পালিয়ে এসেছিলাম তা নয়। তিব্বতের পথে আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল রাস্তা তৈরি করা বটে, সেইসঙ্গে সে-দেশবাসীদের সঙ্গে মিতালি। দুপুরের খাওয়া আর বিকেলের কাজের ফাঁকে খানিকটা সময় এই মিতালির সময়। এদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা পাকাপাকি খবর নেওয়া, সে-সম্বন্ধে statistics তৈরি করা, এদের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে খবর সংগ্রহ করা, এদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার আঁচ কতটুকু ঢুকেছে তার হদিশ মালুম করা—এও আমাদের একটা কাজ ছিল। কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে ছাপানো কাগজ আমাদের প্রত্যেককে ১০।১২খানা করে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক কাগজে পরিসংখ্যানের বিষয়বস্তু—যে-মানুষটি তার নাম ও পরে তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর। মোটামুটি ভাব এই যে, খাদরালার আশেপাশে ৬ মাইলের বৃত্তের মধ্যে যে-কয়টি গ্রাম পড়বে তার মধ্যে শিশু-যুবা এমন কেউ থাকবেনা, যে এই পরিসংখ্যান থেকে বাইরে থাকবে। প্রত্যেকের নামে একটি করে কাগজ ভরা চাই—একেবারে তার গ্রামে তার সুমুখে বসে লেখা, সম্ভব হ'লে তার সই নেওয়া।

তেমনি খানকয় কাগজ আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা দুপুরটা এমনি মোটামুটি একটু বেড়াতেই বেরিয়েছিলাম। তবে কাগজগুলি সঙ্গে ছিল, যদি কাজে লেগে যায়।

পাহাড়ী পথ বলতে অনেকটা ঘুরে পথ আছে। কিন্তু আমরা সমুখ থেকেই সোজা খাড়াই নেমে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে, ওই-যে খানকয় চালাঘর দেখা যায় ওইতো একখানা গ্রাম—নাম বাজেশাল। ওই গ্রামটায় যাওয়া যেতে পারে; কিন্তু খানিক বেঁকে গেলে নাকি পেখাধার ব'লে একখানা ছবির মতো গ্রাম আছে। ঝাণ্ডাতোলার দিনে দেওকীনন্দ ব'লে আধাবয়সী এক বর্ধিষ্ণু চাষী বার বার নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল। গোপী তার কথা আমায় বড্ড বেশী করে মনে করিয়ে দেওয়াতে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল:

রুপার ব্যাণ্ডে বাদ্য বাজছে। ছেলের দল হাতে রুমাল নিয়ে আর টর্চ নিয়ে নাচছে। নাচ বড় অদ্ভুত। বাঁ-হাতে পাশের লোকের কোমর জড়ানো। ডান হাতটায় একটা রুমাল, বা টর্চ, বা বাঁধানো ছড়ি, বা বিলিতী সস্তাদামের কোনো এসেন্সের ভরা শিশি—সেইটে নেড়ে নেড়ে একবার করে একসাথে পা ফেলে সামনে এগোয়, ঝুঁকে কোমর বেঁকায়, এক-পা পেছোয়, পাশে সরে যায়,

আবার ঝোঁকে, সামনে এগোয়—এই চলেছে, কোনোই বৈচিত্র্য নেই। পুরুষ-দের এই অত্যন্ত একঘেয়ে নাচ দেখে ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল। মুজতবা আলী দেশী নাচের কথা বলতে গিয়ে এই একঘেয়েমির একটা বিশ্লেষণ করেছেন। ভদ্রলোক নেহাত আঁতের কথাই বলেছেন। অন্য কার মুখে কেমন ভাব দেখতে গিয়ে দেখি গোপী বড়ই প্রসন্ন, আনন্দে তার চোখ চক্‌চক্ করছে। গোপীর রসবোধ আছে ব'লেই জানি। তার এমন একটা বদরুচির জিনিসে অভিরুচি হবে ভাবতেও খারাপ লাগছিল। তারপরেই দেখি চোখে জৌলষ, গালে ব্রীড়া, হাত আর কনুয়ের চপলতায় ভাষা,—দৃষ্টি অনুসরণ করে যে-কিশোরীর মুখের ওপর গিয়ে থামলো আমার চোখ, তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরানো যায়না। হিমালয়ের ওপরে, আরও ওপরে মানস-সরোবর আছে শুনেছি। তা দেখিনি। শুনেছি, সে-সরোবরের প্রশান্তির কথা, স্নিগ্ধতার কথা। সেই স্বপ্নাবলোকিত আদর্শ-প্রশান্তি আর স্নিগ্ধতার সমাবেশ-মঞ্জুল সেই কিশোরীর লাবণ্য। সে-লাবণ্য থেকে চোখ ফেরানো গেলে, চোখে পড়ে অতিবিস্তৃত দীর্ঘপক্ষ্ম তার চোখ-দুটি। ভাসা-ভাসা ডাগর—যেন সরোবরে পদ্মকোরক। উপমাটা সেকেলে হ'তে হ'ল, কারণ রূপটা নেহাত সেই সেকেলে 'কুমারসম্ভবী' রূপ।

গোপী পরে খবর দিলো, ও নাকি দেওকীনন্দের মেয়ে। দেওকীনন্দ থাকে পেখাধার গ্রামে। সুতরাং আজ দুপুরে গোপীকে পেখাধারে যেতে হবে। ব্যাপারটা মনে-মনে এঁচে নিলাম। কিন্তু কিছু উচ্চবাচ্য করলাম না।

"পেখাধারের পথ চিনিস্ গোপীভাই ?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"পথ ? পাহাড়ে আবার পথ কি ? পা রাখলেই পগ্‌দণ্ডী—পৌছতে পারলেই পেখাধার। যতক্ষণ খাদরালার ঝাণ্ডা দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ আর হারাবার কথা ওঠেনা।"

সুতরাং সেই ডাণ্ডর চড়াই আমি, বিক্রম, গোপী তিনজনায় ঠেলে নামতে লাগলাম। নামছি তো নামছি-ই। আশ্চর্য লাগলো—একটা পাখী নড়ছেও না, নাড়ছেও না, পাখা মেলে স্থির একটা জায়গায় ভাসছে, যেন কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে। কী পাখী গবেষকরা বার করুন তার নাম ; চোখ-দুটি সেদিন বিস্ময়ে চম্‌কে গিয়েছিল। কত মজাই আছে প্রকৃতির মধ্যে !

প্রকাণ্ড একটা গাছ—পাকা-পাকা জামের চেয়ে বড় ফলে ভর্তি, জামের-ই মতো রং। এতো ফল যে, প্রাচুর্য এবং বন্যতা দেখেই সন্দেহ হ'ল—বিষাক্ত

কিছু হবে না। গোটাকয় সন্তর্পণে ভেঙে নিলাম। কিন্তু পরে জেনেছিলাম সাপের কামড়ের চেয়েও সাংঘাতিক সে-ফল। একটা গুনগুন শব্দ। কোথাও ঝর্ণা হবে। সমতল দেশের আমরা নদনদীর খবর রাখি। পাহাড়ের ভেতর বনানীর ঘোমটায়-ঢাকা প্রকৃতির কলস্বর যেন মোহ জাগায়। বার করতে হবে কোথায় ঝর্ণা। খুঁজে-পেতে বেরুলো ছোটো ঝর্ণা একটা। কিন্তু সেই ঝর্ণার ফেরে পড়ে পথ হারালাম আমরা। নামি তো দেখি, এতো খাড়াই যে আর নামা যায়না। উঠতে গিয়ে দেখি দুরন্ত কাঁটাগাছ চারধার দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে যেন। কোথায় গেল সেই পথ, যেটা দিয়ে আমরা নেমে এলাম। তখন আবিষ্কার করলাম, নেমেছি নিজেদের মন-মৌজী পথ দিয়ে। ঝর্ণার শব্দে এদিক ওদিক করে ছুটে-ছুটে নেমে এসেছি। পথের দিশা রাখিনি। তাকিয়ে-যে খাদরালা-ক্যাম্পের ধ্বজা দেখে দিক্-নির্ণয় করে নেবো সে জো-ও নেই। পাইনগুলো বেজায় লম্বা আর ঘন। পাহাড়টা ঝুলে পড়েছে প্রায় মাথার ওপর। আমরা মাথা তুলে দেখলে পাহাড়ের বাঁকটা চোখকে আড়াল করে দিচ্ছে,—কাঁটায় পা ছড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন ঘাবড়ে গেলাম। কোনোরকমে ঠেলে ঠেলে জায়গা করে খানিকটা উঠলাম। বাঁকটা পার হয়ে আবার নামলাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে দেখি আবার সেই ঝর্ণার ধারে এসেছি। একি হ'ল! বনদেবী কি আমাদের বন্দী করলেন নাকি? নিচের দিকে জন-প্রাণিহীন নিবিড় অরণ্য। ওপরে সেই পাহাড়ের ভ্রূকুটি, আশেপাশে কাঁটা আর কাঁটা! পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়েছি। ভাবছি কী করি। গোপী মুখ ব্যাজার করে বসে, আর বিক্রম উৎসাহ দিচ্ছে—"জিরিয়ে নিই একবার, পথ পাবই। জঙ্গলে পথ হারিয়ে মরবোনা এটা সত্যি।"

ঝর্ণার উপরে দেখি বেটা তুস্‌সীরাম স্বয়ং দেবতার মতো দাঁড়িয়ে সব দাঁত ক'টা বার করে হাসছে। ও হাসতে-হাসতে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চললো।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ক্যাম্পে হাজির হলাম তখন চা দিচ্ছে। সে-সময় চা আর দু'খানা রুটি যেন উর্বশীর চিমটির মতো সৌভাগ্য ব'লে বোধ হ'ল।

ক্যাম্পে আসার খানিকটা পরেও দেখি গোপীর মুখ ব্যাজার। কারুর কারুর মুখে ব্যাজারপনা মানায়না ভালো।

আমি বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি হ'ল হে নবাবসাবের?"

বিক্রম মুচকি হেসে জবাব দিলে—"ওসব পাঠ আপনি ভুলে গেছেন—আর পুনরাবৃত্তিতে কী দরকার।"

পাঠ মনে পড়ে গেলো। সেখাধার যাওয়া তো হয়নি।

তার বদলে আমি এসে দিব্যি লেগে গেছি কাজে।

কাজ তখন অনেক।

ডাইরেক্টর আস্থানার ইচ্ছে খাদরালা-ক্যাম্প একখানা কাগজ বার করুক। সাপ্তাহিক হ'লে চলবে না, দৈনিক হ'লে বিপদে পড়তে হবে প্রেস নিয়ে, মধ্য-সাপ্তাহিক কাগজ অর্থাৎ হপ্তায় দু'খানা—শুক্রবার আর সোমবার। ডুপ্লিকেটর ও টাইপরাইটার সঙ্গে আনা হয়েছে। করমচন্দ টাইপিস্ট আর ভবানন্দ প্রিণ্টার। কথা হ'ল সম্পাদক কে হবে।

সেই পারিখ ব'লে বম্বের ছেলেটি। খোকা-খোকা ভাব। সবাই চায় পারিখকে নিয়ে একটু ফষ্টিনষ্টি করে। মেয়েলী কোমলতা মাখানো মুখের পারিপাট্য আরও পরিপাটি হয়েছিল ওর সোনার চশমায়। একমাথা লম্বা-লম্বা পাতলা ব্যাক-ব্রাশ চুলের মাঝটা ঈষৎ চেরা। গায়ে ডোরাকাটা দামী সার্জের কোট-প্যাণ্ট। আঙুলে একটা রিং পরিয়ে সর্বদা চাবি ঘোরাচ্ছে, গলায় ঝুলছে বায়নোকুলর, থার্মোফ্লাস্ক এবং ক্যামেরা। আস্থানা বললে—"ওকেই করা হোক।"

পারিখ আপত্তি জানালোনা দেখে আমি বিস্মিত। আড়ালে আস্থানা বললে—"বম্বে-দল বড্ড ক্ষেপেছে। ওদের একটাকে কাজে লাগানো গেলো—কিন্তু স্যার, বুঝতেই পারছেন কাগজ *A to Z* আপনাকেই চালাতে হবে।"

মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। এখানে এসেও সেই লেখাপড়ার খবরদারি? পারিখ ইংরাজী ভালোই জানে। কেবল সেটা ছাপা যায়না। ও এতো গড়গড় করে বলে যে, ওর কানে কোথাও কিছু আটকায় না, জিভে তো নয়ই। আটকাবে কোত্থেকে; যা তোড়! তাতে কি কিছু আটকায়?

বুদ্ধু হ'ল সহকারী সম্পাদক। ছেলেটা বার বার এসে এতো জড়িয়ে ধরে! ভালো লাগে ওকে, ওর বুদ্ধিকে নির্বুদ্ধিতা ও সরলতা দিয়ে ঢেকে রাখবার উদারতাকে। ও বললে—"আবার আমায় কেন ফাঁসালেন দাদা!"

আমি বললাম—"ফাঁসালাম আবার কি? ভালোই হবে।"

"আমি জানি কি দাদা যে লিখবো ? ঐ গান-টান গাই, আর কেঁদে-ককিয়ে এম.এ.-টা পাস করে নিয়েছি এক তক্কে। আমি কি ওই-বেটা পারিখের মতো বোদা ? জানেনা শোনেনা কিস্‌সু—কেবল নাম-কা-ওয়াস্তে—"

কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে বললাম—"সেদিন তোমায় একবার বকুনি দিলাম তোমার এই বাঙালীপনার অহঙ্কার নিয়ে। আজ আবার—"

পেছিয়ে বললো—"এ আপনার অন্যায়। বোদাকে 'বোদা' বলবোনা, পান্‌সেকে 'পান্‌সে' বলবোনা—সবই হবে provincialism—এ ভারি অন্যায় !"

আমি হেসে বললাম—"বিশ্বমৈত্রী করতে গেলে রসনা সংযত করতে হয় এবং নিজের প্রতি অনুরাগকে তুচ্ছ করতে হয় খোকা, বুঝলে ?"

বাইসারিয়া এসে হাজির—"চ্যাটার্জী, আজ রাতের প্রোগ্রামে তোমার কি থাকবে ?"

আমি বললাম—"Lecture on Lexicography of Nebuchadnezzar."

ওরা হাসলো।

রাতের প্রোগ্রাম হবার আগেই ঝড়বৃষ্টি এলো কাল রাতের মতো। বিক্রম এবং গোপী কোন্ ফাঁকে ওপরে উঠে কম্বল নিয়ে এসেছে তিনটে। ঘরটায় বসার ব্যবস্থা মেঝেয়, কাঠের মেঝেয় বড় শতরঞ্জি পাতা—তার ওপর। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলে ভারি আরাম। তাই কম্বল। আমার খানাও এনেছে।

আমি আর কখন কম্বল মুড়ি দিই ! পারিখ জ্বালাচ্ছে। তার 'খাদরালা নিউজ' কাল সকালে বেরুবে। তার লেখা গল্প ঠিক করে দিতে হবে। ঠিক করে দিলাম। ঘটনাগুলো পাল্টে দিলাম। পাত্র-পাত্রীর নামগুলো বদলে দিলাম। যা কান্নাকাটি শেষটার দিকে ছিল, সেগুলো বাঁচিয়ে হাসবার ব্যবস্থা করে দিলাম। আর ভাষাটা ছিল ওর দুষ্পাচ্য পিজিন্, সেটা ইংরাজী করে দিলাম। ওর ঘটনা ছিল আকবরের সময়কার লাহোরের কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে, আমি সেটা করে দিলাম বাংলার মাঝির গল্প। ও কিন্তু শেষ অবধি বুঝে নিলো যে, ওর গল্পই ছাপা হচ্ছে। তা ছাড়া কাগজ 'এডিট্' মানেই, ও জানতো 'কলাম'গুলো ভরাবার ভার আমার।

খুব হাসাহাসি শুনে এ-ঘরে এসে দেখি সাড়ে বারোটা।

সোনী আমাদের ক্যাম্প-কম্যাণ্ডাণ্ট আর সেই বিউগ্‌লার ছোকরা ফক্স-ট্রট নাচছে। রান্নাঘরের থালা-গেলাস-চামচ-যোগে একটা অর্কেস্ট্রায় একটা

হারমোনিয়ম, তবলা, টেবিলের পিঠ আর হারমোনিয়ম-বাক্সের ডালাও সহযোগিতা করছিল। গান গাইছিল এলাহাবাদের সক্সেনা। এই ছেলেটা রোগাপট্‌কা দেখতে হ'লে কি হয়, যেন এনার্জির ভাণ্ডার। গান গাইত স্বাভাবিক মিষ্টতায় ভরতি ঠুংরি। ঠুংরি দ্রুতলয়ে ফক্স-ট্রটের নাচ নাচিয়ে ছাড়ে আজ প্রত্যক্ষ করলাম।

বুঝলাম আমার সান্নিধ্য এই উচ্ছল আসরে ওদের ভালো লাগছিলনা। আমি পা বাড়ালাম বাইরের দিকে। ওপরে উঠে যেতে হবে ক্যাম্পে।

বাইরে এসেই দেখি তখন আকাশে দুর্যোগ। নীরন্ধ্র নিরঞ্জনা। অন্ধকারের সমুদ্র। নিজের হাত নিজে দেখতে পাইনা। কখন বিক্রম আর গোপী পাশে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। দুটো জলন্ত ফোঁটা দেখে বুঝলাম সিগারেট;—নাকেও মালুম হ'ল। আমি বললাম—"টর্চ আছে নাকি?"

বিক্রম ভেবেছে গোপী এনেছে, গোপী ভেবেছে বিক্রম। দূরে ক্যাম্পের ধ্বজস্তম্ভের কাছে যে গ্যাসের আলোটা জলছিল তার ফলে পাহাড়ের গা-গুলো আরও অন্ধকার। কিছু বোঝা যায়না।

তার ওপরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি আর কন্‌কনে হাওয়া। বরফ যখন পড়ে তখন এতোটা ঠাণ্ডা এতোটা অসহ্য নয়। কাল বিক্রম পড়ে গিয়েছিল। কাল ক্যাম্পে আছাড়-না-খাওয়া মনিষ্যি ছিলনা বললেই হয়। সকাল হতে সবাই বলাবলি করছিল আর হিসেব দেওয়া-নেওয়া করছিল কে ক'বার আছাড় খেয়েছে। আমি ভাগ্যবান অল্পদের অন্যতম। কাল পড়িনি। সেই মহা-গৌরবে পুষ্ট আমাকে বিক্রম আদেশ করলো—"দেখুন স্যার, কাল স্যুটটার দফা গয়া করেছি। অসহ্য হ'লেও সইতে হয়েছে। আজ যদি কম্বল তিনটেকে কাদা-খেলার খেসারত দিতে হয়, রাত কাটবে 'ঠিঠ্‌রে' অর্থাৎ কেঁপে-কেঁপে। বরং কম্বল তিনখানা আপনি নিন।" নিশ্চিন্ত সর্বনাশের সাহচর্য অবলীলাক্রমে গ্রহণ করলাম।

পাঁচ মিনিট যেতে-না-যেতে বুঝলাম গোপী গড়িয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম ব'লে উঠলো—"বাদশাহ ফতে, জঙ্গ্‌ খতম্‌।" সামান্য হাসির দমক সহ্য করে এতোটুকু গাম্ভীর্য ছিলনা পর্বতের গায়ে। বারিধারার সংস্পর্শে এসে হঠাৎ নিজের সত্তাকে এতোটা গলিয়ে দিয়েছে যে, সেই ৪৫ ডিগ্রীর খাড়াইয়ে পা রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। হাসতে গিয়ে গোপী আবার ধপাস্‌। সঙ্গে সঙ্গে

বিক্রম 'হায় গোপী' ব'লে চিৎ। গোপী সেই পতন-শব্দে ( দেখতে পাচ্ছিলাম না কেউ কারুকে ) গেয়ে উঠলো—"Et tu Brutus ?—তুমিও ব্রুটাস ?" আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম—"And what a fall was there !" কারণ আমায় আমার কোনো ছাত্র তখন দেখলে প্রশ্ন করতো—"স্যার, এখানে কাদায় শুয়ে কেন ?"

এই পড়ে-যাওয়া আর গড়াগড়ি-খাওয়াটা আজ হাসির খোরাক যোগালেও, সে-রাত্রে বড় হাসির কথা ছিলনা। আমরা সব মিলে শ'খানেকের বেশী ছেলে ওপরের ক্যাম্পে আছি। রাত হতে ধীরে ধীরে সবাই ওপরে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পথখানি তখন মহাপ্রস্থানের পথ হয়েছে। ভীম শুধায় দ্রৌপদীকে—"তুমি পড়ো কেন ?" দ্রৌপদী শুধায় ভীমকে—"তোমার হ'ল কি ?" পথে পথে গড়াগ্‌গড় গড়াগড়ির ছড়াছড়ি আর হায়-হায় শব্দ। মাঝে মাঝে দেখছি ওই উঁচু থেকে টর্চ হাতে নিয়ে কেউ স্লিপ খেয়ে একেবারে দু'তিন ফুট নিচে নেমে যাচ্ছে। পায়ে-হাঁটার অভ্যাস যেন আমরা তখন ছেড়ে দিয়েছি। সবাই সাঁতার কাটছি, কারণ হাত-পা দুটো ব্যবহার করেও কিছু সুবিধা করতে পারা যাচ্ছিলনা। আমি অবশ্য নিশ্চিন্ত আরামে তিন গজের মধ্যে তিরিশটা আছাড় খেয়ে রেকর্ড ভাঙছি ; পরোয়া নেই। গায়ে আমার তিনটে কম্বল, জার্কিন। লটোপটো হয়ে কাদায় টইটুম্বুর হয়ে গেলাম। বিক্রম অনেকটা উঠে গেছে বোধ হ'ল। গোপীর শব্দও অনেক দূরে। ওরা চেঁচিয়ে বললো—"সাঁতার-কাটা অভ্যাস হয়ে গেল। স্যার, আপনি কিন্তু ধীরে ধীরে আসুন। গড়াবেন না। কম্বল আপনার কাছে।"

আমি শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলাম—"ভয় নেই তোমাদের, কম্বল ঠিকই আছে। আমি আসছি।" বেশী বলতে পারলামনা, কারণ তখুনি গড়াতে গড়াতে একেবারে পাঁচ-ছ'ফুট নেমে গেলাম।

পা ফেলি আর পড়ি। কোনও আশা নেই ওপরে ওঠার। অথচ ওরা উঠে গেছে। সাড়া-শব্দও নেই। এ আমি কোথায় এলাম ? খানিকটা পরে শোয়া অবস্থাতেই ব্যাপারটা ধারণায় এলো। পাহাড়ের গা কেটে ফুটখানেক চওড়া যে একটা পাগ্‌দণ্ডি-মতন করে দেওয়া ছিল, সেই পথটা আমি হারিয়ে ফেলে পাহাড়ের অন্ধকার থেকে ওঠার চেষ্টা করে ক্রমাগত আছাড় খেয়ে দিক্‌জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। যে-কোনও মুহূর্তে খড্ডে পড়ে যেতে পারি। একমাত্র উপায় চেঁচিয়ে সাহায্য চাওয়া, বা এইখানে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া। রাত

কাটাবার জন্যে আছে তিনটে কম্বল। কিন্তু বৃষ্টি তো পড়ছেই, এবং পরে যে বরফ পড়বেনা কে বললো। তা ছাড়া খাদরালার জঙ্গল। কোনও হিংস্র শ্বাপদই যদি এসে পড়ে। একটা সাপ-ই যদি হয়। অন্ধকার—আমি একা। গুঁড়ি মেরে ওঠার চেষ্টা করছি আর ভাবছি, আবার পা হড়কে হুমড়ে পড়ছি। ক্যাম্পের ওপরে ওঠার আশা একেবারে ত্যাগ করে বসে বসে ভাবছি আর হাঁপাচ্ছি। চেঁচাবার মতো মরীয়া হয়ে উঠিনি। মান খোয়াবার ভয় আর শীতের রাতে জঙ্গলের অন্ধকারে কাটাবার ভয় লড়াই করছে।

প্রায় হতাশ হয়ে আবার চেষ্টা করে উঠছি বেয়ে-বেয়ে। ভাবছি : "একটাই তো পাহাড়। গ্যাসের আলোর প্রভা দেখছি ওপরের গাছের মাথায়। বেয়ে-বেয়ে উঠি। উঠবোই ; ভয় পাওয়া কোনও কাজের কথা নয়।" কিন্তু হাঁপিয়ে পড়েছি। আছাড় খেয়েছি শ'খানেকবার—বেশী হবে। এর পরে মিনিটে মিনিটে আছাড় চলতে লাগলো। কম্বল ভিজে ঢোল। নিরুপায় হবার মতো। কে আমায় যেন বললো—"আসুন আসুন, হাত ধরুন।" স্পষ্ট গলা। এতো স্পষ্ট, এতো কাছে যে, ভয় পেয়ে গেলুম।

হালকা হাসি ভেসে এলো—"ভয় পেয়ে গেছেন বাবুজী ? আসুন, হাত ধরুন।"

আমি হাত ধরলুম।

এ কার হাত ধরলুম আমি !

ঠাণ্ডা কন্‌কনে ছোট্ট একটি নরম হাত। আঙুলগুলো ছোট-ছোট। অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। আমি আবার টাল খেয়ে পড়তে যেতেই সেই অজ্ঞাত হাত আমায় সামলে নিয়ে বললে—"পাহাড়ের গায়ে ছাগলছানা লাফ মেরে চলে, জানেন না ? দেখেননি ? তেমনি লাফ মেরে-মেরে আসুন। ঘাসের চাবড়ার ওপর দিয়ে নিয়ে যাবো আমি—চট্‌পট্ আসুন। এই দেখুন কেমন আসছেন—না না—হাত ছাড়াবার চেষ্টা করবেন না—"

এ কার কণ্ঠ ? কে এই নারী ? ক্যাম্পের ত্রিসীমানায় নারী নেই। এ কে ? আমার পক্ষে পড়ে-যাওয়া আর চলবেনা। কিন্তু কোন্ নারী আমায় চেনে, কে জানতো আমি এই অন্ধকারে বিপদে পড়েছি, কে একে পাঠালে,—আর এতো পরিচয় এখানকার মাটির সঙ্গে, এতো অভ্যাস এই কাদা-জল এই ঘাসের সঙ্গে—কে এ ?

ততক্ষণে ক্যাম্পের পশ্চিম দিকের ঢাল দিয়ে স্কাউট-ক্যাম্পের কাছ বরাবর এসে গেছি। গ্যাসটা চোখে লাগছে এইবার। পথটাও দেখতে পেয়েছি। ফিরে সাহায্যকারিণীকে দেখবো।

শুধু দেখলাম নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে ছুটে কে যেন নেমে গেল। খিলখিল করে হাসি তার গলায়।

গল্প নয়, রহস্য নয়, জলজ্যান্ত একটা ঘটনা ঘটে গেল—আর আমি সব পড়ার সেরা পড়া পড়ে গেলাম—বিস্ময়ের সমুদ্রে।

মিনিট দশের মধ্যে তাঁবুতে এসে ঢুকলাম। গোপী আর বিক্রম আমার অবস্থা দেখে যত-না হাসে তত কাঁদে কম্বলগুলো দেখে।

কিন্তু কিছুতেই ওদের হাসিকান্নায় যোগ দিলাম না। আমার মনে তখন উত্তপ্ত বিস্ময় হাত রেখেছে। সব ভুলিয়ে দিয়েছে। কানে বাজছে—"আইয়ে মেরা হাত পাকড়িয়ে, সম্ভাল কর্ চলিয়ে!" কে? কার কণ্ঠ?

ওরা ঘুমিয়ে পড়লো। আমি বেরুলাম। চুল্লি থেকে জল এনে চকোলেট গুললাম। চকোলেট খাচ্ছি আর সিগারেটে টান দিচ্ছি।

গ্যাসটা নিবে আসছে। সারা ক্যাম্প ঘুমুচ্ছে। গ্যাসটা অবশেষে নিবে গেল। রইল চুল্লির আগুনটা। ঝিরঝির করে বরফ পড়তে শুরু হ'ল তাঁবুর ছাতে। যেন একটা একটানা দীর্ঘশ্বাস গুমরে-গুমরে উঠছে।

আমি হাতে সেই স্পর্শ মেখে রইলাম। গান ধরলাম গুনগুন করে—

"এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে
ওহে অন্ধকারের স্বামী—
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবন-পারে
আমার চিত্তে এসো নামি। ..."

গান তো ভালো গাইনা; সুর আছে মনের গহনে, অনুভূতির অনুরণনে। ভবিতব্য অশেষ করুণা-ভরে বাংলা-ভাষা-ভাষীদের মধ্যে জীবনকে বইয়ে আনলেন,—জন্মালেম রবিঠাকুরের জাতে,—তাই মহাকবির গানগুলি সবসময় সব অনুভূতিতে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে হৃদয়ের পর্দায়। তাকেই আবার বলি;—গান-গাওয়া তাকেই বলি। ...

ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। লেপ গায়ে দিয়েও শীত যায়না।

তবু ঘুম আসে।

সকাল হয়।

রোদ হাসে।

বুদ্ধু ডাকে—"উঠুন উঠুন, ভটচাযি্যদা—তাঁবুর মাথায় যা বরফ, ফেলে না দিলে চাপা পড়বেন।"

চারধার ঝকঝকে রোদে ভর্তি। তুস্‌সীরাম চা আর পরেঠা নিয়ে আক্রমণ করেছে।

পরেঠা ওর হাতে সমর্পণ করে চা খেয়ে নিলাম। জুতোয় পা-টা ঢুকিয়ে সিগারেট ধরিয়ে—ঘটি হাতে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

যেন একটা ট্রান্সের মধ্য দিয়ে চলেছি।

আমার যে আসল সত্তা বার বার আমায় মনে করিয়ে দেয় আমি 'আমি'ই, অন্য কেউ নই—সেই সত্তাটি যেন অগোচরে কোথায় খসে পড়েছে, আমাকে বহন করে নিয়ে চলেছে আমার অভ্যাসগুলো। যা-কিছু করে চলেছি, সেই অভ্যাসের দাসের মতো ; স্বাধীন-ইচ্ছা-বিহীন।

কাল সেই রাত, যে রাতে আমি বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়ায় ভীত। সেই অসহায়তার মধ্যে যার হাত আমায় নিরাপত্তার পক্ষপুটে টেনে নিল সে তো নারীহস্ত—সন্দেহ নাই। অথচ এ ক্যাম্পে নারী কে ? কে এ নারী !

চট করে বলতে পারিনা কারুকে ; জিজ্ঞাসা করতে পারিনা। হাসি দিয়ে ওড়াবে, নয় সন্দেহ দিয়ে পোড়াবে। চুপ করে রইলাম। এই রহস্য ভাঙতে হবে।

মনে পড়লো ডাক্তারকে। ওর কাছে যাই। ওকে গিয়ে সুবিধামতো জানাতে পারলে জানাবো।

নামবো, দেখি শ্রীমহাজন হাতে ছড়ি নিয়ে উঠে আসছেন। গোপী বললে—"মাস্টারসাব—আমার পান চাই। মহাজনকে বলুন-না আপনি।"

বিক্রম বললে—"আর তাঁবুটা ঠিক করার কথা।"

মহাজন এসেই বললেন—"অবাক কাণ্ড, এসময় বৃষ্টি আর বরফ কখনো দেখিনি। কী ভোগান্তিই গেল আপনাদের ! আজ আকাশ দেখে মনে হচ্ছে এবার ভালো সময় এলো। তাঁবু ঠিক আছে ? জল পড়ছে না তো ?"

আমি বললাম—"না, ভেতরে জল নেই। বেশ আছি। তাঁবুটা বড় উঁচু, তাই মাটির তলা দিয়ে হাওয়া আসছে। সময়মতো লোক পাঠিয়ে দেবেন, এটা যাতে ঠিক করে দেয়।"

শ্রীমহাজন তাঁবুটা দেখে একটু মুচকি হেসে বললেন—"ওঃ বাবা, এ গোলমাল সারতে যে বড্ড সময় লাগবে! চট করে হবার জিনিস নয়তো। অনেক লোকের, অনেক সময়ের কাণ্ড।"

কণ্ঠস্বরে বুঝছিলাম রসিকতা করছেন।

বলতে বলতেই তাঁবুর প্রধান বাঁশটা, যেটা চারখানা পাথরের ওপর রাখা ছিল, সেটা সরিয়ে মাটিতে রেখে দিতেই তাঁবুটা নেমে এলো, ফাঁকটা বুজে গেলো। বোকামি করে দু'রাত শীতে কেঁপেছি।

হাসির রোল পড়লো।

এই সুযোগে আমি ঝাড়লাম—"সহজ উপায় বার করবার তো আপনি দেখছি একেবারে জর্মান ইউ-বোটের অ্যাটম-বোমা! আমার আর-একটা সমস্যার সহজ জবাবে জবাব করে দিন!"

হেসে বললেন—"বলুন—"

"দেখুন, পান এখানে পাওয়া যায়না। অথচ পান নৈলে আমি না মরি, আমার এক বন্ধু তো মরবেই। এক নয় দু'টাকার সাজা পান আপনি সিমলা থেকে পাঠিয়ে দেবেন, নয়তো একটা কফিন। বন্ধুর মৃতদেহ ফেলে রেখে যাবনা।"

শ্রীমহাজন ছড়ি ঘুরিয়ে বললেন—"তোবা, তোবা! পান কাল পাবেন। জীপের ড্রাইভারের কাছে খোঁজ করবেন।"

অন্য তাঁবুর তদারকে গেলেন। আমি ছেলেদের কাজে পাঠিয়ে ডাক্তারের সন্ধানে বেরুলাম।

গোপী বললে—"ব্যস্, আজ আপনি আমার কাছ থেকে দেড়ঘণ্টা বেশী কাজ নিন।"

বিক্রম বললে—"যাঃ, বকিসনে। তোলাভর কাজ করিস তো তোর জান যাবে ফেটে। দেড় ঘণ্টা!"

গোপী বললে—"জী জনাব—চলো কাজে, দেখা যাবে।"

দুজনে চা আর গাঁইতি নিয়ে চলে গেল খুশীমনে।

কোদাল, শাবল, গাঁইতি, লম্বা লম্বা রাম-শাবল, বেলচা, কুড়ুল, করাত প্রভৃতি কাঁধে নিয়ে নিয়ে ছেলেরা দলে দলে বেরিয়ে গেল। এক একটা দলকে দেওয়া হয়েছে প্রায় দু'ফার্লং জায়গা। এমনি দল হয়েছে বারোটা। শেষ দলটাকে হেঁটে যেতে হয় দু'মাইল; আসতে হয় দু'মাইল। ক্যাম্পের বাঁ ধারে এক মাইল, ডান ধারে দু'মাইল--এই তিন মাইল পথ কেটে চওড়া ক'রে, জঙ্গল সাফ ক'রে দিতে হবে।

দেখছি ঐ-যে রানাডে যাচ্ছে—ও তো আমেদাবাদের ডাক্তার, ম্যুনিসিপাল কমিশনার। ওর কাঁধে রাম-শাবল। ঐ যাচ্ছে যোশী—ওর দেশলায়ের কারখানায় কাজ করে দু'শো লোক আর ও নিজে ওকালতি পড়ে। ও বেলচা আর দড়ি নিয়ে চলেছে। আর চলেছে কনকরাও—বেজওয়াডার সঙ্গীত-সভার সম্পাদক, পানের ব্যবসায়ী, আন্ধ্রা-প্রদেশ-গঠন আন্দোলনের একজন অগ্রণী;—ও চলেছে দু'হাতে দুটো শাবল দোলাতে দোলাতে। এবার ম্যাট্রিক দিয়ে এসেছে রামমূর্তি, এসেছে মীর্জাপুর থেকে, সে যাচ্ছে কুড়ুল কাঁধে; কাল-ই ঐ অবিনাশ এসেছিল জিজ্ঞাসা করতে ইতিহাস মনে রাখার কী উপায়, সেটা ওকে ব'লে দিতে হবে—এদিকে অঙ্কে এম.এ.। প্রথম বিভাগে পাস করেছে। আর-একটা এম.এ. দিয়ে আই.এ.এস. পরীক্ষায় বসবে। ও নিয়ে চলেছে করাত—গাছ কাটবে ব'লে। এইসব ছেলেরা চলেছে তো, পারুক না-পারুক আসে যায় না, চলেছে এই ভালো, এই ঢের।

*

বেলা ৮টা ১০ মিনিট। নেমে এসেছি ডাক্তারের এলাকায়। ছোট্ট ডিস্পেন্সারির সামনে ফালি-বারান্দায় টেবিল পাতা। কম্পাউণ্ডার কার একটা ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। ডাক্তার একটা প্রেস্কিপ্‌শান লিখছে। সামনে একটা ঘোড়া বাঁধা। অনেকগুলো লোক মাটিতে উবু হয়ে বসে। রুগী। আশেপাশের গাঁ থেকে এসেছে।

ঘোড়া দেখে বললাম—"ডাক্তার কি ডাকে চললেন নাকি?"

"হ্যাঁ। যাবেন? চলুন না। এই, আর একটা ঘোড়া নিয়ে আয়।"

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললাম—"ক্যাম্প থেকে চলে যাই কি করে?"

ডাক্তার বাঁকা-চাউনিতে হেসে বললেন—"বটেই তো; সূর্য-চন্দ্র নড়িয়ে দেবার ভারও তো আপনার!"

লজ্জিত হ'লাম।

ডাক্তার ব'লে চললেন—"বড্ড egocentric লোক আপনি।"

লাল হয়ে গেলাম।

তখন ঘোড়া চলেছে বেগে ঢালু পথ বেয়ে। জঙ্গলটা ওপরের দিকে। নীচের পথটায় তবু একটা শান্তশ্রী। কিন্তু গভীর ছায়ায় ঢাকা পথ। সাক্ষ্য দেয় পথের মসৃণতা, সাক্ষ্য দেয় নিপীড়িত পচনশীল জীর্ণপত্র, সাক্ষ্য দেয় মাঝে মাঝে থেমে যাওয়া পাহাড়ের মোড়ের মাথায় ভস্মরাশি। এ পথ পায়ে-চলার পথ—নিয়ে গেছে লোকবসতির মধ্যে। কিন্তু সে-বসতি আসতে এখনও ঢের দূর।

ডাক্তার হঠাৎ বললেন—"চলবে নাকি?"

অবাক—চেয়ে দেখি পকেটে চ্যাপ্টা বোতলে বিলিতী সুরা।

আমি বললাম—"সত্যিকথা ভাই, খাইনা; বড়ো বাধে সংস্কারে। তা ছাড়া বাবার নিষেধ মেনেই এসেছি অদ্যাবধি। আমাদের ঘেন্নার কথা বোলোনা, ভাই। ভালোছেলে হবার দুরাশা ও লোভ পরিত্যাগ করতে আজও পারিনি।"

"তাইতো শিক্ষকরা বড়ো হয়না।"

"আর বড়োরা শিক্ষক হয়না।"

ডাক্তার হেসে বললেন—"বড়ো—বড়োই।"

আমি তাল পেয়ে বললাম—"শিক্ষক শিক্ষকই—বড়ো নইলে চলবে, শিক্ষক চাই। ভান করার জন্যও, বুজরুকির জন্যও শিক্ষক চাই-ই।"

নামছি তো নামছিই। এর মধ্যে একেবারে খোলাখুলি রোদের মধ্যে এসে পড়েছি। দুটো পাহাড়ের ঢালের শেষটা যেখানটায় এসে গায়ে গায়ে ঠেকাবার চেষ্টা করছে, সেখানে সেখানে সজল ব্যবধান; সেখানে সেখানেই একেবারে চুলের কাঁটার বাঁক, আর সেখানে সেখানেই স্বপ্নরাজ্য। পাহাড় সুন্দর, বন সুন্দর, ঝর্ণা সুন্দর, কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে মিশ খাবার জায়গাটার মতো সৌন্দর্য খুব কম দেখা যায়। সেখান থেকে চাও, দূরে আরও দূরে চাও, দেখবে আকাশ ঢের নীচে, সমতল যেন ছুঁতে পারো চোখ বাড়িয়ে। পাহাড়ে দিগন্ত দেখা একটা কামনা, তৃষ্ণা। কথায় কথায় উন্মুক্ত পিয়াসী দৃষ্টি বাধা পেয়ে ফিরে আসে। বাধা পায় বটে, কিন্তু আঘাত পায়না। এমনই শ্যামল

সরসতায় ভরা সেই থেমে যাওয়া। তা ছাড়া সেই শ্যামলের দেশে নব নব পত্রপুষ্পের বৈচিত্র্য ; অনুসন্ধানী মন ভূরিভোজ লাভ করে।

তবু তারই মধ্যে যখন একটু গলি বেয়ে সেই দৃষ্টি প্রান্তরের পানে ছুট লাগাতে পায় তার আর কথা নেই তুলনা নেই। তাই পাহাড়ের বাঁকের চেয়েও পাহাড়ে পাহাড়ে কোলাকুলির দেশগুলো আরও অভিনব, আরও মনোহর।

ডাক্তার গ্রামটায় পৌছালো যখন তখন বেলা হয়ে গেছে। আমি ঘোড়ায় ছোটার ধকলে ঘেমে গেছি। কিন্তু দেখলাম আতিথেয়তা ও সম্মান!

এইসূত্রে মনে পড়ে গেল আমার নৈনিতালের তরায়ে থাকার সময়কার একটা ঘটনা। ঘটনা বলি কেন, বিশেষ চিন্তনের ধারা। হাওড়া, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, চেরিং-ক্রসের তুলনায় কাশীপুর জংশন যেন মোহনবাগান টীমের কাছে তেলেনীপাড়া টীমের মতো, ফোর্ড কোম্পানির কাছে জনতা সাইকেল রিপেয়ার্স। তবু কাশীপুরের একটা বিশেষ খাতির ছিল ঐ জঙ্গল অঞ্চলে। ব্যবসাটাও বেশ জোরদার।

সেখানে ইংরাজী উচ্চবিত্মালয় ; তার প্রধান শিক্ষক আমি। এই কাশীপুরের কোর্টে যখন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ওকালতি করতেন, তখন ওই স্কুলেরই তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাই আমাদের গর্ব বড় কম ছিলনা। কিন্তু সে-দেশই এমন মজার দেশ যে, লোককে খাতির করার সুযোগ পেলে বর্তে যেতো। আমরা হয়তো নাগরিক ঝাঁঝের মধ্যে থেকে এইজাতীয় উৎকট আতিথেয়তাকে সোজা গ্রাম্য ব'লে উড়িয়ে দেবো। তবু মানবতার বাজারে এইসব গ্রাম্যতার সুর কেমন যেন সুরেলা বাজে, কেমন যেন মধুর ঠেকে।

গ্রাম আর শহরের মধ্যে চলে-ফিরে দেখলাম, *smart* হওয়ায় শহরের জৌলষ যেমন খোলতাই হয়, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যটুকু করতে পারলে যেন গ্রাম্য লোকের মনটা ভরে ওঠে। সাধারণভাবে বোকামিটাকে ওরা কেমন যেন মানিয়ে নিয়েও খুশি করতে পারে। শহরে সব সয়, ঠকে যাওয়া সয়না। তাই প্রাণপণে বোঝাযুঝি সেয়ানে সেয়ানে।

এই কাশীপুরের দু'একটা বোকামির কথা শুনলে হাসবেন আপনারা। এখন মনে করে আমার কান্না পায়।

অনেকদূরে একটা তেলের কল। সরযে হয় খুব কাশীপুরের আশেপাশে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে কল দেখতে গেছি। দেখে ফিরে এসেছি। পরদিন

বাড়ীতে একটিন তেল। ভেট দিলে বুঝি, ভেবে চটে গেলাম; বললাম— "ফিরিয়ে নিয়ে যা—এক্ষুণি যা"—আমরা যে শহুরে চট্‌পটে স্মার্ট। তাই সত্যসন্ধতা ও ন্যায়নিষ্ঠাটাও আমরা ঝাঁঝের মধ্য দিয়ে দেখাতে ভালবাসি! সন্ধ্যাবেলায় মিল-মালিক বৃদ্ধ রঘুবরদয়ালজী এসে বললেন—"মাস্টারজী, আমি একা। আমার ছেলেপিলে কেউ নেই যে তোমার স্কুলে পড়ে এবং সেইজন্য ভেট পাঠাবো। তুমি সম্মানিত বিদেশী। এই ঘোর বনে এসেছো এদেশের বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়াতে। আমার মিলে গেলে, তোমার খাতির করবনা? কি বলো? তোমার দেশে গেলে তুমি কি আমায় কলকাতার রসগোল্লা খেতে দেবেনা?"

এমনি একবার সাবিত্রী পাহাড়ে উঠেছি। তখন সবে ভোর। পাহাড়ে উঠতেই সাবিত্রী-মন্দিরের পাণ্ডার টিপ্ করে আমার পায়ে এক প্রণাম। পায়ে মাথা রেখে প্রণাম কেমন যেন সহ্য হয়না। তাতে তীর্থস্থান, এবং প্রণাম যিনি করলেন তিনি সেই দেবমন্দিরের পূজারী।

আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন—"রাগ করবেন না, বাবুজী। আমি কাল বিকেল থেকে আপনার অপেক্ষায় আছি। আমার লোকেরা বললে বাংগালী বাবু, খদ্দর পরা, এসেছেন, মাথায় গাঁধীটুপী—আমি সারারাত হাঁ করে বসে আছি খবর জানার জন্যে।"

বিস্মিত আমি।—"কী খবর?"

"হ্যাঁ বাবু, সামনে দেবী-মাঈ। সত্যি করে বলো তো, সুভাষবাবু বেঁচে আছেন কিনা?"

সেই একান্ত নির্ভরশীল প্রশ্নের সম্মুখে আমি আমার স্মার্টনেস দেখাতে পারিনি। আমি বললাম—"তোমার কি মনে হয়?" প্রশ্নের উদ্দেশ্য, একটু সময় নেওয়া এই অপূর্ব সরলতার আক্রমণ থেকে একটু আত্মরক্ষা করার জন্য।

পাণ্ডা বললো—"মরেনি বাবু, মরেনি। কালীমাঈর পূজারী সে। ইংরেজের বেড়া পার করেছে সে। মরেনি সে। তুমি জানো বাবু, বলো।"

আমি সুভাষবাবুর মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও। কিন্তু সেদিন বিজ্ঞের মতো অটুট প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলাম—"বেঁচে আছেন তিনি। আবার আসবেন। তোমরা কাজ করে যাও—নৈলে এসে হয় বকুনি দেবেন, নয়তো অভিমান করে চলে যাবেন।"

আর একটা ঘটনা বলবো এইসব গ্রাম্যদের স্মার্টনেসের অভাব নিয়ে। ঐ কাশীপুর থেকে আসছি সপরিবার। ট্রেন-টাইমের কিছু ঠিক থাকেনা এসব লাইনে। একটা স্লিপ লিখে পাঠালাম স্টেশনমাস্টারকে—"ট্রেন-টাইমটা জানিয়ে দেবেন।" উত্তরে পেলাম একটু চিঠি—"সময় দশটা আটান্নো। তা আপনি যদি দেরিতেও আসেন ক্ষতি নেই। ট্রেন ধরে রাখবো। কষ্ট করে তাড়াতাড়ি করবেন না।"

এখানে পড়তে গেলে কথাটায় হাস্যরসের সম্ভাবনা বেশী। কারণ আমরা স্মার্ট—সাহিত্যিক—নাগরিক। কিন্তু হীরাবল্লভ যোশী, স্টেশনমাস্টার—কাশীপুর, নৈনিতাল, চাকরির কথা ভাবেনি, কোডের কথা ভাবেনি, জংশনের অন্য গাড়ীর কথা ভাবেনি। সত্যি-সত্যি ভেবেছে তার দেশের বাঙালী অতিথির কথা। তার যেন কষ্ট না হয়।

ভারতীয় আতিথেয়তা বলতে যে প্রবাদ আছে তার আসল রস এইখানে, এবং সে রস পেতে গেলে ফ্যাক্টরির সিরাপ খেলে চলবেনা—গ্রামে গিয়ে রস-নিংড়ানো 'কলুহ'র ধারে গিয়ে বসতে হবে। গ্রামে না গেলে এই ভারতীয় রস পাওয়া যায়না।

এমনি একখানা গ্রামেই আমি আর ডাক্তার এসে পৌছলাম। গ্রামের নাম—কোটী। কোটীর প্রধান গ্রামীণ ধোঁধু। তিনি যে খুব সম্পন্ন তা নন। তবু সরকারের তরফ থেকে তাঁর মারফতই প্রধান খবর চলাচল করে। তিনি মুখপাত্র। কোটী খুব বড়ো গ্রাম নয়। চাষ ভালো হয়। বেশীটাই গম আর যব, কিছুটা চালও হয়। আলুই প্রধান পণ্যচাষ। থরে থরে ক্ষেত সাজানো। গমগুলো সবে বড়ো হয়ে উঠেছে। আলু প্রায় হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে লাল শাক আর সরষের চাষ। সবাই খাটছে মাঠ নিয়ে। গরুগুলো ছোটো ছোটো। এতো ছোটো যে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না ওদের গোয়ালঘরের দরজার সাইজ।

কাঠের বাড়ীর ওপরতলায় ওরা বসবাস করে। ওপরতলা বললে ভুল করা হবে। বাড়ীগুলোই একটু উঁচু ভিতের ওপর। ভিত অবশ্য কাঠের ক্রেমের। ছোটো-ছোটো আট-নয় ধাপ সিঁড়ি। একফালি বারান্দায় উঠনো। বারান্দাটা বাড়ীর ঘরকে কেন্দ্র করে চারিধার দৌড়েছে। ছাতাটা টিনের বা কাঠের ক্রেমের ওপর স্লেট-পাথরের। এ পাথরও ওদের সংগ্রহ করতে হয়। যার

যতই সহজ বাড়ী হোক, গরীবী ঢঙের হোক—বাড়ীর ফ্রেমে একটু কাজ থাকবেই। দেখতে সুদৃশ্য ও নিপুণ। ওপরের বড়ো ঘরখানিই দরকারমতো দু'খানা বা তিনখানা করে নেওয়া।

বেশীর-ভাগ ছাদের ওপরেই নানা শস্যের দানা শুখুচ্ছে। তার গাঢ় সোনা-রং থেকে নিয়ে হালকা অতসী-রঙের চৌকা-চৌকা বিস্তৃতির ওপর থেকে দেখে হঠাৎ বিস্ময় লাগে। তা ছাড়া বড়ো বিচালীর স্তূপও আছে ছাদের মাথায়।

আর বাড়ীর তলাটায় গোয়াল। চারধার বন্ধ। একধারে খুব ছোটো একটা চৌকো ফাঁক। আমাদের দিকে একটা তোরঙ্গের ডালা তুললে যেমনটা দেখায় প্রায় তত বড়ো। গরু ভেতরে ঢুকছে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না, সেটা গোয়াল।

এমনি ঘর শীতের সময় ওদের বড়ো কাজ দেয়। বরফে চারধার ঢেকে যায়। এই দরজা ওরা বন্ধ করে দেয়। গরুগুলোকে খাবার দেয় ওপরতলার মেঝের পাটাতন খুলে। এমনিতে গরম থাকে। এ নৈলে, দূরে থাকলে, গিয়ে গো-সেবা করা হয়ে উঠতো না।

ফলে গ্রামগুলো খুব নোংরা। বাড়ীগুলো ছাড়া তার সামনে পেছনে সব নোংরায় ভর্তি। হাঁটু ডুবে যায় এতো গোবর আর খড়ের স্তূপের ওপর দিয়েই চলাচলের পথ।

ওরই মধ্যে তবু মাঝে মাঝে নিকুনো জায়গা অনেকটা। এইসব জায়গাকেই ওরা 'খলিহান' ব'লে ব্যবহার করে। যব, গম, ধান সব দলাই-মলাই করে ছাড়ায়, ঝাড়ে, আছড়ায়, গোলাজাত করে।

এদের দেশে গোলা নেই, অর্থাৎ গোলার জায়গা নেই। বড়ো বড়ো চামড়ার শক্ত মশকের মতো। সেইগুলো ভরে-ভরে রাখে। পাট নেই, শণ নেই, তাই বস্তা নেই। ঐ চামড়ার বিরাট বিরাট জালার মতো—মশকের মতো। মেয়েরা সব ঝাড়ে, পোঁছে, ভরে রাখে।

এইসূত্রে ধরা পড়ে যায় এদের বৃহত্তম সমস্যার কথা। সেই বস্ত্র-সমস্যা। পশুর গায়ের ওপর ভরসা করে পশম সংগ্রহ করা যায়, পশম পাকিয়ে বুনে কাপড় যা করে চমৎকার। সব ঠিক। কিন্তু তুলোর কাপড়? সেটা পায় কোথা থেকে? সাধারণ সমাজে তাই এদের পশমী পোশাকগুলোকে সম্পত্তির মতো

ব্যবহার করা হয়। তালি মেরে মেরে আসল কাপড় হয়তো লোপাট হয়ে গিয়েছে তবু কারুর ভরসা হয়না একটা উনী কাপড় ফেলে দেয়। কাচাকাচিও তাই কম। ফলে ওদের কি সামাজিক, কি ব্যক্তিগত, কি দৈনন্দিন জীবনে নোংরামির নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। এক একটা পাহাড়ী ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ির গায়ে নানা ধরনের জীবজন্তু থাকা আশ্চর্য নয়—কেউ উকুন, কেউ পিসু, কেউ কিছু কেউ কিচ্ছু, ছোটো-বড়ো কতই নাম।

স্নান ওদের করতে নেই। বাচ্চা জন্মালেও শিশু বা প্রসূতিকে ওরা স্নান করায়না বা করেনা। স্নান করাটা ওদের ততটাই পাগলামি, না-স্নান কথাটা যেমন আমাদের। ওদের সব-কিছু পোশাক সজ্জা, গোড়ার এই নোংরামিকে স্বীকার ক'রে তারপর।

ফলে রোগ নানা ধরনের। তার মধ্যে যক্ষ্মা এবং ফেরঙ্গ-রোগের আক্রমণ অসামান্য ও বহুল। শুনে আমার চক্ষুস্থির।

ডাক্তার বললে—"কেন, অবাক হবার কি আছে ?"

"নেই ? কি বলেন ? আমরা যারা দেশে ঐ সমতলে থাকি, পাহাড় বলতে অজ্ঞান। টি.বি. হলেই পাহাড়পানে মুখ ফিরিয়ে একেবারে চোঁ-চাঁ। ভাবি এখানকার পরিষ্কার জল আর বাতাসে ঐসব রাজ্যের কীট-বীজাণুর দফা গয়া। এখানে ঐসব বৌবাজারী রোগ ? বলেন কি ?"

ডাক্তার বললেন—"পাহাড়ের সুনাম তার বাতাসের জন্য ; ঠিক। এই বাতাসে ধুলার অভাব, Ozone-এর উপস্থিতি, পাইনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রভাব এসব পাই বটে ; কিন্তু পাহাড়ের জল তো ভালো নয়। তবু নদীর জল কতকটা। ঝর্ণার জল কবিতায় ভালো। এক একটি ঝর্ণার ব্যাপার সোজা miniature Zoological garden, মাইক্রস্কোপের তলায় ফেললে হয়—"

"তবে ? ওদের দেশের পাহাড়ে শুনি···"

"হ্যাঁ, সুইজারল্যাণ্ড আর পীরানীজের কথা আলাদা। ওদের থাকার কায়দায় গরীবি নেই। আমরা যত-না দরিদ্র, তার চেয়ে বেশী আমাদের দারিদ্র্য। দরিদ্র হওয়া প্রকৃতি সহ্য করলেও, দারিদ্র্য প্রকৃতি সহ্য করেন না। এই যে ওঠা-নামা চলাচলের পথ, এই যে শ্রমসঙ্কুল জীবন, এর সঙ্গে প্রচুর খাদ্য নেই, নিয়মিত খাদ্য নেই—আর আছে অনড় নোংরামি। বলতে যান, এমন করে পেছু লাগবে সরকার থেকে—বদলিতে বদলিতে খেয়ে ফেলবে।"

"যক্ষ্মা নয় বুঝলাম অর্থনৈতিক কারণে এসে পড়েছে, বাড়লো কি করে তা ?"

"কেন ? ঘর তো দেখলেন। শীতের পুরো তিনমাস ঘরে বদ্ধ থাকে। এক একটা ঘরে আট-দশ জন। একই লেপের তলায়, কম্বলের তলায় সব শোয়। ঘরের মেঝেতেই সব থুথু ফেলে। বাকী সব প্রকৃতির তাগিদগুলো সারতেও বেশী দূর যায়না। এরপরে তিনমাসের মাথায় যখন ওরা বেরুলো তখন ক'টা টাটকা রইলো ? এই কারণে Eskimo-দের মধ্যেও এই রোগ-দুটির প্রাদুর্ভাব সাংঘাতিক মাত্রায় বেশী।"

"অন্য রোগটি কেন ডাক্তার ?"

"ওটা আরও গূঢ় ব্যাপার। আপাততঃ এদের খাতির করার মাত্রাটা দেখে যাও। দুধ, ডিম, চা, মদ সব এনে হাজির করেছে। ওই টিনে ওটা কি ? ঘি বুঝি। সামলাও মাস্টার, সামলাও, নৈলে কি মদে, আর কি চায়ে দেবে পো-টাক ঘি ছেড়ে। সর্বনাশ হবে।"

আঁতকে উঠে বললাম—"চায়ে ঘি ?"

"ওমা, জানোনা ? এরা মাংস রাঁধে চিনি দিয়ে, চা রাঁধে গরমমশলা দিয়ে। বিশিষ্ট অতিথি এলে চায়ে অবশ্যই এরা ঘি দেবে। বারণ করলে ক্ষুণ্ণ হয়, গাড়োল ভাবে, আর মনে করে সভ্যতার পোশাকে কতো জানোয়ার ভন্দু-মার্কা লোকই এদেশে আসে।"

চা খাবার জন্য প্রাণ আনচান করছে। প্রকাণ্ড একটা রূপার কেটলিতে গরম জলে চায়ের পাতা। দুধটাও এলো রূপার বাটিতে। ওপরে ক্রীম দেখা যাচ্ছে। এখন ঐ চা যদি কেউ ঘি দিয়ে গুলি করে, চা মরুক না-মরুক, আমি মরে যাবো।

ঘিয়ের টিনটা সরিয়ে নিলাম্। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচ জন হাঁ-হাঁ করে উঠলো। ধোঁধু সর্দার তো হাত জোড় করে এসে বললো—"বাংলা-মুলুকের হিকমত্দার জাদুগর শের আপনি, ঘি খেতে এতো তকল্লুফ্ (formality) কেন ? ঘি আপনি যথেষ্ট সেবন করতে পারেন। এ গাঁয়ের ঘি প্রসিদ্ধ—মশহুর। চায়ের সঙ্গে ঘিয়ের যেমনটি দোস্তি এমন আর কিছুর সঙ্গে নয়। আস্লি ঘিয়ের পহ্চান্ই চায়ের পেয়ালায়।"

ও বাব্বা, এযে রীতিমতো ফ্যাসাদ ! চা খাবো ঘি দিয়ে। বিয়ের কনের চিবুকে কয়েকগাছা সোনারঙের দাড়ি দেখাও যে এর চেয়ে সহজপাচ্য বিস্ময়।

ডাক্তার অবশেষে বললো—"বাঙালীরা সাধারণতঃ ঘি ছাড়া চা খায়না সত্য—কিন্তু এই ভদ্রলোক খুব ধার্মিক ও সাত্ত্বিক। ইনি এঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস জ্বালামুখীকে উৎসর্গ করেছেন। ঘি খাওয়া ইনি ছেড়ে দিয়েছেন।"

তখন ওদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার সীমা রইলনা। সকৃতজ্ঞ চোখে ডাক্তারের দিকে চেয়ে দেখি, ও একটা বোতল থেকে লাল-টুক্‌টুকে আপেলের fermented (আসবীকৃত) রস ঢালছে—আর তার মধ্যে ফেলে দিলে একতাল ঘি।

আমার পাংশু বিস্ময়ের পানে কৌতুকভরে চেয়ে বললে—" 'চয়নিকা'র পাতা ছিঁড়ে উনুন জ্বালাতে দেখলে এর চেয়ে কি বেশী বিস্ময় হ'ত তোমার মাস্টার?"

ডাক্তারের রসবোধের তারিফ করে বললাম—"বাঙালীর হাড়ের খবর জানো দেখছি।"

হেসে বললে—"জানবোনা? বাংলায় থাকতে কত বাঙালীর কত ভাঙা-হাড় জুড়ে দিয়েছি!"

কেস্‌টা ছিল মৃতবৎসার।

কিছুই ছিলনা কেসে। পাঁচ-ছয়দিন যন্ত্রণা ভোগের পর প্রসূতি জন্ম দিয়েছে একটি মৃতসন্তান—ডাক্তার আসার ঘণ্টাখানেক আগে।

যত কঠিন কেস্‌ই হোক, ওদের নিয়মিত চাটুকুনি না খেয়ে ডাক্তারের কোনো কাজ করার জো নেই। ওদের বিশ্বাস এর পরে ডাক্তার আত্মীয় হয়ে যাবে, এবং ওষুধপত্র ভালো দেবে। না খেলেই সততা সম্বন্ধে সন্দেহ।

ডাক্তার গিয়ে রোগিণী দেখে ফিরে এলেন। আমি সেই সময়টা সুভাষ-বাবুর গল্প আর বোমা-তৈরীর খবর শোনাতে লাগলাম।

শোনাতেই হয়। না শুনিয়ে উপায় নেই। নৈলে সরল নিরক্ষর মন ক্ষোভে ভরে ওঠে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ভারতের গ্রামের ভিতরে কোথাও সরল চাষী-মজুরদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন, অহিংস নীতি, সত্যাগ্রহ ইত্যাদির আলোচনা শুনিনি। কিন্তু এই সুভাষ বসুর কাহিনী। গান্ধীজীকে নিয়ে কথা বলা লোক ছেড়ে দিয়েছে; যেমন বাল্মীকি, শুকদেব বা যাজ্ঞবল্ক্য নিয়ে আলোচনা লোক ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সুভাষকে নিয়ে আলোচনা ওরা

ছাড়েনি; যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে, হরিশ্চন্দ্র আর নলরাজাকে নিয়ে আলোচনা চাষীমহলেও কেউ ছাড়েনি।

সুভাষের কথা কত বিচিত্র রূপে এইসব গিরিকুক্ষির মধ্যে নানা রঙে নানা রসে চিত্রিত হয়ে উঠছে তার আর ঠিকানা নেই। 'বাঙালী-বিদ্বেষ' 'বাঙালী-বিদ্বেষ' ব'লে যে ধুয়া উঠেছে তা তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, চাকরী ও ব্যবসার মাধ্যমে ধনলক্ষ্মীকে নিয়ে কাড়াকাড়ির তৃষ্ণায়। কিন্তু যারা আবহমান কাল ধরে জমির সাথে যোগাযোগ রেখে এলো—সেই-সব সরলপ্রাণ মানবসমাজের মধ্যে আজও দেখেছি বাঙালীর সম্মান। বাঙালী গাঁয়ে এসেছে যেন জলন্ত অগ্নিপিণ্ড এসেছে, যেন চলন্ত বিদ্রোহ এসেছে, যেন বিদ্যা ও বুদ্ধির রাজ্য থেকে ambassador এসেছে। এই প্রীতি, এই অভিনন্দন আজও বাঙালীর বাঁধা। আজ আবার তাতে সুভাষের নাম যেন সোনার ক্ষেতের সোনার ফসল। 'গান্ধীজী কি অমর কহানী' গানের ধুয়া গ্রামোফোন-রেকর্ডের মারফতে পানওলা-বিড়িওলার মধ্যে খুবই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সে কতদূর? যতদূর গ্রামোফোন-রেকর্ড যায়। কিন্তু যে প্রাণবহা নাড়ী বেয়ে ভারতের নগরে নগরে কান্তারে কান্তারে একদিন শাক্যসিংহের গুণগান ছড়িয়ে পড়েছিল, যে প্রাণবহা নাড়ী বয়ে একদিন দীনতম উপায়ে পৃথ্বীরাজ চৌহান আর ছত্রসাল বুন্দেলার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল—সেই প্রাণবহা নাড়ী বেয়ে সুভাষের গান ভারতাত্মার মণিকোঠায় অনুরণিত হচ্ছে।

সুভাষ বসুর কথা বলতে বলতেই ডাক্তার এসে পড়লেন। তাঁর মুখ চোখ লাল। প্রথম গেছে সাত-সকালে *Haywards*, তারপর আপেল-চোয়ানো মাল। ভাবলাম হরমোন্‌গুলো বুঝি তাড়া খেয়ে কিল্‌বিল্ করে উঠেছে। কিন্তু ডাক্তারের চোখে তো সে-ফুল্‌কি নেই। সেখানে যেন রাজ্যের বর্ষার মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। আমায় বললে—"একটা মজা দেখবে? এসো।"

যা দেখলাম আর যেন না দেখি!

খোলা দরজার মুখে খড়পাতা বিছানার ওপর একটুকরো ন্যাকড়া জড়ানো একটি পচে-গলে-পড়া মানব-শিশু-দেহ। দূরে মেঝেয় খড় পাতা। তার ওপর একটা কম্বল। মুড়িশুড়ি দিয়ে শুয়ে প্রসূতি। অসাড় পড়ে আছে। সারা ঘরটা যেন বেদনায় আড়ষ্ট। ব্যর্থ জীবনের আর্তনাদে প্রভাত যেন কুণ্ঠিত।

আমি চাইলাম ডাক্তারের মুখের পানে; ডাক্তার আমার মুখের পানে।

সেই কথা নিয়েই কথা বলতে বলতে ডাক্তার এগুচ্ছে। এখন চড়ায়ের পথ। ঘোড়া দুলে দুলে চলছে, খড্ডের ধার ঘেঁষে। জীন থেকে কেবলই পিছলে সরে যাচ্ছি। লাগাম ঢিলে দিয়ে রেকাব চেপে আছি। ডাক্তার *Haywards*-এর খালি বোতলটা খড্ডে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

"অন্য রোগটার কথা সকালে জিজ্ঞাসা করছিলে? তখন জবাব দিতে পারিনি.; খুব আশা ছিল তুমি থাকতে থাকতেই একটা কেস্ পেয়ে যাবো। ভগবানের আশীর্বাদ; আজই পেয়ে গেলাম।"

"আশীর্বাদ! আশীর্বাদ বলছো?"

"আমি ডাক্তার। রোগ দেখতে দেখতে ভাষার কোমলতা হারিয়ে ফেলেছি। কারুকে কোনো কেসের কথা বোঝাতে গেলে চোখের ওপর কেস্ পেয়ে গেলেই তাকে 'আশীর্বাদ' বলি।...তা নিয়ে ব্যস্ত হোয়োনা। রোগটা কী বুঝিয়ে বলতে হবে কি?"

মনে পড়ে গেল সে সগুচ্ছিন্ন শাবকটির কথা। বিবর্ণ মাংসপিণ্ড, গায়ে ভরতি রক্তাভ গুঁড়ো-গুঁড়ো স্ফোটক। একটু ঘষা লাগলেই যেন দগ্‌দগে ঘা বেরিয়ে পড়বে। যে চোখ-দুটি বোঁজা, যে চোখ সে পেয়েও কখনও খোলেনি, যে চোখের জ্যোতি সূর্যের জ্যোতির সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে পেলোনা—তারই দু'পাশে চিট্‌চিটে গঁদের মতো কী যেন লাগা। ভ্রূর পাতা নেই, নেই মাথায় চুল। মাথা-ভরতি যেন এক্‌জিমার মাম্‌ড়ি। অতিশিশু, অথচ সম্পূর্ণ অবয়ব নিখুঁত তৈরী। Spirochoeta Pallida-র আক্রমণের চিহ্ন ওর শিরায় শিরায়, প্রবাহে প্রবাহে।

গম্ভীর হয়ে বললাম—"না!—কিন্তু মৃত সন্তান?"

"হ্যাঁ—মৃত। সাতমাসের বেশী এদের সাধারণতঃ ভ্রূণে স্থান হয়না।—ছয়মাস, সাতমাস;—ব্যস্। তারপরেই প্রকৃতির উদ্গার এরা। মায়ের রক্ত এদের প্রাণবহা ধমনীর স্রোতে এক হ'তে পায়না বটে, কিন্তু বাপের সংক্রমণ বিষাক্ত হ'লে কখনও কখনও এদের রক্তও..."

"ডাক্তার, আমি ডাক্তারির ছাত্র নই। অন্য কথা বলো।"

পাখী ডাকছে মাথার ওপর। ছায়ায় ঢাকা, নরম বুকের মতো পথ। সূর্যের আলোর উল্লাসে শ্যামল জীবন পল্লবিত ব্যাকুলতায় চঞ্চল।

"সৌন্দর্যবোধে বাধছে বুঝি? বাধছে বুঝি রুচিতে?...কিন্তু সত্যকথা

এগুলি। পাহাড়ীরা যায় সৈন্যদলে চাকরি করতে। বিদেশীরা এসে পাহাড়ী মেয়ে ভোগ করে যায়। বহুনায়কের দেশ যখন নায়কহীন হয়ে যায় তখন নারী তো পান্থপাদপ। মরুভূমি থেকেও রস টেনে নেয়, পথচারীর তৃষ্ণা নিবারণ করে। তাই পাইকারি দলে Spirochoeta Pallida এসে পার্বতী সুন্দরীর দেহে কবিতা রচনা করতে লেগে যায়; পার্বত্য যুবক সেই কাব্যস্রোতে গা ঢেলে দিয়ে…"

ডাক্তারের চোখে হাসি, গলায় উপহাস। আমি রুচির কথায় আড়ষ্ট হয়েছিলাম, তাই ইচ্ছে করে কাব্য করে করে কথাটা বলছে।

আমি বললাম—"সত্যি তুমি বড় ফাজিল হে!"

ডাক্তার হেসে বললে—"কেন? ফাজলামি কি! এবার তো তোমাদের কাব্যের ভাষায় বলছি। তাতেও দোষ?"

"সালভারসন্ উইজ্‌ম্যান্-চিকিৎসা…"

ডাক্তার বললে—"বস্তায় করে টিউব যদি আসে আর হোস্ করে যদি ছাড়া যায় তবেই এদেশে ঐসব টেস্ট এবং চিকিৎসা কাজ দেবে।"

"সর্বনাশ ডাক্তার! এরা বাঁচবে কি করে?"

ডাক্তার বললে—"Greenland-এ Eskimo-রা বাঁচে কি করে? তাদের তো ঘরে ঘরে রোগ। কৃমি বাঁচে কি করে? মাছি? প্রকৃতিতে যে বিষ মিশে গেছে প্রকৃতিই সেই সংঘাতকে আয়ত্ত করতে ব্যস্ত। আমরা আর কতটুকু করবো?"

"আর এদেশেই হাসপাতাল নেই?"

"ভাগ্যিস্ নেই। নৈলে ওরা ভরসা করে থাকতো! এখন ওরা ভরসা করেনা। নিজেরাই এটাকে মেনে নিয়েছে।"

"কিন্তু এতে যে শেষ হয়ে যাবে।"

"কে? মানুষ? তাহলে দারিদ্র্য ভোগ করবে কে? মানুষ শেষ হয়না সহজে। Amoeba-র চেয়েও কঠিনপ্রাণ এই মানুষ। ভারতবর্ষের সমস্যা 'মানুষ শেষ যাতে না হয়' এ নয়; যাতে মানুষ না বাড়ে। এ সমস্যা সমস্যাই নয়, মাস্টার!"

*Haywards* ওর মাথায় চড়েছে; ওর মগজকে করেছে আয়নার মতো স্বচ্ছ; ওর জিহ্বাকে করেছে ক্ষুরধার। "এরা মরবেনা। মরলে, ভোট দেবে

কে নেংটি পরে? মন্ত্রীমশায় এলে, দোরগড়ায় ধন্না দেবে কারা? কাদের তোমরা শোনাবে 'দেশ, সরকার, হুকুমৎ এখন তোমাদেরই!' " হঠাৎ ডাক্তারের হাতের চাবুক সপাং করে উঠলো। তার ঘোড়াটা চমকে লাফিয়ে চলে গেল বাঁকের ওধারে। ক্ষুরের শব্দ কানে ভাসছে। ভয় পেয়ে আমার ঘোড়াটাও ছুটতে লাগলো প্রাণপণে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তারের ঘরে রুটি আর ডিম খেলাম। কড়া কফি খেলাম পরে।

কিন্তু কিছুতেই পাড়তে পারছিলাম না—যে-কথাটা জিজ্ঞাসা করবার জন্য প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে। ডাক্তারের মেজাজ আজ ছিঁড়েখুঁড়ে জোট-পাকানো। ঐ কেস্ করবার পর, ঐ ধরনের কথাবার্তা চালানোর পর, একটি বোতল বিলিতী সুরায় জরানো মেজাজ নিয়ে ঘাঁটাতে সাহস হয়না। কিন্তু আজও তো রাত হবে, আজও যে ঐ তাঁবুতে শোবো; কালকের মতো কি ভেবে-ভেবেই কাটবে: 'কার হাত গত যামিনীতে আমার হাত ছুঁয়েছিল?'

রোমান্স নিয়ে রোমাঞ্চ-বিলাসের বয়স আছে। সে-বয়স বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। আর সেই শেষ হবার কথাটি টের পাওয়া যায় শেষ হয়ে গেলে। ও রোগ যতদিন থাকে ততদিনই মনে হয় এ যাবার নয়; সত্যিকথা বলতে কি, যাবার-জিনিস এ, তাই-ই মনে হয়না। যখন আর থাকেনা, খুঁজে খুঁজে পাওয়া যায়না, তখনই মনে হয় গেছে, যা-ছিল। একদিন যার চলন দেখলে মনে হতো কাব্য, আজ তার ধারে কাছে আসাও ট্রাজেডি। কৃষ্ণচূড়া-গাছের মাথায় রং দেখতে গিয়ে কাজে দেরি হয়ে যাওয়া আজ বোকামির পরিচয়; ক্লাবে গেছি শনিবার ১টায়, বাড়ী ফিরেছি সোমবার বিকেলে একেবারে আফিস সেরে, ভাবতেও মগজে বাতব্যাধি ধরে যায়। অথচ—*the light that never was on sea or land* দেখবার চোখের বয়স—"হায় গো হায়, চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়"—বসে থাকে না। চিত্রাঙ্গদার কথা—"চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী কারও তরে বসে নাহি থাকে; সে কাহারও সেবাদাসী নহে।" এ থাকার নয়; যাবেই। যখন যায়, টের পাওয়া যায় গেছে, তখন স্বীকার করিনা—গেছে; বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলি—"অভিজ্ঞতা জন্মেছে অনেক ঠেকে

শেখায় ; এসব নেহাত ছেলেমানুষী ।" জরাগ্রস্ত যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা পড়ে, আর নীতিবাগীশতায় ভরপুর হয়ে উঠতে থাকে, তেমনি।

কিন্তু সে রোমান্স নয়; সত্যিকথাই আমায় কাল বাঁচালে কে? তাকে জানা, কেবল রোমান্স-মুক্তি নয়, রোমান্স-প্রাপ্তি নয়,—মানুষের সহজ জিজ্ঞাসায় বাধা পাবার ফলে যে আকৃতি। জানতেই হবে।

ডাক্তার পুরানো কথার জের টেনে বললে—"শুনেছো বোধহয় মাস্টার, যে এদেশের মেয়েরা বহুবিবাহ্ করে ?"

হঠাৎ এ প্রশ্নে চমকে বললাম—"হ্যাঁ, তাতে তো দোষের কিছু দেখতে পাইনা, নীচে আমরা যেমন বহুবিবাহ করি ?"

ডাক্তার রাঙা চোখ-দুটো মেলে চাইবার চেষ্টা করলো ; পারলোনা--কিন্তু জ্বালিয়ে দিলো।

"হ্যাঁ, বহুবিবাহ করো। তোমার স্ত্রী তিনটি পুরুষ নিয়ে ঘর কচ্ছেন মানতে পারো তো ?"

"সে যা বাধে তা সংস্কৃতিতে ; লজিকে নয়।"

"ঐ তো রোগ তোমাদের। জিনিসটা 'জল' বলবেনা, বলবে $H_2O$। তেত্রিশ-নম্বরে পাস করিয়ে করিয়ে এই ধরনের অকর্মণ্য নিরেট বুদ্ধি একচেটিয়া। আধমরার সার্টিফিকেট দিইনা আমরা। আমাদের মড়া সেণ্ট-পারসেণ্ট মরে, আর বাঁচাটাও তাই। তোমরা ফেল্ করাবে, তবু বত্রিশ দেবে ; ছোটোলোক! পাস হবে ছেলেটা জানছো, তবু দিলে তিয়াল্লিশ—পঁয়তাল্লিশ,—যতো সব হিপোক্রাসি—আত্মপ্রতারকের দল। লজিক কি হে ফাজিল, লজিক কি, শুনি ? সংস্কৃতিটি কেমন জানোয়ার, বাস কোথায় ? মোদ্দা কথা, বাধে। বাড়ী গিয়ে গিন্নীকে তাড়াবে, আর দ্রৌপদীর ওপর নাটক লিখবে। পরের বাড়ীর দ্রৌপদী বেশ লাগে!! ব্যাস থেকে নিয়ে তুমি পর্যন্ত সংস্কৃতির বাহক-গুলো পাকা হিপোক্রিট—পেলে সব-ক'টাকে সার্জিকাল-টেবলে চড়িয়ে ছাড়তাম।"

"আমায় তো পেয়েছ।"—সকৌতুকে বললাম আমি।

"আমার ছুরিগুলো বড্ড দামী হে ছোকরা, নৈলে দিতাম সেরে। লজিকে বাধেনা ;—তাতে কি হে ? সংস্কৃতির শিকার হয়ে মরে আছো। লজিকের রামনাম গাইবে কোন্ মুখে ?"

"কিন্তু এদেশে সংস্কৃতিতে যখন বাধেনা তখন আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার বক্তব্য—লজিকের দৃষ্টি দিয়ে আমি বেশ বুঝি যে, এইজাতীয় একটা সমাজ থাকায় কোনও বাধা নেই, থাকা উচিতও নয়।"

"ফলে এদেশের সমস্যাগুলি ভেবে দেখেছো?"

"কী সেগুলি?"

"কল্পনা করেই খ্যাখোনা।"

আমায় আবিষ্কার করেছে গোপী।

"ধন্য স্যার আপনি! আপনার তত্ত্বাবধানে এই ক্যাম্প ডিসিপ্লিন্‌ড্‌ থাকবে? তোবা, তোবা! গজব করেছেন আপনি।"

হাসতে হাসতে বললাম—"কেন। ইন্‌ডিসিপ্লিন কোথায় পেলে?"

গোপীর ছাইরঙের স্যুটের ওপর গলাটায় একটা মাফলার পাকিয়ে রাখা। হাতে টর্চ আর লাঠি; মুখে পান। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বার করে দিলে; আর বললে—"দিল্লগী কথাটা আমি ডিক্সনরি থেকে সরিয়ে দেবো।"

"কেন?"— গোপীর অভিমান হয়ে গেছে।

"আরে সাব্‌, দিল্‌ লাগলে তবে তো দিল্লগী—না লাগলে আবার 'লগি' কি?"

আমাদের দেশের কথা 'যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ'-এর তর্জমা করতে চায় আর কি!

ততক্ষণে বিক্রমও হাজির। গোপীর তুলনায় ঢের 'সোবার'—গম্ভীর মেজাজের। তার পোশাকেও বেরুবার চিহ্ন স্পষ্ট।

আমায় একটা সেলাম জানিয়ে বিক্রম নিবেদন করলো নবাবসাবের মেজাজ আজ বে-এক্কেয়ার! আমার ওপর জবর রাগ করেছে। লাঞ্চে ছিলাম না, ছোলার টিফিনে নেই, লাঞ্চোত্তর আড্ডায় নেই। কোনো programme হতে পায়নি।

গোপী বললো—"হ্যাঁ মশায়, হিমালয়ের ওপর দশহাজার ফুটের মাথাতেই কি দিনগুলোকে মেরে ফেলার তোফা জায়গা পেলেন আপনি? একটা ঝকঝকে দিন; আহা হা, মনে হচ্ছে যেন একগ্লাস শরাবে কেউ পানের পিক্‌ ফেলে দিলে।" ব'লেই পিক্‌ ফেললে।

আমি বললাম—"বেড়াতে বেরুনো হচ্ছে বুঝি ?"

ভ্রূভঙ্গ করলো গোপী বিক্রমের পানে চেয়ে। "হ্যাখো একবার শান্ দেখে যাও। কেমন passive voice-এ কথা শোনো।" আমার পানে চেয়ে বললো—"ওসব হচ্ছেনা স্যার, আপনাকেও যেতে হচ্ছে। কোনও ওজর আপত্তি নয়। আমি একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি।"

আমি বললাম—"পেখাধার বুঝি ?"

বিক্রম খিলখিল করে হেসে উঠলো, আর গোপী লাল হয়ে গেল।

"আজ একটা পেখাধারের লোক সংগ্রহ করেছি। সে রাস্তা চেনে।" বললে গোপী।

আমি বললাম—আজ তোমরা যাও। আমার অনেকগুলি কাজ বাকী—অনেকগুলো। না করে নড়তে পারবোনা।"

গোপী ভেঙে পড়ে বললো—"নেহাত বেরসিক আপনি ; বান্দার কসুর মাপ হয়। কী কাজ শুনি ?"

আমি অগত্যা ওদের ক্যাম্প-অফিসে নিয়ে এলাম।

বিকেলের চা দেওয়া হচ্ছে। আমরা অফিসে বসেই চা খাচ্ছি। পারিখ গোমড়া মুখ করে বসে আছে। ভারী ছেলেমানুষ। অভিমান করেছে। করমচন্দজী বললেন—"মার পেটের বাচ্চাগুলো নিয়ে এসেছেন। এখন এরা পদে পদে মিসিবাবা চায়। পারিখের সংবাদপত্র বেরোয়নি ব'লে মুখ হয়েছে দেখুন।"

ভবানন্দ কিন্তু ওর *Khadrala News* ছাপছে। প্রথমবার বেরুচ্ছে। চার পৃষ্ঠা—ভালোই। সব কথাই সরস ভাবে বলা আছে।

চা চলছে। পারিখকে বললাম—"বেশ তো হয়েছে কাগজ। ভাবনা কি ?"

"আজ সকালে বেরুবার কথা ছিল। বেরুলোনা তো। রবিবার সন্ধ্যে অথচ কাগজ নেই ; সবাই আমায়…" কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল।

হেসে বললাম—"ঠাট্টা করছে। পাগল তুমি ? তোমায় ছেলেমানুষ পেয়ে ঠাট্টা করছে। ঘাবড়াও কেন ? এর পরের রোববারে তোমার কাগজের তৃতীয় সংখ্যা বেরুবে। তাতেই হ'ল তো ?"

গোপী অসহিষ্ণু। পেখাধার !! পেখাধার !!

আমি ক্ষেমচন্দকে বললাম—"ডাইরেক্টর কই ?"

বিরক্তিভরে ক্ষেমচন্দ বললে—"কি জানি কোথায়? আজকের ডাক দেখুন তো!"

খানকয় চিঠি। রেলওয়ে-বোর্ডের, হিমাচল সরকারের ;—চিঠিগুলোর জবাব লিখে দিলাম। টুকিটাকি ত্ব'চারটে নোটীশ সই করলাম। তারপর কাজের খাতা নিয়ে দেখলাম খানিকটা কাজ করেছে ছেলেরা। আমায় যেতে হবে, কাজ দেখে আসতে চোখে। কিন্তু গোপী বসে বসে গোমরাচ্ছে ; পেখাধার!

এমন সময় ত্বঃসংবাদ। মহারাষ্ট্র-দলের তুটো ছেলে জরে কাতর হয়ে পড়েছে। জঙ্গলের ধারের পাইনপাতা-বেছানো তাঁবুতে ওরা থাকতে পারবেনা। তৎক্ষণাৎ আড্ডাঘরের ওপরের একটা ছোটো কুঠরিতে ওদের চলে আসার ব্যবস্থা করতে হ'ল। আড্ডাঘরটা আসলে ডাকবাংলো দোতলা। ওপরটা টিনে ছাওয়া। নীচের তলায় চুল্লীতে সর্বদা কাঠ জলছে। ওপরটা তাই গরম। সেখানে সাহেবদের চাকর-বাকররা থাকে, কিন্তু মহারাষ্ট্র-দল জায়গাটা পেয়ে বর্তে গেলে।

ডাক্তার একটু ভয় দেখিয়ে গেল একটি ছেলেকে নিয়ে। ওর লিভার খারাপ। পূর্বে স্তাবা হয়েছিল। আবার দেখা দিয়েছে। দলটায় ছিল আমাদের ক্যাম্পের পোস্টমাস্টার-জেনরল—অর্থাৎ ক্যাম্পের তরফ থেকে ডাক তদারক করার ভার তার ওপর। কোঠারী—ডাক্তারির ষষ্ঠবার্ষিক ছাত্র। সে বেচারি ঘাবড়েছে বেশী। আক্রান্ত ছেলেটি তারই ছোটোভাই।

গোপী উসখুস করছে। আমার কাজ দেখতে বেরুতে হবে। তিন মাইল পথ যাতায়াত ; ছ'মাইল। অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক সময় চাই। বেলা পাঁচটা। গোপী যখন বুঝলো আজ আর পেখাধার যাওয়া হবেনা তখন ক্ষেপে গেল ; কিন্তু পরেই শান্ত হ'ল কারণ ছেলেটা স্বভাবতঃ শান্ত। যেটুকু বিক্ষোভ দেখায় তা দেখিয়ে ও আত্মপ্রসাদ পায়। ও বিক্ষোভের দাস নয়।

রাতের অন্ধকার গভীর হয়ে এসেছে।

নিত্যকার কাজকর্ম সেরে হ্যারিকেন-লণ্ঠনের আলোয় একটা লেখায় ব্যস্ত আছি।

বাইরে ঘাসের ওপরে কারা কথা বলছে।

গোপী আছে; বিক্রম আছে; আর এদেশী লোক একটা,—তুস্‌সীরামই হবে।

আলোচনাটা ধরেছে সাংঘাতিক, আমাদের মগজে যা ঘোলট বাধায়।

তুস্‌সীরাম বলছে—"হ্যাঁ বাবু, আমাদের এখান থেকে কিছু দূরেই এমন-এমন গাঁ আছে, তিব্বতী গাঁ, যেখানে একজন মেয়েমানুষের চার-পাঁচজন মরদ আছে। মেয়েদেরই তো দেশ এটা।"

গোপী বললো—"আমাদের কিন্তু একজন করে!"

লেখা রেখে দিয়ে ওদের গল্প শুনি। তবে ঐ আড়ালে থেকে।

তুস্‌সীরাম হেসে বলে—"না বাবু! একজন করে নয়। ঐ তো বাতোতের রাজার—"

বিক্রম হাসতে থাকে। "আরে, ওরা হ'ল রাজা।"

"তাই তো! তিব্বত দেশটাই যে মেয়ের দেশ। ওদের মেয়েদের ওসবে জাত যায়না।"

"যেমন আমাদের পুরুষের জাত যায়না।" গোপীর চপল কণ্ঠ।

"কিন্নরের দেশ বলেছে কেন তবে!" বলে বিক্রম।

গোপী বলে—"সত্যি কিন্নর! দেখতে-শুনতে খাটো হলে কি হবে, মজবুত কেমন! পাহাড়ে চড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে! আর গান গায়, বাঁশী বাজায়, নাচে—অদ্ভুত!"

"হ্যাঁ"—বলে তুস্‌সীরাম। "গান-নাচ এসব আর মদ, মেয়েদের যেন জান। ওদেরই জমি-জোত, সোনা-রূপো, ওদেরই আদায়-তহ্‌শীল। ওদেরই তো রাজত্ব।—ওরা একটা কেন, দশটা মরদ রাখলেও কে কী বলবে।"

"ছেলে তবে কার?"

"ওঃ! সে বড়ো শক্ত কথা। ওর নিয়ম আছে। একসঙ্গে অনেক আদমী নয়। যার যখন, তার তখন। সব বাচ্চার নাম মায়ের নাম। আর যদি বাপের হয়, তো সবার বড়ো যে শুধু তার নাম। তবে মায়ের নামেই ছেলের নাম।"

"এতে তোমাদের অসুবিধা হয়না?"

তুস্‌সীরামের হাসি কোমল-শান্ত হ'লেও বুঝতে পারি। "বাবু, তোমাদের বিবি হ'লে অসুবিধা হয়না? বিবিরা তো বেশী লড়াকু হয়। একজনকে সামলাতেই অস্থির।..."

"তাই তোরা দশজন মিলে একজনকে সামলাস!"

"তা যা বলো, বাবু।…ঝগড়াঝাঁটি এতে কম। আবার এক এক জন এক এক জনকে নিয়ে জিন্দগী কাবার করে দেয়, তা-ও আছে।"

বিক্রম কথাটি পাল্‌টায়। "আচ্ছা তোদের মধ্যে ছেলে কম না মেয়ে কম?"

"মেয়ে? ও তো কখনও-সখনও হয়। গাঁয়ে আমার দ্যাখোনা গিয়ে, গুনতে গেলে ক'টাই বা মেয়ে। আমার এক চাচা তো শেষ অবধি এই সিদনে গাঁয়েতেই নিহান ব'লে মেয়েটাকে বিয়ে করলো। কোথাও মেয়েই নেই।"

"কেন, নিহান মেয়ে নয়?"

হাসে তুস্‌সীরাম। "নিহান আবার মেয়ে! জোরে বলবোনা বাবু! কেউ শুনবে। নিহান শুনলে আর রক্ষা নেই। ও আবার আমার কাছে বিশ-কুড়ি মকাই পায়, দু'খানা হরিণ-ছাল, একটা কস্তুরী। যদি জানতে পায়, মেরে ফেলবে।"

"বল্ বল্, কেউ জানবেনা।"

"নিহানের মরদ সাতটা। দুটো মরে গেছে। একটা মরেছে খাটতে-খাটতে। এতো খাটায়, চাকরের বেহদ্দ। মস্ত ক্ষেত-খামার। লোক দরকার। ঐ বিয়ে করবে, খাটাবে। যাকে যখন সঙ্গে রাখবে তার খুব খাতির; নৈলে ঐ জীবন। চাকরের জীবন। খাটো, খাও, ব্যস্।"

"বয়স?"

"সে জানিনা। ওর বয়স কেউ গোনেনা।"

হাঃ হাঃ করে হাসিতে ফেটে পড়ে ওরা।

গোপী চেঁচায়—"আসুন না স্যার, বাইরে আসুন। শুনুন তুস্‌সীরামের মহাভারত!"

আমিও যোগ দিই এসে।

"মহাভারতই তো! শুনছিলাম কথা। সমাজ-ব্যবস্থায় কোথাও পুরুষকে বহুপত্নী রাখতে হয়, কোথায় পত্নীকে বহুপতি। মহাভারতে নজীর আছে।"

"এমন হয় কেন?"

তুস্‌সীরামও উদ্‌গ্রীব। ও-ও জিজ্ঞাসা করে—"এমন হয় কেন?"

"যাবৎ প্রকৃতির নিয়মে মেয়ে-ছেলে সমান সংখ্যায় না হবে তাবৎ এ-ধরনের সমাজ থাকবে।"

"কিন্তু সভ্যজগতে একস্বামিত্ব, একপত্নিত্ব—এর খুব নামডাক।"

"তা তো হবেই। যা-ই দুর্লভ, তা-ই মহার্ঘ।"

"শুধু তাই? এর মধ্যে মনের কোনো কথা নেই?"

"মানে, প্রেম?—তাই বলতে চাও?"

গোপী বোধহয় লাল হলো। বললো—"হ্যাঁ, যদি তাই বলি।"

"সমাজের ব্যবস্থা সাধারণের ব্যবস্থা। প্রেম অসাধারণ জিনিস। একে-একে দুই বেঁধে থাকলেই তা প্রেম নয়, গোপী। আমাদের সাধারণ জীবনের এই যে জুটী বেঁধে থাকা এর মধ্যে কতো যে ফাঁকি, কত যে ধাঁধা, আত্ম-প্রবঞ্চনা, মিথ্যা লুকিয়ে আছে, দাঁত খিঁচিয়ে আছে,—যদি জানতে।...যাক্, ওর সঙ্গে এসব আলোচনা থাক্। একটা কথা মেনে নাও, Polygamy-র মতো Polyandry-ও একটা fact—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং কিন্নরদের দেশের Polyandry বেদুইন আরবদেশের Polygamy-র মতোই নিতান্ত জীবনধারণের মতো সত্যধর্ম। ওর সঙ্গে প্রেমের কোনো বিরোধও নেই, কুণ্ঠাও নেই। প্রেম যখন হবার হয়ই। কাঁটাবনেও ফোটবার হ'লে ফুল ফোটেই।"

রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়েও ঐ কথাই হলো। আমি কেবল বোঝাবার চেষ্টা করলাম ভক্তি আর প্রেম একের মধ্যে ডুবে যাওয়া, আত্মদানে বিকিয়ে যাওয়ার জন্যই এতো সম্মানিত। কিন্তু পারে ক'জন এই একের মধ্যে ডুবে যাওয়া? আমার স্ত্রীর পাতিব্রত্য আমি secure করতে পারি নিয়ম ও শৃঙ্খলায়। কিন্তু প্রেম? কোন্ নিয়মে তাকে পাওয়া যায়?

*

খাবার ঘরে ঢুকে দেখি মহাবিক্রমে ডাক্তার তদারক করছে সবার খানা। জলে আজ আর কেরোসিনের গন্ধ নিয়ে কেউ আপত্তি জানালোনা। এ কয়দিনে সয়েও গেছে, আবার খানিক কমেও এসেছে। আমায় দেখেই ডাক্তার বললে—"শুভ সন্ধ্যা, মাস্টার। বক্তৃতা শেষ হলো?"

লাল হয়ে গেলাম লজ্জায়। "বক্তৃতাই দিই বুঝি?"

"আর নয়তো কি ? চা-ভুলিয়ে রেখে দেয় মাস্টারকে—সে এক নয় বক্তৃতা, নয় মৃত্যু।"

ঘর-ভরা নতুন প্রাণ। রহস্যরসে উচ্ছ্বলিত।

দুটি ছেলে একটা দরজার কোণে বসে খাচ্ছে। বাকী যথারীতি দাঁড়িয়ে।

ডাক্তার তাদের লক্ষ্য করে বললো—"ওঠো, দাঁড়িয়ে খাও ; নয়তো বাল্জীকে ব'লে দেবো।"

আমাদের খাদ্য-সরবরাহের কন্‌ট্রাক্‌ট্ দেওয়া হয়েছিল সিমলার একজন হোটেলওলাকে। তার দাদা এখানে এসেছেন তদারক করতে। বাল্জী কোম্পানির ব্যাপার, তাই তাঁকেও সবাই বাল্জী ব'লেই ডাকতাম। নিশ্চয় অন্য কোনও নাম ছিল। এখন মনে নেই।

"বাল্জীকে বললে কী এমন ?"

"কী এমন ? বটে ? আমাকে অনেক ঘুষ খাইয়ে তবে বাল্জী এই দাঁড়িয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়েছে।"

"কেন ? কী ঘুষ ?"

"Unconstitutional প্রশ্ন। কী ঘুষ কখনও জিজ্ঞাসা করবেনা। কেন তা বলছি। দাঁড়ালে stomach-টায় টান ধরে ; তাই ভরা যায় কম। বসলে stomach ছড়িয়ে পড়ে, তাই খোল্ বেড়ে যায়, ভরা যায়।"

আবার হাসি।

"আমরা কাল থেকে মেঝেয় বসে খাবো।" সমস্বরে চিৎকারে যোগ দিল সবাই।

"Unhygienic ! মেঝে বড়ো নোংরা। আমি অনুমোদন করবনা।" বললে ডাক্তার।

"আচ্ছা, ঘুষ দেবো আমরাও।"

ডাক্তার ডালের হাতাটা উঁচিয়ে বললো—"আচ্ছা, কাল সকালে ঘুষের নিলাম ডাকবো।"

রান্না হয়েছিল কড়ায়ের দাল, মুলোর ছেঁচকি আর আলু ফোড়ন দিয়ে আলু-বেগুনের রসাদার।

বাঙালী ছেলে ক'টি প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বললে—"কাল ভাত হবে, বাঙালীবাবু—"

আর আমার কানে কানে বললে—"সঙ্গে রামপক্ষীর ঝোল।"

আট তারিখ। রাত। কাজের অবস্থা ভালো। মনটা খুশী।

বিক্রমকে বললাম—"চলো ওপরে, গান শোনাবো। রবীন্দ্রনাথের গান।"

যাবার পথে মহারাষ্ট্র-দলের খবর নিয়ে গেলাম।

ওপরে উঠছি। সুন্দর কণ্ঠে উর্দু গান ভেসে এলো। দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের একটি ছাত্র গান গাইছে "দিল্ তুঝে দিয়া থা রাখ্‌নেকো" —Christina Rossetti-ও গেয়েছিলেন—

*You took my heart in your hand*
*With a friendly smile*
*With a critical eye you scanned*
*Then set it down.*

—সেই রসের গান। সকলেই ছেলেটিকে 'পল্' ব'লে ডাকে দেখলাম। তাঁবুর ধারে বসে পল্ গান গাইতে লাগলো, আর বুদ্ধু।

আমি আমার তাঁবুতে বসে গান শুনছি।

বিক্রম জিজ্ঞাসা করলো—"আপনার মনে হয় কাজ আমরা শেষ করতে পারবো ?"

আমি সোৎসাহে বললাম—"নিশ্চয়।"

আগের রাতে ঘুম ভালো হয়নি। সারাদিন পরিশ্রম গেছে। কখন চোখ ঢুলে এসেছে। কে যেন তাঁবুতে ঢুকলো। জেগে গেলাম। মুখের ওপর টর্চের আলো।

"ঘুমিয়ে পড়েছেন ? আমি তো শুনলাম অনেক রাত অবধি জেগে থাকেন।"

দুর্গাপ্রসাদ এসেছে। উৎকলের দুর্গাপ্রসাদ, কটক শহরে বাড়ী। সুগঠিত, সুশিক্ষিত জীবন্ত-যৌবনময় ছেলে। পাশের তাঁবুটায় ওরা তিনটি উৎকলবাসী ও একজন বাঙালী থাকে।

আমি বললাম—"এসো, বোসো ; খবর ভালো তো ?"

"হ্যাঁ। আমাদের গ্যাংটার ধারে-কাছেও আজ গেলেন না। কাজ আমি আপনাকে করতে দিতাম না। সে-কথা আমরা আগেই ঠিক করে ফেলেছিলাম। কিন্তু আপনাকে ছাড়বোনা।"

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—"না না, সেকি কথা! আমি ডাক্তারের সঙ্গে একটা গাঁয়ে চলে গিয়েছিলাম। নৈলে—কাজ আমি করবোই। সেইজন্যেই তো আসা। এত রাতে কি এই বলতেই এলে?"

"না স্যার, এ-কথা বলার জন্য নয়। মনটা ভালো লাগছেনা। ওরা তাস খেলছে। হল্লা হচ্ছে, ঘুমতে পাচ্ছিনা। জঙ্গলটা থেকে আজ সাঁ সাঁ শব্দ বেরুচ্ছে। কান পাতা যাচ্ছেনা।"

হেসে বললাম—"মনটাও হুহু করছে বুঝি?"

"তা করছে। মন আমার আছে জানতাম না। এখন এখানে এসে বুঝেছি। শরীর আর মস্তিষ্ক চর্চাই করেছি। কিন্তু হুহু করছে অন্য কারণে। আস্থানাকে নিয়ে এই কাজে নেমেছি আমরা। আমরা যুবকদলের হয়ে দেশের কাজে এসেছি। কেবল কি মাটি কেটে, পাথর সরিয়ে, জঙ্গল পুড়িয়ে যাব?"

"আর কী চাও?"

"কোনোও সংগঠন, কোনো প্ল্যান, কোনো প্রণালী।"

"আর একটু বুঝিয়ে বলো, দুর্গাপ্রসাদ।"

"দেখুন, উৎকল কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছি। আমার খরচ আমার জিলা কংগ্রেস কমিটি বহন করছে। কংগ্রেস-ভক্ত আমি। কিন্তু এ-দলে তো কংগ্রেসের কোনো নাম-গন্ধ থাকা উচিত নয়। এখানে আমরা মাত্র যুবক। তাই তো কথা ছিল।"

"বেশ তো। তাই হোক। এতে ঘাবড়াচ্ছো কেন?"

"ঘাবড়াবোনা? আস্থানা কথায় কথায় কংগ্রেস আর নেহেরু আর ইন্দিরার কথা ব'লে ব'লে ক্যাম্প্‌টার মধ্যে বিচ্ছেদ এনেছে বুঝছেন?"

আতঙ্কিত হয়ে বললাম—"এরই মধ্যে বিচ্ছেদ? বলো কি দুর্গাপ্রসাদ?"

"না, সে-বিচ্ছেদ বলছিনা। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র হলেও, তারা নানা দলের। কেউ সংঘের, কেউ জনতা-পার্টি, কেউ কম্যুনিস্ট পার্টি, কেউ সোশ্যালিস্ট, কেউ প্রজা—লক্ষ্য করে থাকবেন। আমার এটা ভালোই লেগেছিল। এখানে যদি এমন কোনও

ব্যবস্থা থাকতো আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তা বলতে পেতাম, হয়তো রাজনীতির চালবাজির মধ্যে দেশের প্রতি কর্তব্যকে আমরা ধ্রুবতারার মতো দেখতে পেতাম।"

"তোমার মতলব কী? যদি পারি তোমায় সাহায্য করবো।"

"আমি চাই সপ্তাহে অন্ততঃ একবার একটা ডিবেট-মতো হোক। তাতে সবাই বলবো। এতে অনেকটা মতামত জানাশোনার ব্যবস্থা হবে।"

"এ তো ভালো প্রস্তাব।"

"কিন্তু আস্থানা মানছে না।"

"কী বলে?"

"বলছে, এতে নাকি ঝগড়াঝাঁটি হয়ে দল ভেঙে যাবে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তা ছাড়া কংগ্রেস যখন ক্যাম্প্ অর্গানাইজ করেছে তখন কংগ্রেস বিরোধী মতবাদ প্রকাশের সুযোগ এ-ক্যাম্প্ করবেনা।"

আমি ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলাম; হেসে বললাম—"এ ক্যাম্পে কংগ্রেসের চরখাওয়ালা ঝণ্ডা উড়ছেনা, দুর্গাপ্রসাদ—জনগণমনের প্রতীক চক্রচিহ্নিত পতাকা উড়ছে। আজ যাও, কাল কথা বলবো।"

পরের দিন ভোরবেলা যখন ক্যাম্পে ঢুকছি তখনও গোপী আর বিক্রম শুয়ে। বিক্রম বললো—"হোলো কথা?"

আমি বললাম—"কী কথা?"

বিক্রম বললো—"আস্থানাকে বোঝানো হোলো?"

আমি বললাম—"আড়ি-পাতা বদভ্যাস, বিক্রম!"

বিক্রম ঝাড়াঝুড়ি দিয়ে উঠে বললো—"বাঃ, কানের কাছে বসে কাল দুপুর-রাতে কাজিয়া চালালেন, আর আড়ি পাতলাম আমি! এত ভোরে উঠে আপনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম আস্থানার কাছে চলেছেন। কী বললো ও?"

"কী আবার বলবে? রাজী হোলো, যদি আমি ভার নিই যে ঝগড়াঝাঁটি হবেনা।"

বিক্রম বললো—"আস্থানা একটা নীরব পাঁঠা।"

গোপী হেসে ফেলে বললো—"আর তুই সরব!"

তুস্‌সীরাম চা নিয়ে এসে গেছে।

আজ তুস্‌সীরাম খুব খুশী, তিনজনকেই জাগা পেয়েছে।

"কাল রাতে একটা গোলমাল টের পেয়েছিলেন, স্যার?" জিজ্ঞাসা করলে গোপী।

"গোলমাল? কোথা থেকে?"

"এই তাঁবুতে। প্রথম ভাবলাম কেউ ঢুকেছে। তারপর কেবল খড়্‌বড়্‌ খড়্‌বড়্‌। নিশ্চিত কোনও জানোয়ার ভেবে টর্চ জ্বালতেই কি-একটা ছুটে চলে গেল। ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর বিক্রমকে তুললাম। বিক্রম তো ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলে। আবার শুলাম। মশায়, তাকিয়ার মাথার কাছে স্পষ্ট শব্দ! আবার টর্চ জ্বাললাম। আবার পালালো।"

তুস্‌সীরাম বললে—"পাহাড়ী সাপ, হুজুর। এ-তাঁবু ছাড়ুন।"

সর্বনাশ! বললাম—"সাপ হ'লে চার-পায়ে তড়্‌বড়্‌ করে ছুটবে? ভালুকের বাচ্চা বোধহয়।"

তুস্‌সীরাম টুপীটা খুলে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—"ভূত তবে।"

একটা রুমালে বাঁধা ছোলা ছিল; ছোলাগুলি ছড়ানো। রুমালটায় বিরাট ফুটো। আমি বললাম—"তুস্‌সীরাম, তোমার ভূত ছোলা খুব ভালবাসে দেখতে পাচ্ছি।"

আজ সকালটা চকচকে পরিষ্কার। রোদ এসে পড়েছে পিঠে। শাবল চালাচ্ছি। একধারটা কেটে যাচ্ছে, কিন্তু কোণটার বিরাট জগদ্দল চাঁইটা যেন বজ্র। নড়তে চায়না। অভ্র-মেশানো জমাট পাথর। শাবলের ঘা সয়ে নেয়। গর্ত করতে দেয়না। আজ থেকে একটা করে সরকারী কুলী এক-একটা গ্যাঙে আছে। তারা শেখাচ্ছে কী করতে হবে। আমাদের সঙ্গের লোকটার নাম হিঙ্গু। সে উপদেশ দিলে চারপাশ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে তারপর তলা দিয়ে জমি কেটে চাপ দিলে এ-চাঙড় সরবে। সারাদিন গেল সেই পরিখা কাটতে। তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন।

কাজ সেরে ক্যাম্পে ফিরছি। এ দল, ও দল সব সঙ্গ নিচ্ছে। ম্যাথাম্যাটিক্সের সেই রামমূর্তি দু'খানা হাত দেখালে। বেচারীর হাতে কুড়ুল। তিনটে গাছ সে পেড়ে ফেলেছে। কিন্তু কি-একটা গাছের রস হাতে লেগে দুটো হাতের

চেটো, পিট, কব্‌জি পর্যন্ত ছোটো-বড় ফোস্কায় ভরে গেছে। দেখতেও বীভৎস লাগে।

রামমূর্তিকে নিয়ে সোজা ডিস্পেন্সারিতে গেলাম। ডাক্তার রামমূর্তিকে দেখেই বললো—"ঠিক হ্যায়, এবার হাত-দু'খানা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবো। কুড়ুল ঠিক চালাতে পারবে। চালিয়ে যাও। ফোস্কা সব উড়ে যাবে। থামালেই বিপদ হবে। ওসব হয়। চালাও।"

রামমূর্তি বড় খুশী। "তাই চাই, ডাক্তার। এখানে এসে বসে থাকতে চাইনা।"

বারান্দায় দুটি ছেলে বসে।

"ওকি, কাজে যাওনি তোমরা?"

"শরীর অসুস্থ।"

"তোমার রুগীর সংখ্যা কতো হোলো, ডাক্তার?"

"মারাঠা-ক্যাম্পের আটজন, এরা দুজন, আরও দুজন আছে।"

"ডাক্তার, ছোটোখাটো রোগে তুমি যদি এখানেও সার্টিফিকেট দাও, আমাদের কাজ এগুবেনা বুঝতে পারছো?"

হাসতে হাসতে ডাক্তার বললো—"এইসব দুধের বাচ্চারা ভুলে যায় যে, আমি ফৌজের ডাক্তার। আমি বলেছি আজ খানা বন্ধ। সাবুদানা বা বার্লি বা ভাতের মাড় ব্যবস্থা।"

তাতেই ওদের মুখ কাচুমাচু।

ডাক্তার বলে চললো—"সকালের চা-পরেঠা বন্ধ ছিল কিনা!"

"বেচারী!" আমি বললাম—"আর এরকম কোরোনা, ভাই। কতবড় মুখ করে এসেছি। কত আশা কত গর্ব। এখন কাজ করতে নেমে পিছ-পা হবো? তোবা।"

ওরা তারপর থেকে আর কামাই করেনি অবশ্য, কিন্তু ডাক্তার না থাকলে রোজই কামাইয়ের সংখ্যা বেড়ে যেতো।

ওরা চলে গেল। রামমূর্তিও চলে গেল। ডাক্তারের ঘর থেকে মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাক্তার বললে—"আজ ভাত আছে, বাঙালীবাবু!"

আমার মন ভালো নেই। আমি বললাম—"আর ভাত! কিছুই ভালো লাগেনা!"

"কেন মাস্টার ?—

*'Why so pale and wan fond lover ?*
*Prithee why so pale ?*
*Will, when looking well can't move her*
*Looking ill prevail ?'*

—কে যেন, Shelley না Wordsworth ?"

ডাক্তার ঠাট্টা ক'রে সব সময়ে কবিতা ব'লেই বলতো—Shelley না Wordsworth,—জানতো সব ঠিক। সারা জীবনে ডাক্তার কেবল পড়াশুনাই করেছে। আমি কয়েকদিনেই এ বিষয়ে ওকে ধরে ফেলেছিলাম।

আমি পাল্‌টা ছাড়লাম—

*"Come oh thou traveller unknown*
*Whom still I hold but cannot see."*

ডাক্তার বললে—"ব্যাপার কি ? কে এই পথিক—যে তোমায় ধরে রেখেছে দেখতে দিচ্ছেনা। বলো হে বলো !" চোখে অপরূপ কৌতুকের হাসি।

বলি-কি-বলিনা, ইতস্ততঃ করছি। বললাম—"ডাক্তার, কাছাকাছি স্ত্রীলোক কোথায় আছে ?"

দাঁড়িয়ে উঠে বললো—"বলো, তাই বলো ! যা শীত ! বটেই তো ! তা বেশ, খাও-দাও—আজ নয় সন্ধ্যার পর ব্যবস্থা করা যাবে।"

আমি তো লজ্জায় লাল।

ডাক্তারের চোখে অজস্র হাসি। মাঝে ডাক্তারের বয়-চাকরটা দু'কাপ কফি রেখে গেল। মাথায় গোল টুপীর ওপর কম্ফর্টার বাঁধা, গলায় কী জড়ানো। ঢলঢলে পোশাক নোংরামিতে ভরা। চোখ-দুটো চপল, ঠোঁট লাল। পা পর্যন্ত ঢাকা পা-জামা।

আমি বললাম—"ত্তাখো, বাঁদরামি কোরোনা। তুমি বেশ জানো আমি মেয়েমানুষ চাইনি।"

"কিন্তু তুমি বললে স্ত্রীলোক ! স্ত্রীলোককেই তো মেয়েমানুষ ব'লে বলে জানি। স্ত্রীলোক আবার কিজন্য চায় সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক ?"

"ডাক্তার, যদি তুমি সামলে কথা না বলো, আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো।" ডাক্তার ততক্ষণে আমার হাত ধরেছে। "এই ক্যাম্পের আশেপাশে কখনও কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক তো দেখিনি। অথচ…"

"অথচ কী ?" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো।

"অথচ আমি দেখেছি।"

"দেখেছো। তা কী? প্রেমে পড়েছো?"

"না, তাও নয়।"

"ওঃ, বলবেনা তুমি। বেশ। ওদিকে খাবারের তাড়া পড়েছে। বারোটা বেজেছে। আমার আন্তরিক সমবেদনা জেনো। আপাতত খাবার ঘরে চললাম।"

ডাক্তার বেরিয়ে গেল। আমার কথাটা পাড়া হলোনা। কেমন যেন ও আমায় চটিয়ে দিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ডাক্তারের গোশলখানায় ঢুকলাম। বয়টা গরম জল দিল এক-বালতি। জানতোনা গরম জলে নাইনা। কিন্তু সেদিন নাইলাম। স্নান সেরে খাবার ঘরে গেলাম। ডাক্তার আগেই ব'লে দিল—"মাস্টার-সাবের ভাত আমার ঘরে দিয়ে এসো।"

মুরগী নয়; শিকার-করা পাখী, একটা পাহাড়ী ডাক্তারকে দিয়ে গেছে। সেই ঝোল আর ভাত খাচ্ছি। ডাক্তার বললে—"বেশ লাগছে নয়? অনেক-দিন পরে ভাত।"

আমার আগেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু অন্যমনস্ক তাই বলিনি। বললাম —"হ্যাঁ, বেশ লাগছে।"

"অন্ধকার রাতে অজানা মেয়ের হাতের ছোঁয়ার মতো, নয়?"

চম্‌কে ওর মুখের পানে চাইলাম।

ওর চোখে ঝক্‌ঝকে হাসি।

"তাহলে তুমি জানো!"

ডাক্তার বললে—"কি?"

আমি স্থির চেয়ে রইলাম।

"নাঃ, বিলকুল প্রেমে পড়েছো। নৈলে এমন পাগল হয়ে গেলে খামোকা। কী জানি?"

"এই যা বললে?"

"আমি তো একটা কাব্যিক উপমা দিলাম মাত্র।"

"মিথ্যেকথা। কিন্তু কে সে?"

"কে? হাসালে!" এবার ডাক্তার বিপুল শব্দে হেসে ফেললো।

"কিন্তু আমি তো কোনদিন দেখিনি!"

ভেতরে কে হাসলো।

ডাক্তার হাঁক দিয়ে তার বয়-চাকরকে বললে—"এই—মাস্টার-সাবকে ভাত আর ঝোল দিয়ে যা।"

আমি আপত্তি করতেই বললে—"আরে, না—না—প্রেমে পড়েছেন ব'লে খাওয়া কম করে দেবেন, সেকি হয়?"

সেই বয়টা এবার এসে আবার পরিবেশন করতে লাগলো। বেশ বুঝলাম, যাবার সময় সেই মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমি বললাম ইংরাজীতে—"চাকরটি তো তোমার দিব্যি ফাজিল! আমাদের কথার রস উপভোগ করছে!"

ডাক্তার চেঁচিয়ে বললো—"বদতমীজ্ বেয়াদব।—ঘাবড়োনা মাস্টার, কাল আর ওকে দেখতে পাবেনা।"

সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম—"আরে, না—না—ছি ছি। লঘুপাপে গুরুদণ্ড। আমরাও তো রেখে ঢেকে কথা বলছিনা।"

ডাক্তার বললে—"হলেই বা। তা ব'লে—"

"যাক্‌গে। আচ্ছা, বলো ডাক্তার, তুমি জানলে কি করে যে আমি অন্ধকারে হারিয়ে গেছিলাম।"

"আর মিনিটে মিনিটে পড়াটা বুঝি ফাউ?"

"তবে তুমি এলেনা কেন?"

"আরও ভালো হাত আমি বাগীর বাজার থেকে আনিয়েছিলাম। পাহাড়ী-জাত—এসব ঝড়বৃষ্টি ওদের কিছু নয়। কুপথ থেকে সুপথে আনতেও ওরা কম দক্ষ নয়, মাস্টার; এবার যে-কেতাব লিখবে তাতে লিখো।"

"আর তোমার পথ?"

ডাক্তার বললে—

> *"He that is down need fear no fall,*
> *He that is low, no pride;"*

মুগ্ধ হয়ে বললাম—"আরো বলো ডাক্তার!"

বললে—"সব মনে রাখতে নেই। বাকীটুকু যা মনে রাখার মতো শোনো—

*'Fullness to such a burden is*
*That go on pilgrimage*
*Here little, and hereafter bliss,*
*Is best from age to age.' "*

তারপরই বললে—"সব লিখে রাখো রোজ ?"

বললাম—"হ্যাঁ, নোট রাখি। কিন্তু কতো পড়েছো তুমি ডাক্তার !"

বললে—"কিসে ? প্রেমে ? একবারও নয়। পড়লে নাকি ওঠা যায়না। তাই বরাবর পিঠে বেল্ট বেঁধে সাঁতার কাটলাম।"

বিকেলে ডাক্তার চায়ে ডাকলো। কিন্তু সেই ছোকরা বয়টা নেই দেখে শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"সেই বয়টা কোথায় গেল, ডাক্তার ?"

গম্ভীর হয়ে ডাক্তার বললে—"বরখাস্ত্ বেয়াদবীর জন্য। বাগীর মাল বাগী ফিরে গেছে।"

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"মানে ?"

ডাক্তার চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললো—"তিনদিন ছিল ছেলের পোশাকে। তোমাকে যখন অতো কাছাকাছি ধোঁকা দিতে পেরেছে, দুপুরের আলোয়, নিশ্চয় আর কেউ সন্দেহ করেনি। কি বলো ?"

আমি প্রায় ভেঙে পড়ে বললাম—"বলো কি ডাক্তার ! ঐ ছেলেটাই আমার রাতের সেই— ?"

ডাক্তার বললে—"আজ নাকি পথে গিয়ে আবার হারিয়েছিলে। কোথায় ?"

বুঝলাম এখন ডাক্তার ও-কথা আর বলবেনা।

আমি দম নিয়ে বললাম—"আজ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছি। আর যে বাঁচিয়েছে তার ঋণ জীবনে শোধ করার নয়।"

"কোথায় গিয়েছিলে ?"

"আর বোলোনা ! আজ তোমার কাছ থেকে যখন চলে গেলাম, মনটা বেশ হালকা। আমি আর বিক্রম পরামর্শ করলাম ওপরের জঙ্গলটায় যাবো।"

"একদিন তো গিয়েছিলে।"

"তাই তো। এতো সুন্দর জঙ্গল যে মায়া পড়ে যায়। দুপুরে ছিল চড়া

রোদ। পাইনের মাথাগুলো দুলছিল। ভাবলাম যাই। বিক্রম সাহস করলো। একটা ক্যামেরা, একটা লাঠি আর একটা ছোরা নিয়ে চললাম। একদিন ওঠা ছিল। উঠতে বেগ পেলাম না। বেশ উঠে গেলাম। জঙ্গলটার ভেতরে চলতে লাগলাম। দুর্ভেদ্য অরণ্য। রোদ এসে তলাটায় যেন কাব্য করে রেখেছে। যুগ-যুগ-সঞ্চিত ঝরাপাতার দল ওখানেই শেষশয্যা পেতেছে। চলি আর পায়ের তলা থেকে মাথা অবধি কেঁপে যায়। আলোছায়ার অমন সুন্দর শান্তশ্রী জীবনে দেখিনি। দু'চোখ ভরে দেখছি। দেখতে দেখতে নেশায় পেয়ে গেল যেন। চলতেই লাগলাম। এক এক জায়গায় ঘন অরণ্য—হঠাৎ গুমোট অন্ধকার; আবার রূপের তরঙ্গের মতো সোজা streamline বন্যা এসে খানিকটা জায়গা আলোয় রোদে ভরে দিয়েছে। আর পতঙ্গই বা কতো রকমের! কতো ফড়িং, কতো প্রজাপতি, কতো ফুল। বড়ো বড়ো গিরিগিটি হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পাখীগুলো এ-ডাল ও-ডাল উড়ে পালায়, কিন্তু বেশীদূর যায়না। পুরোনো সব আদ্যিকালের গাছ—তাদের গায়ে সব শ্যাওলাও বা যতো, অন্যান্য লতাপাতাও তত। এক একটা গাছের বাকল চিরে বেরিয়েছে পাতলা ঝাউয়ের মতো পাতা, তার গায়ে ফোটা নীলবর্ণের ছোট্ট ফুল, মাঝটায় খয়েরী; আর একটা দেখলাম ব্রাহ্মীশাকের পাতার চেয়ে বড়ো, মোটা মোটা রসে ভরা পাতা—তার গায়ে গাঢ় গোলাপী কাঞ্চনফুলের মতো বড়ো তিন-চার থাক সাজানো পাতাধরা ফুল। সবচেয়ে ভালো এই ফুলটি তোমার জন্যে এনেছি, ডাক্তার। উঃ, কী উঁচু ডালে হয়েছিল এটা! সূর্যের আলোয় সারা গা খুলে দিয়ে নির্জনে স্নান করছিল—যেন চাঁদের আলোয় আফ্রোদিতের স্নান আরল-হ্রদের তীরে। জুতো খুলে গাছে চড়লাম। দ্যাখো কেমন সাদা, এমন সাদা দেখেছো কখনও? একটা পাতার দিকে চাও, প্রতিটি রেখায় যেন জমাট ক্রীম জাল পেতে আছে; অথচ সারা ফুলটায় সেই ক্রীম হারিয়ে গেছে তপনস্নানের পরের কলুষহীন শুভ্রতায়—যেন সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের মতো নীরব-বন্দনায় স্তব্ধ, শুচিস্নাত শুভ্রতায় আপ্লুত। আর মাঝটায় দেখছো, ডাক্তার—কেমন একটা ছোটো ডাঁটা, আর তার গায়ের পরাগ দেখছো? প্রথম গর্ভিণীর প্রাচুর্যে স্ফীত, অহঙ্কারে শিহরিত, সম্ভাবিত প্রাণের সাড়ায় উন্মীলিত। কেমন, গোল বড়ো সবুজ পাতা দুটি ঢেকে আছে একে দু'পাশ থেকে। এই ফুলটি নিয়ে আসতে আমায় প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়েছে।"

"কিন্তু হায় দিতে হলো ডাক্তারকে। মানাতো একটা আল্‌তো খোঁপায়, না?"

হেসে বললাম—"কৈ খোঁপা? সে তো ফুরিয়ে গেছে দশবছর আগে। এখন আছে খোঁপার সজ্জা। তবে ফুলটা এখন যাকে দিলাম, তাকে দিয়েছি শুনলে খোঁপার মালিক খুশীই হবেন।"

ডাক্তার গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথায় হাত ঠেকালো। "বোলো তাঁকে আমার কথা।···আর বলবেই বা কী, লিখছোই তো!"

"ফুলটা অনেকটা সময় নিলো। আর একটা অমন ফুল দেখিনি। আচ্ছা ডাক্তার, গাছের গায়ে যে গাছ হয়, তার ফুলগুলো এতো সুন্দর এতো বর্ণাঢ্য হয় কেন?"

"অর্কিড ওরা,—শ্যামল সমাজের বারবনিতা। বৌ রাখার খরচের চেয়ে রক্ষিতার খরচ বেশী; বনিতার গালের রং না থাকলেও চলে, বারবনিতার চলেনা। শৃঙ্গার নৈলে ওরা থাকতে পারেনা। সৈরিন্ধ্রী ওদের দরকার। দুটোই যে পরভৃতিকা—পরের গায়ের রস চুষে বাঁচে।···কাজেই।"

"তোমায় কাব্য পেলে আর রক্ষা নেই। আমার কাহিনী আর হবেনা।'

"আরও আছে নাকি?"

"নেই? ফুল নিয়ে নেশা ধরেছে। ক্রমাগত ওপর-দিকে চেয়ে চলছি, কোথায় আবার কী ফুল দেখি। হঠাৎ সামনে দেখি প্রায় হাজার ফুট জায়গা জুড়ে একটা রাক্ষুসে আট-কোণা ক্যাক্‌টাসের ঝাড়। তার মাঝ থেকে বিরাট মোটা মোটা ডাঁটি বেরিয়েছে। ডাঁটির চারধারে বড়ো বড়ো লাল ফুল, টক্‌টকে লাল, জবার চেয়েও গাঢ়। কিন্তু ক্যাক্‌টাসের ঝাড়ে হাত দিতে সাহস হোলোনা। আমি বিক্রমকে বললাম, ফেরা যাক্। খুব জোর একটা শব্দ হচ্ছে, খুব নিঃশব্দে মরণ এগিয়ে এলে বুকটা যেমন করে বলে বোধ হয়। কেন যে ভয় হোলো জানিনা। কিন্তু ভয় হোলো। হঠাৎ বিক্রম আমায় জোরে একটা টান দিয়েই ছুটতে লাগলো। পাহাড়টার যে গা বেয়ে উঠেছি, তারপর তার মাথায় চড়ে অন্য গা দিয়ে নেমে গেছি অনেকটা। এখন দৌড়াবার সময় তাই ওপরদিকে চড়তে হোলো। খানিকটা উঠে পিছনপানে চাইলাম। নৈনিতালে থাকতে হল্‌দওয়ানীর জঙ্গলে বিরাট বিরাট পাইথন দেখেওছি, শিকারও করেছি। অত বিরাট না হলেও, একটা বড়ো পাইথন ক্যাক্‌টাসের

ঝাড়ের মধ্যে ঢুকছিল। তার লেজটা দেখতে পেলাম। বিক্রম বললো একমিনিট সময়। তারপরেই বিক্রম প্রায় ভেঙে পড়ে বসে পড়লো, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। আমি হাঁপাচ্ছি।

"কিন্তু তখন হোলো বিপদ। প্রমথটায় ফুলের খোঁজে, তারপর সাপের ভয়ে ছুটে কোনও দিক্‌জ্ঞান ছিলনা। দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মাঝে দিশা পাইনা। আমি তৎক্ষণাৎ বিপদ বুঝলেও, বিক্রম বোঝোনি। আমি বিক্রমকে বললাম—'বসলে তো চলবেনা; ফিরতে হবে।' তা ছাড়া এমন বসা নিরাপদ নয়। তারপর ঘুরি আর ঘুরি। আধঘণ্টার মধ্যে বুঝতে পারলো বিক্রম—ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় আসছি আমরা। গাছের গায়ে কুড়ুল দিয়ে দাগ কেটে সূর্যের গতি দেখে এগুতে লাগলাম। আরও একঘণ্টা গেল। পথ নেই। এমনি করে বিকেল হবে, সন্ধ্যা হবে, রাত্রি হবে। বিক্রম মরিয়া হয়ে বললো—'একটা পাহাড়ই তো—এর শেষ মিলবে না?' চললাম। বিশ মিনিটের মধ্যে একটা নিরেট দেওয়ালের সামনে এসে পড়লাম। পাইন জঙ্গল। মাটি থেকে একফুটের মাথাতেই শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গাছে গাছে এমন নিবিড় ঠাসাঠাসি যে, একটা শেয়ালও বোধহয় পেরুতে পারেনা। তখন একটা শুকনো কাঠ নিয়ে জ্বালালাম। ইচ্ছা—ধোঁয়ার সৃষ্টি করি। যদি কেউ ত্যাখে। কিন্তু মন ভাঙেনি। ভয় করছিল বটে—তবু এ জঙ্গলের শোভা দেখছিলাম দু'চোখ ভরে। হঠাৎ মনে হোলো এ জঙ্গলে প্রথম মানুষ আমরা দুজন। এ বনদেবীর দেহাঙ্গ অবলোকনের প্রথম চরিতার্থতা আমার। কবে কোন্ ভূ-বিপ্লবে সমুদ্রবক্ষ থেকে ঠেলে উঠেছিল এই সুবিশাল হিমালয়। সেই হোলো ধরণীর পীনপয়োধর। তাতে লেগে ছিল সমুদ্র-সংঘর্ষের ক্ষতচিহ্ন, লেগে ছিল সাগরবক্ষের পঙ্কিল চিত্রলেখা। সেই পঙ্কলেখার গায়ে গায়ে শৈবালের পাপড়ি ছিল, প্রবালের চূর্ণ ছিল, ছিল সমুদ্র-বুকের শ্যামলরাজ্যের লরেন্সি, ক্লাডোস্টিফাই, রোডোমিনি আর হাইড্রোফাই-টিসের রাশি রাশি বীজ। সেই বীজ তো সূর্যের ছোঁয়া পেয়েছে—লক্ষ লক্ষ বৎসর তপস্যা করেছে দেব-সবিতার, সূর্যযজ্ঞে সমৃদ্ধ করেছে বালুময় স্তূপ; লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে পাতা আর শিশিরের প্রলেপ দিয়ে রাশি রাশি বালুর স্তূপে দান করেছে ক্ষমতা, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা। আজ যা পাহাড় তা তো বালি ছিল; আজ যা কেলু, পাইন—তা তো ছিল পামাটী আর ফাঙ্গাসের বীজাণু। প্রবাল-দ্বীপের তপস্যা জলের তলায় চলে কোটি বৎসর, হিমাচলের তপস্যা মাটির ওপরে

চলেছে বহুকোটি বৎসর। মানস-সরোবরের নীল জলে তাই সমুদ্রের নীল দেখি ; গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র বহু পথ অতিক্রম করে আবার ফিরে পায় সেই সাগরকে। আমার মনে ভয় নেই ; আমার ফিরে যাবার শঙ্কা, ব্যাকুলতা কিছু নেই ; শুধু ভাবছি এই বিরাট শ্যামলিম রাজ্য, এই নিস্তব্ধ-চঞ্চল, সৃষ্টি-সংহার-মুখর বৃক্ষজগৎ—একদিন প্রভাতে এর সূচনা হয়েছিল সমুদ্রবক্ষ হ'তে। সমুদ্রমন্থনে বের হলেন লক্ষ্মী, বের হলেন ধন্বন্তরী ; বের হোলো অমৃত, হলাহল। সবই তো এই ওষধি-জগতের নানাকৃত রূপ। সমুদ্রমন্থন, উর্বশী—সে কি সত্য সে কি কবিতা ? সে কি সত্য-কবিতা ?"

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললে—"সামান্যকে অসামান্য করে বলার দক্ষতাই কাব্য—নয় মাস্টার ? বলতেও পারো। অথচ মদ খাওনা আশ্চর্য। মদের মাতাল তো তবু হুঁসে থাকে ; তোমরা যে নেশায় মত্ত তার হুঁস নেই।"

একটু বেশী বিচলিত হয়েই পড়েছিলাম। লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

লক্ষ্য করে ডাক্তার বললো—"লজ্জা পেয়োনা মাস্টার, ব'লে যাও। জঙ্গলে-পাহাড়ে তো কাটালাম অনেকদিন। এমনটা যে আছে দেখিনি কখনও। যা চোখে পড়ে সবই কি দেখা যায় ? ছ্যাখে মন ; চোখ একটা দরজা মাত্র। আচ্ছা, তুমি এইসব বট্যানিকাল নাম জানলে কোত্থেকে ?—"

আমি বললাম—"আকাশ থেকে। সে কথা নয়। বিক্রম হঠাৎ হাত ধরে ঈষৎ টানলো। দূরে, অনেক দূরে একটা সাদা ঝক্‌ঝকে তুষার-স্রোত। শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। চোখ-ঝলসানো দ্যুতি। অন্ধকার মহারণ্যের ওপারে রজতঢালা আলো। যেন অজ্ঞান-তিমিরান্ধ-পারে প্রজ্ঞাদীপ্তি, সংসার-অরণ্য-পারে আশার চমক। মন ভরে গেল শুধু আনন্দে। মনন নয়, চিন্তন নয় ; শুধু স্ফটিকসঙ্কাশ আনন্দ। বসলাম একটু। বিক্রম টানা সত্ত্বেও বসলাম। হয়তো এমনটি চোখে পড়বেনা কখনও। খুব জোর চেঁচামেচি লাগালো মাথার ওপর পাখীরা। একটা বনবিড়াল গুঁড়ি মেরে চলেছে একটা পাখীর বাসার পানে ; পাখীগুলি আর্তনাদ করছে। একটা ঢিল কুড়িয়ে মারবো এমন ঢিল নেই। একটা কাঠের টুকরো তুলে ছুঁড়লাম। বেড়ালটা পালালো ;—পরক্ষণেই ভাবলাম 'কতক্ষণ' ? এগুচ্ছি। হাতে জ্বলন্ত কাঠ। হঠাৎ কানে ভেসে এলো শব্দ 'খুট্' 'খুট্'—খানিকটা থেমে থেমে, কিন্তু যখন হচ্ছে, একসঙ্গে চার-পাঁচটা। একদিন এই শব্দ এই অরণ্যে তুস্‌সীরামের আবির্ভাব এনেছিল। আজও হয়তো

তুস্‌সীরাম! কান খাড়া করে রইলাম, কিন্তু বড় দূরে, এবং দিকটা একেবারেই ঠাওর হচ্ছিলনা। আমি তাড়াতাড়ি আমার হাতের কুড়ুলটা নিলাম। যেই ওদিকের শব্দটা থামে তৎক্ষণাৎ একটা গাছের গায়ে জোরে কুড়ুল চালিয়ে আমিও শব্দ করি। অনেকক্ষণ চললো এইভাবে। কোনও ফল হোলোনা। কেবল আগে শব্দটা যতক্ষণ থামছিল, এখন তার চেয়ে বেশীক্ষণ থামছে। তখন আমি কুড়ুলের শব্দ করার পরে পরে জোর চেঁচাচ্ছি 'তুস্‌সীরাম'—কেন যে তুস্‌সীরাম ব'লে চেঁচালাম জানিনা—উদ্দেশ্য কোনও একটা শব্দ করবো। মনে তুস্‌সীরামের নামটা ছিল তাই চেঁচালাম। তখন আর শব্দটা শুনছিনা। আমিও শব্দ থামালাম। এটা ভুল করলাম। খানিকটা পর আবার শব্দ। আমিও শব্দ করতে লাগলাম। বিক্রম বললো—'আমরা শব্দ থামালে ও দিক্ পাবে কেন খুঁজে'—কেমন যেন ধারণা হোলো কেউ। সঙ্গে সঙ্গে পাতা জড়ো করে আগুন ধরালাম, আর শব্দ করতে ল্যাগলাম।

"এবং অরণ্যের ঘনপত্র ভেদ করে দেখা গেল শ্রীমান্ তুস্‌সীরামের দন্ত-বিকশিত মুখ, সাথে ছোট্ট তিরস্কার—'আবার এই জঙ্গলে আপনারা? ভালুকের পেটে যাবার ইচ্ছে বুঝি?'

"আনন্দের আতিশয্যে তুস্‌সীরামকে তো জড়িয়ে ধরলাম। ওর টুপী আমার মাথায়, আমার টুপী ওর মাথায় দিয়ে একটা শট্ নিলাম। আর ওর সঙ্গে বসে বসে কতো গল্প করলাম।

"এতক্ষণে নেমে আসছি। ভয়-ডর বাদ দিয়ে যে আনন্দ আজ পেয়েছি তার বোধহয় তুলনা নেই, ডাক্তার, এক এই কফির কাপ ছাড়া।"

কফি আসতে দেখে নাটকীয়ভাবে কথা থামালাম।

ডাক্তারও কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললো—এ সম্বন্ধে কবির কোনো লাইন নেই? তোমাদের কবির তো অনন্ত ভাণ্ডার!"

একটু থেমে বললাম—

" 'হঠাৎ শিরে লাগলো আঘাত বনের শাখাজালে,
হঠাৎ হাতে নিবলো আমার বাতি।
চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্ কালে
চেয়ে দেখি তিমিরঘন রাতি।

কেঁদে বলি মাথা করে নীচু
"শক্তি আমার রইলো না তো কিছু"
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন পিছু পিছু
এসেছে মোর চিরপথের সাথী।'

আচ্ছা ডাক্তার, বাংলা তুমি বোঝো?"

ডাক্তার বললে—"সবটা নয়; তবে কাব্যের বাংলা বুঝি। বাংলা আমার ভালো লাগতো বরাবর; সেই মালায়া থেকে। বন্ধুও পেয়েছি। কিন্তু তুমি কি সারা রবীন্দ্র-কাব্য কণ্ঠস্থ করেছ?"

"আকাশের গ্রহগুলো সব চিনলেও, ডাক্তার, সারা আকাশকে চেনা যায়না। জ্যোতির্বিদের অনুসন্ধান-বৃত্তির শেষ কই? রবীন্দ্রজগৎ—সৌরজগৎ, ডাক্তার!"

"ব্যস্, রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলো তো বাঙালীর পরনের কাপড় খুলে নাও, সে কিছু টের পাবেনা। ভয় লাগে তাই ও-কথা তুলতে।"

হাসলাম।

ও বললো—"রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়ো বাঙালী কে আছে, মাস্টার?"

গম্ভীর হয়ে বললাম—"আমি!"

ডাক্তার বললে—"না—না—সত্যি তোমার মত কী?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমার মত কী?"

ডাক্তার বললো—"চেনেনা বাঙালী তাকে। রবীন্দ্রপ্রভা একটু ম্লান হোক, তখন চিনবে।"

"কে সে?"

"রাজা রামমোহন রায়।"

ঘরে ঢুকলো বিক্রম আর গোপী।

গোপী বললো—"ঠিক জানি আপনি এইখানে। আপনার কি কঠিন কোনও গোপন ব্যাধি আছে জনাব? ডাক্তারের কাছে তো রোগীই আসে জানি।"

ডাক্তার বললো—"ডাক্তারির পসারই হোলো ভোগীদের চিকিৎসায়।"

গোপী বললো—"চলুন চলুন—"

"কোথায়? পেশাধার?"

বিক্রম হেসে ফেললো।

গোপী বললো—"আর পেখাধারের নামও যদি মুখে আনি! আমি কি জানি খোদাতালা এখানেও এক গার্জেন জুটিয়ে দেবেন?"

বাইরে জ্যোৎস্না। আজ পূর্ণিমা—প্লাবন-করা আলো। আগেভাগে খাওয়া সেরে দলে দলে ছেলে আজ ছুট্ মেরেছে। এমন দিন আর তারা পাবেনা। আমাদের খাবার বাংলোর তলায় পথের ধারে কে একটা লোক তাঁবু ফেলেছে। উনুন জ্বেলেছে—কড়া চাপিয়ে পকোড়া ভাজছে। জিলিপি করে রেখেছে। লোকটা এ কয়দিনে খুব কামিয়ে নেবে। তার তাঁবুর তলায় একগাদা ছেলে জড়ো হয়েছে। আমাদের দলের একটা ছেলে মাউথ-অর্গান বাজায় চমৎকার। তার বাঁশীর সুর ভেসে আসছে। বোঝা যাচ্ছে বাজেশালের পথ ধরে সে অনেক নীচে নেমে গেছে। বুদ্ধু বাঙালী ছেলেদের নিয়ে বহু উঁচুতে একজায়গায় বসে গান লাগিয়েছে। পথটা এঁকেবেঁকে বহুদূর গেছে। যতদূর চাই—দলে দলে ছেলেদের জামা-কাপড় দেখা যায়। এমন দিন গোপী আর বিক্রম আমায় ছাড়বেনা। সকালে ভাত ছিল; বিকেলে রুটি ভাত দুই-ই ছিল। আমি দুই-ই খেলাম। ডাক্তার একটা অম্‌লেট পাঠিয়ে দিলো। তিনজনে ভাগ করে নিলাম।

গোপী বললে—"বেড়ে বাগিয়েছেন তো আপনি!"

বিক্রম বুঝলো আমি একলা থাকতে চাই। গোপীকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। আমি আফিসে ঢুকে পড়লাম। 'খাদয়ালা নিউজ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য লেখা দেখলাম। টুকিটাকি অন্য কাজ সারলাম, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখা দিল। কাঁধে বন্দুক।

তখুনি বেরুলাম।

চাঁদের আলো আর আলো! ডাক্তার আমায় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এমন পথ দিয়ে নিয়ে চললো কোনো লোক নেই।

নিজেই কথা পাড়লো—"প্রথম-ছোঁয়া পেয়ে কী ভাবলে মাস্টার?"

"অবাক হলাম! ভয় পাইনি কিন্তু মুগ্ধ হলাম।"

"মুগ্ধ করারই মেয়ে ও। কী যে লক্ষ্মী আর কী যে ভালো কি বলবো অথচ আজ ও চলে গেছে একেবারে খাদের মুখে। এ-খাদে ধ্বস নেমেছে। তলিয়ে ও যাবেই।"

"ভালবাসো বুঝি ?"

"নাঃ, ঐ কারবারটা করিনি। তবে বহু নারী জীবনে দেখেছি, ঘেঁটেছি। সমবেদনাটাই হয়ে পড়ে কারোর ওপর বেশী, কারোর কম। ব্যাপার হয়েছে যে, ওই মেয়েটা আমায় হয়তো ভালবাসে।...ও ছিল আমার একটা রোগিণীর মেয়ে—"

অবাক হয়ে বললাম—"তবে তোমার চেনা বলো ?"

"বাগীতে ও অনেকের চেনা।"

"এ পথে এলো কি করে ?"

"যা ক'রে সবাই আসে। দ্বিতীয় স্বামীর মেয়ে ও। তৃতীয় ও চতুর্থ স্বামী ওকে দেখতে পারলোনা। মা বিয়ে দিলো অল্পবয়সে। যার সঙ্গে বিয়ে দিলো সে সবুর সইতে পারেনা। তাকে ফৌজে ভর্তি হতে হোলো, সেই সুযোগে ফৌজে যাবার আগে ও ভালো করে কামস্নান সেরে নিলে পণ্যনারীর ঘাটে ঘাটে। এবং মেয়েটাকে সাংঘাতিক সংক্রামিত করে গেল। মা মারা গেছে ততদিন। চতুর্থ বাপ ওকে আশ্রয় দিলো বটে, কিন্তু ফলে যে কাণ্ড হোলো সমাজ ওকে স্থান দিলনা। শ্রীমান বাপ ওকে যার বাড়ী রেখে গ্রাম ছেড়ে পালালো সেই বাড়ীতে ও আজও। এখন ও জানে যে, ওর জীবন রক্ষা করেছি আমি, ওর স্বাস্থ্য আমারই দেওয়া। তাই ওকে আবার বিক্রি করার হাত থেকে পরিত্রাণও আমারই হাতে। এখন ও আশা করে ওর স্বামী ফিরে এসে ওকে সংসারী করবে।"

"ওর স্বামী ফেরেনি ? যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে।"

"ফিরবেওনা। বর্মায় সে হারিয়ে গেছে। অর্থাৎ অনেক মিঞার যা দশা ওরও তাই। এক নয় এতদিন কারেন ডাকাত-দলে ঢুকে পুরোপুরি ডাকাত হয়েছে, নয়তো উত্তর-বর্মার কোন্ বনে বর্মী সুন্দরীর ছেলেমেয়েকে নাওয়াচ্ছে খাওয়াচ্ছে। পুরুষকে কাজ করতে হয়না। কি-বা হয়তো মরেই গেছে।"

"ওকে তা বললেই পারো।"

"বয়স কি ওর ? এতো পারবে কেন ? বাপ মরেছে, মা মরেছে, সংসার মরেছে, সমাজ মরেছে, স্বামী মরেছে, বেঁচে আছে কেবল ভালবাসার মতো একটু জিনিস। তাই নিয়ে স্বপনের জাল বোনে। থাকনা। মাসে কিছু পাঠাই। বলা আছে ওকে নিয়ে বণিক্‌বৃত্তি যেন আর না চালায়।

লোকটা ভয় খায় আমাকে। তাই যতদিন পারে একটু স্বপ্ন দেখুক। পথ তো ওর বাঁধাই এবং সেই পথের ধারেই ওর কবর পাতা। ওরই মধ্যে তবু আমায় দেখতে পেলে খুশী হয়।"

"তাহলে এতো লুকিয়ে রাখার দরকার ছিল কি তোমার ডাক্তার? তোমার পরিচারিকাও তো থাকতে পারতো।"

"না, তা পারতোনা। প্রথম বাধা ও ডাকসাইটে মাল। এখন ও যতই বাক্স-বন্ধ থাক্, সামাজিক গ্লানি মাথায় নিয়ে যে মেয়ে বাজারে এসেছে তার ডাক-নাম ছাপাছাপি থাকেনা। তারপর এ ক্যাম্প্‌টার একটা শুচিতা আছে; বিশেষ ক'রে খবরের কাগজের শকুন-ওড়া ক্যাম্প্ এটা; সরকারী চাকরিটা খোয়াতে চাইনা। তবে তোমরা ক্যাম্পের যারা, জানতে না পারলেও, সরকারী ফরেস্ট-রেঞ্জার প্রভৃতি দু'চারজন জানতোই। ওদেরই জীপে ক'রে তো ও বাগী ফিরে গেল।"

কোথায় আমরা বসে ছিলাম জানিনা। স্তব্ধ অরণ্যের পাশে বসে। সামনে বাজেশাল গ্রামটা বহু নীচে খড়ের মধ্যে। টালি-ছাওয়া ঘরগুলোর ওপর হালকা কুয়াশা—চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে। হালকা ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছে।

*

ক্যাম্পে ফিরে দেখি বুদ্ধ্ আর চৌধুরী বসে আছে।

—"দাদা, আমরা আপনাকে পাচ্ছিনা। রোজ কত কি সব লেখেন। আমাদের একদিন শোনান।"

"সব লেখা কি শোনাবার জন্যে?"

"না—আমি জানি আপনি লেখেন। আমরা ক'জন বাঙালী আছি। ক'দিনই বা এমনি জায়গায় থাকবো। একটু একসঙ্গে বসবোনা কেন আমরা?"

"নিশ্চয় বসবে। কিন্তু কিছু কাজ করোনা তার চেয়ে।"

"করছি তো কাজ। কাজ আপনার শেষ করে দেবো।"

"সে-কাজ বলছিনা। তোমাদের সব statistics সংগ্রহ করার কাজ ছিল। নিচ্ছ তা?"

"নিশ্চয়। কালই আপনাকে তা দেখাবো।"

"কত নিরক্ষর দেখলে ?"

"প্রায় সব।"

"তবেই ত্তাখো। বড়োদের নয় ছেড়ে দাও। কিন্তু ছোটদের নিয়ে রোজ দুপুরে একটা ক্লাস তো করা যায়। হাতের লেখা আর অক্ষর-পরিচয় করিয়ে দিতে পারো তোমরা।"

পরের দিন থেকে যেদিন ফিরে আসি সেদিন পর্যন্ত প্রায় আশীটি ছেলে-মেয়েকে এরা পড়িয়েছিল। আমার মন ভরে যেতো যখন দেখতাম, বারোটার পর কাঠের তক্তি হাতে নিয়ে ছেলেমেয়ের দল ভেড়ার ছানার মতো পাহাড় বেয়ে ক্যাম্পে উঠছে। ওরা এই শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে কিনা জানিনা। কিন্তু আমাদের চেষ্টায় দিন কুড়ি কাজ করার ফলে ওরা অক্ষর-পরিচয় শেষ করে যুক্তাক্ষর শিখে ফেললো। গুনতে শিখলো আরও ভালো।

নয় তারিখ বিকেলেই আস্থানা চলে গিয়েছিল সিমলা।

দশ তারিখ সকালে সকলেই যথারীতি কাজে গেল। ক্যাম্পের নীচেই সড়কটায় 'ভর্মা-বাইসারিয়া' দলের কাজ চলছিল। বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ দেখলাম দলে ৭।৮টি ছেলের জায়গায় তিন-চারজন মাত্র; এবং তারাও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত—হাঁপাচ্ছে। রোজ-হাজিরা নেবার প্রবৃত্তি হয়নি এখানে। নিতামও না। কিন্তু ঘুরে ঘুরে বেড়াবার সময় সবাইকে দেখে নিতাম। কম দেখে জিজ্ঞাসা করার ফলে চোখে-মুখে কৌতুক ফুটে গেল। বললো—"এই গেছে যেন কোথায়; এসে যাবে।" আমি ব্যাপারটা সুবিধার মনে না করে নোটীশ দিলাম যে, খাবার জন্য প্রত্যেককে রাশন-কার্ড দেওয়া হবে। তাতে রোজ দু'বেলাই নয়, চারবার চাররকম খাবার বেলাতেই (প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন-ভোজ, অপরাহ্ণ-চা, রাতের খাবার) ঢেড়া কাটাতে হবে আফিসে। ফলে দেখলাম সিন্‌হা, বাইসারিয়া এবং ভর্মা দুপুরে ফেরেনি। বেলা যখন দুটো তখন বিচলিত হয়ে পড়লাম।

করমচন্দজী তখন একখানা সার্কুলার আমায় দেখালেন। সার্কুলারখানা সরকারী। আগেই এসেছিল। আস্থানার ইঙ্গিতে আমার কাছ থেকে গোপনে রাখা হয়েছিল। এখন যেহেতু আমি ডাইরেক্টর এবং তিনটি পক্ষী বেখবর তাই দেখাচ্ছে।

সার্কুলারখানির মর্ম এই যে, খাদরালার আশেপাশে ছ'মাইলের ব্যবধানে পনেরোটি গ্রাম আছে ছোটোয় বড়োয়। ছেলেরা সব Social survey-র জন্য যাবে ব'লে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সব সময় সব জায়গায় এদের ঘোরা নিরাপদ নয়; বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা গ্রামীণদের অসাক্ষাতে করাও ঠিক নয়। তা ছাড়া বন্যজন্তুর উৎপাতের জন্য যেখানে সেখানে ঘোরা ঠিক নয়। তাই পনেরোটি গ্রামেরই মুখ্য গ্রামীণদের নোটীশ-জারি করা হয়েছে ছেলেদের যাতে সার্ভের কাজে সাহায্য করে। ছেলেরা যেন গিয়ে প্রথমেই মুখ্য গ্রামীণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে। এজন্য গ্রামের নাম, গ্রামীণের নাম, দূরত্ব ইত্যাদি জানিয়ে একটা ফর্দও দিয়েছে।

দশ তা'রিখ সকালে এই ফর্দটার কপি সবাইকে দেওয়া হোলো, আর নির্দেশ দেওয়া হোলো যে, ছেলেরা যেন যথেচ্ছভাবে ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের মধ্যে যখন-তখন না যায়। গেলে, সময়মতো যাবে ও গ্রামীণদের মুখপাত্রের সঙ্গেই কথা বলবে।

· ইস্তাহারটা আস্থানা যাবার আগেই দস্তখত করে গিয়েছিল। দশ তারিখে সেটা বিলি করে দেওয়া হোলো। যেন সিন্‌হা-ভর্মা-বাইসারিয়া দলের অন্তর্ধানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এটা বেরুলো, এই সবাই ভাবলো। ওদের অন্তর্ধান একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো।

বেলা দুটো হবে। আমি রোদে বসে বসে ম'ম্-এর লেখা 'রেড্' (*Red*) পড়ছি। ডাক্তার আজ আর হুঁসে নেই। মেয়েটার গল্প করার পর খুব টেনেছে। সকালটায় অতিকষ্টে দুটো কেস্ দেখেছে। তারপর সারা দুপুর ঘুমুচ্ছেই। মনটা অসোয়াস্তিতে ভরতি।

সিন্‌হা বলে—সে আমার চেয়ে বয়সে ছোটো। কিন্তু সেটা বলা ওর রোগ। ওর ছেলে আই.এ. পড়ে। বরাবাঁকীতে বাড়ি। নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর মাড়ায়নি। কেবল আলুর গুদামে আগুন লাগলে, আলু কুড়িয়ে বেড়িয়েছে। গত নির্বাচনে খুব হৈ-হৈ করেছে। তাই কান্নাকাটি করে এসেছিল এই দলে প্রায় জোর করে। আস্থানা আগে থেকেই আমাকে সাবধান করেছিল লোকটা সম্বন্ধে। আমি লোকটাকে পছন্দ করতাম না ওর ঠোঁট-দুটোর জন্যে—যেমন পুরু, তেমনি ওল্‌টানো; বাইসারিয়ারও তাই, তবে

পাতলা এবং লাল ; আভিজাত্য আছে বাইসারিয়ার মধ্যে। কিন্তু ভর্মা আর সিন্‌হাকে কিছুতেই ভালো লাগেনি। সুস্থ সতেজ তরুণদের দলে এইজাতীয় লোকের থাকাটা আমার খারাপই লাগতো।

সিন্‌হা আমায় এড়িয়ে চলতো, এবং বেশ বুঝতাম অবসর বিনোদনের জন্য দু'চারটে রাষ্ট্রীয় গালও দিতে ছাড়তোনা। সেটা খুব গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু ওরা গেলো কোথায় ! নিশ্চয় সুকর্মে নয়।

ভাবছি। হঠাৎ ভবানন্দ আর-একটি ছেলেকে এনে বসালে পাশে। বছর কুড়ি বয়স ছেলেটির। এও সিন্‌হা। চক্‌চকে রং। গলাবন্ধ যোধপুরী মোটা কোট। বড়ো বড়ো সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁতে গালভরা হাসে। শক্ত চেহারা, উৎসাহী। ছেলেটার নাম ভুলে গেছি। আমরা 'কেশব' ব'লে ডাকবো।

"আপনি সিন্‌হা-দলের খোঁজ চান ?"

সন্দিগ্ধ রহস্যসঙ্কুল প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করেছে ভবানন্দ। আমি চাইলাম দুজনার মুখের পানে। ভবানন্দ ঘাবড়ে গিয়ে বললে—"এই ছেলেটি জানে।"

ছেলেটির হাতে একটা ছড়ি। পায়ে মোটা ভারী জুতো। বললে—"ওরা সম্ভবতঃ রাতে ফিরবেনা। কালই একটা গাঁয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসেছে। কোথায় একটা মেলা আছে। সেই মেলা দেখতে যাবে ব'লে গেছে। রাত কাটিয়ে আসবে। একটা গাঁয়ে গিয়ে একটা খারাপ পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে এসেছিল। আজ কিছু উপঢৌকন-সামগ্রী নিয়ে গেছে।"

বোধহয় তিন চার মিনিট সময় লেগেছিল। ভবানন্দকে বললাম—"আফিস তো কেউ দেখবে। আমি চললাম। তোমার থাকা দরকার। আর বিক্রম এবং গোপীকে ডাক দাও। আমরা ফিরবো, ভয় কোরোনা। তবে সিন্‌হার দলের তাঁবু গোটাতে পারো।"

আমি জানি এইবয়সের ছেলেরা যেমন হাস্য পরিহাস রসালাপ ভালবাসে, ঠিক ততটাই ভালবাসে শক্ত লোককে। শক্ত লোক বিদ্যা ও সহানুভূতির আধার হলেই তরুণের শ্রদ্ধাভক্তি পায়।

আমার কথায় ওরা যেন একটু ভয় পেয়ে গেলো। কেশব তবু উৎসাহিত। কেন বুঝতে পারলাম না। গোপী, বিক্রম, কেশব এবং আমি চারজন বেরিয়ে পড়লাম পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে। কেশবের হাতে একটা পুঁটলি।

"ওতে কী ?" পথে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"চিনি"—বললে কেশব। "গাঁ-টা অনেক দূর। শুধু দূর নয়, তীব্র খাড়াইয়ের পথ। যাবার পথে নেমে যাবো, কিন্তু আসার সময় সত্যিই বড়ো কষ্ট। এখান থেকে খাড়া সাড়ে চার মাইল খালি নামা আর নামা। চা, দুধ পাওয়া যাবে। চিনির জন্য ওদের ভারি কষ্ট। তাই চিনি নিয়ে যাচ্ছি। দুধ-চা পেয়েই যাবো।"

"গ্রামের মুখিয়ার নাম?"

"রতনদাস।"

"রতনদাসকে তুমি দেখেছো?"

"কাল? না। কাল ঐ গ্রামের একটা নীচ লোকের সঙ্গে আলাপ হয় পথে। তার সঙ্গে ওরা নীচ কথাবার্তা চালায়। তার বাড়ি যায়। সেখানে মেলায় যাবার কথা ওঠে। তারপর ফিসে আসে। এর মধ্যে মুখিয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা ওঠেই না।"

"নীচ-ই যদি, তবে মেলায় যাবে কেন?"

কেশব বললে—"কাল বুঝতে পারিনি। আজ নোটিশ দেখে বুঝেছি। যে গ্রামটায় মেলা, সেটা এই পনেরোটি গ্রামের বাইরে এবং বিইবাহুলি গ্রাম থেকে আরও ছ'মাইল। খবর পাবেন না আপনারা।"

মন যেন কুঁকড়ে গেল। এতক্ষণে বিক্রম আর গোপী ব্যাপারটা যেন ধরতে পারলো। গোপী তো চঞ্চল! সে-ই আগে কথা বললো—"তারা গেছে, যাক্‌না মশায়, আপনার কেন এই গরু-তাড়ানো? আপনার নয়…"

গোপীকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বললাম—"সে-দলে সিন্‌হাও আছে, গোপী। সিন্‌হা আটটি সন্তানের পিতা।"

বিক্রম বললো—"সোয়াইন্!"

"তা ছাড়া fruit of knowledge-কে ভয় করি না, ভয় করি Satan-কে। ফল খায়, খাক; কিন্তু তার কথায় খাবে কেন যে খাওয়াচ্ছে সেটাকে অন্যের সুখের অন্তরায় জেনে; যার খাওয়াবার প্রবৃত্তিটা কুপ্রবৃত্তি থেকে জাত। ওরা যদি ফুর্তি করতে বেরিয়ে যেতো আমি ওদের মানিয়ে নিতাম, আজ নয় কাল। কিন্তু একটা দুষ্ট-সংসর্গে পড়ে যাবে এইটাই পরিতাপের বিষয়। আমি নারী আর স্বৈরাচার থেকে বাঁচাবার জন্য ছুটছিনা, আমি ছুটছি সিন্‌হার হাত থেকে ওদের বাঁচাবার জন্য।"

গোপী বললে—"বাঁচাতে আপনি পারেন? পারবেন?"

কথা এসে গেল। কিন্তু বক্তৃতা দেবার প্রবৃত্তি নেই। শিক্ষকতা করার একটা গভীর অনুযোগ যে, যখন-তখন যেখানে-সেখানে বক্তৃতা দিতে যাওয়া শিক্ষকদের একটি কদভ্যাস। মনে করুন একজন ডাক্তার যেখানে যখন যাচ্ছেন,—সমাজে, ক্লাবে, বেড়াতে,—কেবল নাড়ী টিপছেন, জিভ দেখছেন, বা বিশেষ সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে বক্তৃতা ঝাড়ছেন; মনে করুন দরজী যত্র তত্র আলাপ-আলোচনা জামার কাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, বা নাপিত চুল-কাটার মধ্যে, বা পুরোহিত সর্বত্রই শ্রাদ্ধ-বিবাহ-মন্ত্রের কুণ্ডলীর মধ্যে বদ্ধ—অবস্থাটা কেমন! সুখের বিষয়, এরা কেউ নিজেদের পেশা বা রুজীকে (কমলাকান্ত যেন ক্ষমা করেন!) সহজাত কবচ করে রাখেন না, শিক্ষক যেমন। যার সঙ্গেই কথা বলা যাক, অল্পক্ষণেই তাকে ছাত্রের পর্যায়-ভুক্ত জ্ঞান করা একটি সুনিয়মিত অসভ্যতা না হোক, অশালীনতা; এবং যদি কোনও কারণে ঐ পর্যায়ভুক্ত করায় বাধা থাকে, একেবারে সদ্যস্পৃষ্ট শম্বুকবৎ বেবাক অবয়বকে সঙ্কুচিত করে গোমড়ামির খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে আত্মগোপন থাকা,—এগুলি শিক্ষকদের স্বভাবধর্ম। এক কথায়, শিক্ষকরা অসামাজিকতার কারণ তাদের দারিদ্র্য ততটা নয়, যতটা তাদের এই বক্তৃতার নেশা। দুনিয়ার তাবৎ লোক তাঁর ছাত্র হোলো তো হোলো—বেশ সময় কাটাবে তাঁর, নৈলে তিনি বড়ই মনমরা; জগৎ অবিবেচক! এইভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি ও ভারসাম্যের প্রতি ঔদাসীন্য শিক্ষকের ঘরানা-মাল। অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু খবরের কাগজের সম্পাদক, রাজনৈতিক ভাড়াটে প্রচারক, উকিলের দালাল বা কোর্টের পেশকারের মতো কি উপন্যাসে কি জীবনে শিক্ষক একটি 'টাইপ' হয়ে রইলেন। তিনি পড়েন ও পড়ান—সেইটাই be all and end all of life।

আমি শিক্ষক। এসব গুণগুলো পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। তাবৎ দুনিয়াকে 'ভালো' করার ভার, 'বোঝাবার' ভার আমার! বক্তৃতা পেলে হোলো, ভালো করার সুযোগ পেলে হোলো। ডাক্তার ঠিকই ঠাট্টা করে। গোপীও ঠিক আঘাত করেছে।

বলতাম। কিন্তু মন নেহাত ভারি হয়ে আছে; কিছু বলিনি।

ভালো করার ভার আমার নেই। কিন্তু এই ক্যাম্প্ থেকে উন্মত্ত হয়ে ওরা

বেরিয়ে যাবে এবং আমাদের 'বেকুব' 'ক্লীব' ভেবে কানুন-শৃঙ্খলা নস্যাৎ করবে সেটাই বা পরম নির্বেদের সঙ্গে হজম করি কি করে? ডিসিপ্লিন নয় কড়াকড়ি না হোলো, মানুষকে নয় মেশিন না করলাম। কিন্তু এতোদূরে এতো ঘটা করে একটা কাজের ভার নিয়ে তার পথে এতোবড়ো একটা বিষবৃক্ষ জন্মাতে দেখে চুপ করে থাকি কি করে?

ভাবতে ভাবতে খাদরালার জঙ্গলের পূবধার ঘুরে উত্তর বেড় দিয়ে পশ্চিমে এসে পড়েছি যাতে পশ্চিম-উত্তর দিকটা চোখে পড়ে। এ-দিকটায় আগে আসিনি। পাহাড়টার পিছনে গা বেয়ে যে একটা ঘন অন্ধকার পিচ্ছিল পথ আছে লক্ষ্যই করিনি।

যেখানে পথটা খুব চওড়া সেখানটায় দেড়ফুট। তারপর খাদরালা পাহাড়ের সুগভীর অরণ্যসঙ্কুল খড্। পশ্চিম-উত্তর দিক তাই অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, আর জঙ্গলে ভরতি। উদয়সূর্যের তাপ পায় না;—অস্তসূর্যের অন্ধকার পায়। সারা পাহাড়ের চোয়ানো জল পাইনের শিকড় বেয়ে টপ্ টপ্ করে পড়ছে। পচা-পাতা-ঢাকা দেড়-ফুটী পথ কোথাও ৪৫ কোথাও ৫০ ডিগ্রীর খাড়াই নিয়ে নেমে গেছে। মাথার ওপর গাছও যতো, গাছের শেকড়ও ততো। গভীর বন। পদে পদে পা হড়কায়। এতো বন, এতো-এতো রকমের বিচিত্র বিচিত্র গাছ জীবনে কখনও দেখিনি। বড়ো থেকে ছোটো, ঘাস থেকে পাইন, শ্যাওলা থেকে দেবদারু, সুন্দর থেকে বীভৎস কতো গাছ, কতো পাতা, কতো ফুল! মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে বিরাট ফাটল; দুটো-একটা গুহার মতো কিন্তু ভেতরে জমাট অন্ধকার। নেমে চলেছি। কারুর মুখে কোনো কথা নেই—বন্যতা, নবতা, হিংস্রতা, ভয় সব জড়িয়ে আমরা যেন একটা বিরাট দৈত্যের গায়ে গা ঘেঁষে চলেছি। সবুজ ঘাস, পাতা, দূর্বা, কিশলয়—যা নিয়ে আমরা কাব্য করি তাও যে আমাদের কাছে কী ভয়াবহ হিংস্র রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে, ওই গুরুগম্ভীর অরণ্যানীর জঠরে প্রবেশ করে উপলব্ধি করলাম। নামছি তো নামছিই। বাঁকের পর বাঁক, পিছ্লে-পিছ্লে ভয়াতুর পদক্ষেপ, হাতে লাঠি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা। নিজের দেহভার পায়ের গোড়ালির ওপর বার বার এসে পড়ছে; টাল সামলানো দায়। ইঞ্চির পর ইঞ্চি একটু একটু করে চলার দায়িত্ব। তাই মুখে কথা নেই। এই প্রকাণ্ড গগনচুম্বী দৈত্যের গায়ে হাত রেখে প্রাণ নিয়ে চলা। কথা বলার অবসর কৈ।

মাঝে মাঝে দেখতে পাই পাহাড়ের গায়ে সহস্র সহস্র বয়সহীন গাছের পাশে পাশে মাটিতে শুয়ে শত শত অমনি গাছ। কবে যেন মাটি ধুয়ে-ধুয়ে ওরা ভেঙে পড়েছে শিকড়-সমেত। বর্ষার তুমুল বেগ যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে তখন এই বিরাট গাছগুলিকে নামিয়ে আনতে থাকে। যুগ যুগ ধরে একটু একটু করে এরা নামবে, গলবে, পচবে, ধুয়ে ধুয়ে শেষ অবধি নদীর অববাহিকায় গিয়ে মিশবে, পলিমাটির উর্বরতা বাড়বে। এ-দেশটায় নীরন্ধ্র সূর্যহীনতার রাজত্ব। তাই সব জীবনই এখানে পচনশীল। এতো বীজ যে, উত্তাপের অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও বহু প্রাণ জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু পচছে সঙ্গে সঙ্গে। অদ্ভুত এই পচা। শীতের দেশের মৃত্যু। প্রাণ চলে গেলেও অবয়ব থাকে অনেকদিন অপরিবর্তিত।

চলতে চলতে হাতের লাঠিটা ভেঙে গিয়েছিল। লাঠি না নিয়ে এ পথ চলা সাংঘাতিক কাজ—মরণের সঙ্গে খেলা করা। বড়ো বড়ো গাছ পড়ে আছে। সুবিধামতো একটা মোটা ডাল ধরে টান মারতেই সেটা অনায়াসে খ'সে এলো তার জনিতা-বৃক্ষশরীর থেকে, এবং হাতে যেটুকু এলো তা মুঠোর মধ্যেই কালো কাদা হয়ে গেল। অথচ বাইরে থেকে দেখতে পরিপুষ্ট সম্পূর্ণ-কলেবর বৃক্ষটি। ব্যাপারটা মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। মনে হয়েছিল মিশরের মমির মতো গাছের জমির পিরামিড এই পাহাড়ের পিঠ। লক্ষ লক্ষ গাছ এইভাবে পড়ে আছে, একদিন জীবিত ছিল। এইখানেই পড়ছে, পচছে, গলছে, মাটি হচ্ছে, মিশে যাচ্ছে জলে, জল মিশছে ঝর্ণায়, ঝর্ণা শাখা-নদীতে, শাখা-নদী মহানদীতে—যে মহানদী সৃষ্টি করছে ব-দ্বীপ আর উপত্যকার উর্বরতা। গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা-ভূমির উর্বরতা শ্যামলতা এই বন-ধোয়া জলেরই অবদান—সোঁদরবনের ব-দ্বীপের মাটি হিমালয়ের পাইন-পুষ্ট; সোঁদর-বনের জঙ্গল আর হিমালয়ের জঙ্গল স্বগোত্রের; আমরা যেমন আর্যসন্তান!

নামছি আর নামছি। গোড়ালির আর ভর নেই। এখন পায়ের পাতার ওপর চাপ পড়ছে। সমস্ত দেহটা নিজের ভারে নিজে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ কেশব চেঁচিয়ে উঠলো—"দেখুন দেখুন—সাপ!"

ডানপাশটায় বরাবর একটা খাদ চলেছে। দুটো পাহাড়ের মাঝে খাদ। খাদ হলে কি হয়, গভীর বনানী ও শস্পে ভরতি; ভরাট সবুজের সদর-কাছারি। ওদিক যাতে না মাড়াই সেই নিষেধ এই দেড়-ফুটী পথের গায়ে সদর্পে স্বাক্ষরিত।

কিন্তু সেই ভরাটের মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে ফণা দুলিয়ে-দুলিয়ে জেগে উঠেছে —একটা নয়, দুটো নয়, শত শত নাগকন্যা। তাদের মাথায় চক্র, ফণায় কালোয়-সাদায়, খয়েরে-সাদায় রেখাবহুল চিত্র-বিচিত্র। লক্‌লক্‌ করেছে দ্বিধাবিভক্ত জিভ।

এতো সাপ কেন? কিন্তু সেই শঙ্কা-স্তিমিত স্তব্ধমুহূর্ত বেশীক্ষণ স্থায়ী হোলো না।...আশ্চর্য প্রকৃতি! আশ্চর্য তার লীলাবিভ্রম। সাপ নয়; একজাতীয় গাছ। ওলকচুর পাতার মতো গোল ধরনের পাতার মাঝ দিয়ে লিক্‌লিকে ডাঁটার মাথায় ফুল। কিন্তু ঠিক যেন সাপ। ফণার বিস্তারে, রেখার চাতুর্যে, ঠোঁটের ডগায় সেই দ্বিখণ্ডিত জিহ্বার বিভ্রমে, বাতাসের দোলায় এ যেন প্রকৃতির শিল্প-রচনার চরম নিদর্শন। মনে পড়ে যায় সিমলায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে এই ধরনের ফণা-তোলা ছোটো ছোটো গাছের দল ছোটো ছোটো পতাকার ধ্বজা দুলিয়ে কাঁপতে থাকে। লোকে পাহাড়ী ভাষায় বলে 'সাপ গাছ'। কিন্তু এই দারুণ জঙ্গলে এরা আর সেই ছোটো ছোটো পতাকার রূপে নেই। অন্ধকার আর গভীরতার প্রসাদে এদের ভয়ঙ্কর রূপ পূর্ণ-বিক্রমে প্রকাশিত। খুব ঠাওর করে না দেখলে সত্যিই চমক লাগে।

গাছটার শঠতা ও রহস্য ভেতরের 'অহং'কে ধাক্কা দিল যেন। কোমরের বড়ো ছোরাখানা বার করে খুঁড়ে বার করলাম শেকড়। মাটি তো মাটি নয়, পচা পাতার স্তূপ। সহজেই শেকড়-সুদ্ধ গাছটা বেরিয়ে এলো। শেকড়টা গোল ওলের মতো, অতো বড়ো নয়। গাছটার মাঝখান থেকে সবুজ ডাঁটি, গায়ে খয়ের-রঙের ডোরা কাটা, ছোটো ছোটো আঁশের মতো। যেমন পেঁয়াজকলির ডাঁটি হয়। মাথায় ঐ ভীষণ ফণা। গাছটা মনে আছে, আর মনে আছে সেই স্তব্ধমুহূর্তের আতঙ্ক।

এর একটু পর থেকেই ঝর্ণার জলের শব্দ কানে আসতে লাগলো। বোঝা গেল এই খাদটার মাঝ দিয়ে একটা জলধারা বয়ে চলেছিল। বহু নীচে থাকার জন্য ও ক্ষীণ হওয়ার জন্য শব্দ পাচ্ছিলাম না। এখন স্রোতটা খানিকটা কলেবর লাভ করেছে এবং খাদটাও প্রশস্ত ও অগভীর হয়ে এসেছে তাই শব্দটা কানে আসে। ক্রমশঃ বনের বলিরেখা বিলীন হোলো, খাদের তলায় জল দেখা গেল। এ-ধারের পথটাও শেষ হয়ে গেল। ওপারে পথ দেখা যাচ্ছে। খাদটা

পার হতে হবে। কিন্তু মাঝে কল্‌কল্‌ করে পার্বত্য ঝর্ণা ফেণার মঞ্জীর প'রে নেচে ছুটেছে। পার হই কি করে, সেই চিন্তা।

কেশব বললে—"কাল ঐ পাথর বেয়ে-বেয়ে মাঝের বড়ো-বড়ো নুড়ির ওপর পা রেখে পার হয়েছিলাম। চলুন না?"

"কিন্তু পা যদি হড়কায়!"

গোপী পরম স্নেহভরা কণ্ঠে বললে—"আপনার পা হড়কাবে কি স্যার? পাছে কারুর পা হড়কায় সেইজন্যই তো আপনার এই অভিযান!"

আমি পাথরের ওপর সাবধানে পা রেখে রেখে ততক্ষণ এগিয়ে গেছি। গোপী চেয়ে-চেয়ে দেখছে। বিক্রম যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির নেশায় ওর চোখ ঢলঢল। কেশব তার স্বভাবসুলভ চপলতা নিয়ে চট্‌পট্‌ আমার পিছু নিলে।

পাহাড় বদ্‌লে অন্য পাহাড়ে এলাম। একটা মোড় ঘুরে একেবারে অন্য পারে এসে গেলাম। প্রকাণ্ড একটা পাইন ভেঙে পড়ে আছে পথের আড়াআড়ি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথর-মাটির জঞ্জাল। পাইনটাকে ডিঙোনো দুঃসাধ্য। ছুরি দিয়ে কয়েকটা ডাল কাটা হোলো। একটু জায়গা বার করা গেল। গুঁড়ি মেরে হামা দিয়ে সেই জায়গাটা পার হয়ে যখন পাহাড়টার এপারে এসেছি তখন বেলাশেষের আলোর উদ্ভাস। হঠাৎ সমস্ত উত্তর দিকটা খোলা পেলো, মাঝে একটা সুবৃহৎ অবকাশ। পাহাড়-ঘেরা বড়ো একটা উপত্যকা। ওপারের পাহাড়ের গায়ে গায়ে কেয়ারি-করা ক্ষেত আর বহু গ্রাম এক-একখানা ছবির মতো। হঠাৎ চমক লাগে এদেশ দেখে। বাঁ-দিকে সেই জঙ্গল-ভরা পাহাড়টার কোণা দেখা যায়। ডান ধারে পথ নেমে গেছে। সামনে একটা রজতদ্যুতি তরঙ্গ—নীল আকাশের বুক ফুঁড়ে উঠেছে। তার গায়ে গায়ে রোদের ঝলক। কোথাও গাঢ় বেগনী রং, কোথাও কমলা, কোথাও একেবারে গলানো সোনা। চোখ ফেরানো জায়না এমন শোভা, এমন মহিমা, এমন বিস্তার। ও যেন দেবতার দেশ, ও যেন চিন্তা আর মনন-জগতের আদর্শের দ্যুতিচ্ছটায় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, অধরার দেশের হাতছানি! কিন্তু এ-ধারের এই বিস্তীর্ণ উপত্যকার পারে ওই-যে ছোট ছোট গ্রামগুলি দেখা যায়, ওরা তো সেই দুরারোহ আদর্শ-জগতের ভুবন-ভোলানো ইঙ্গিত নয়; ওরা এই জীবনের, এই জগতের। ছোট ছোটো সাধ আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে

জড়িয়ে রেখেছে ওরা ; রোজকার সুখ-দুঃখের কাহিনী, ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, মানুষের ক্ষুদ্র মনটির ভীতি, সংশয়, বেদনা, তিরস্কার, ঘৃণা, লজ্জা, হিংসা, দয়ার স্তূপ। একখানা নয়, দু'খানা নয়, এমন তিরিশটা গ্রাম গোনার পর আমরা থেমে গেলাম। বায়নোকুলার বা টেলেস্কোপ থাকলে কত মজা হোতো, দূর থেকে গ্রামগুলো দেখা যেতো। এমন ছবি ; ছবি তোলার লোভ সংবরণ করা কঠিন। বিক্রম তার ক্যামেরা নিয়ে যখন খুটখাট করলে তখন মাঝে মাঝে মেঘের পানসী ভাসছে। জানি কিছুই ধরা পড়বেনা এই অবিনশ্বর সৌন্দর্যের, তবুও মানুষের যে অসীম আগ্রহ ক্ষণকে ধরে রাখার চিরকালের ভাঁড়ারে।

এই পথে চলেছি একটা বিশ্রী কাজে। মন যেন কোথায় আঘাত পাচ্ছে। অবাক হয়ে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করছি, করছি বোঝাপড়া। কেন আমার এই নাক ঢোকানোর প্রবৃত্তি। অমরাবতীর স্বপ্ন সার্থক করা এই পরম রমণীয় শোভার সমুদ্রে কেন আমি আমাকে হারিয়ে ফেলতে পারিনা? কেন জন্মগত অধিকার এই রসবিলাসকে নিরুপদ্রবে গ্রহণ করতে পারিনা, কেন ঝর্ণালতার নির্জনে মাটির কলস আমার ভরতে গিয়ে এমন পিছল সৃষ্টি করা। সহজ কেন নই? কেন নই? কে সিন্‌হা আর বাইসারিয়া, কোথায় তারা রসসন্ধানে গেছে, আমার এতো খবরদারি কেন?

দুনিয়াকে ভালবাসতে যাওয়ার শখ যাদের, তারা নিজেদের ভালবাসে কিনা জানিনা। কিন্তু ভালবাসা যাদের প্রকৃতিগত, তারা নিজেদেরও ভালবাসে। Epicurianism-এর বিষই sensitive-কে মহৎ হতে দেয়না। এ কথা সত্য, শিল্পীমাত্রেই egotist—নৈলে শিল্প হয়ে যায় দর্শন, রস হয়ে যায় বিজ্ঞান।

কেশব বললে—"স্যার, থামবেন না। এমন একটা দেশ সামনে আসছে—যার মতো দেশ এই পৃথিবীতে থাকতে পারে এমন ধারণা ছিলনা। আপনি তো অনেক দেশ দেখেছেন, অনেক কেতাব পড়েছেন, আপনাকেও বলতে হবে এমনটি দেখেননি।"

চমক ভাঙলো। "কেশব, এই দৃশ্যই কি কখনও দেখেছি? দার্জিলিঙের কাঞ্চনজঙ্ঘা, ওদের দেশের ম্যাটারহর্ন—কতোই তো শুনি। কিন্তু এই যে সব অখ্যাত অজ্ঞাত মহাপুণ্যস্থান আছে—একি জানতাম ভাই? কেদার-বদরী আর মানস-সরোবর—কত পড়েছি, কত রকমের লেখা। সে তো মানুষ

যুগ-যুগ ধরে দেখেছে। দেবতা দেখার আগ্রহে অতিক্রম করে গেছে দুর্গমকে। কিন্তু এই যে সব দৃশ্য—যার আশেপাশে মানুষের বসতি বিরল, যার ধারে-কাছে সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিবেশন ক্ষীণ, এদের মাঝে লুকিয়ে আছে লোকোত্তর সম্পদ। এর কথাই কি জানি, না, কারুকে জানাতে পারবো? এর সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করতে গেলেও তা ভাবোচ্ছ্বাসময় গদ্য হয়ে দাঁড়াবে; দাঁড়াবে ভাবালুতা।"

গোপী বললে—"সাব্, আপনি তো দেখছি বৈরাগী লোক। আপনি আর দেশে নাই-বা ফিরলেন। থেকে যান্-না এখানেই?"

গোপী করলো ঠাট্টা। কিন্তু বললে মনের কথা।

এমনি কথা আমায় দুজন বলেছিলেন। দুজনাই নারী। বলা যাক সেই অবান্তর কথা।—

তখন সবে ফিরেছি একবৎসর অজ্ঞাতবাসের পর। মাথায় লম্বা চুল, গায়ে রঙীন খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পা-জামা—চোখে ক্ষমতাকে প্রতিহত করার শুক্‌নো ক্ষুধার ঝলক—আমার দিদি দেখেই বললেন—"কেন এলি ফিরে? সন্ন্যাসীর বেশ নিয়েছিস, ভালো লাগেনা সংসার-ধর্ম। উড়ন-চুড়ে; উড়ুন-চুড়ে থাকলেই পারতিস। তুই আর তোর গাছ, নদী আকাশ। এলি কেন বাড়িটাকে আবার পুলিসের পরিক্রমা তৈরি করতে?"

দিদি জানতেন মনের খবর। মরে গেছেন তিনি।

আর যিনি এই মনের স্বত্বাধিকারিণী তিনি বলেন—"মাঝে মাঝে ভরসা হারাই। এ ভয় আমার যাবেনা। যে-কোনোদিন চলে যেতে পারো তুমি। সব ভালবাসা আর মায়ার ওপরেও তোমার জগৎটাকেই তুমি ভালবাসো, সেখানে আর কেউ নেই। ভয় করে আমায়।"

আর আমার মনে বেজে যায়—

> "*I was not left, like others, cold and dead;*
> *The spirit whom I lov'd in solitude*
> *Sustained his child.*"

এ যে কেবল রোমাঞ্চ-বিলাসী পান্‌সেপনা নয়, এ যে বাঙালী তরুণের উচ্ছ্বাস নয় মর্মবেদনা দিয়ে, তা বুঝি—যাকে ইংরেজরা বলে *sweet*

*anguish*—এইসব প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে সহসা প্রশ্ন জাগে সমগ্র অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে—

কথমায়াত্যস্মিঞ্ শরীর আত্মানং বা প্রবিভাজ্য কথং প্রাথিষ্ঠতে ?
কেনোৎক্রমতে, কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মম্ ?

[ কেন বলো এই দেহ এলো ?
শবে শিবে করে ভাগাভাগি
আবার সে কেন মিশে গেল ?
কহ মিথ্যা কিসে হয় দূর ?
সত্য বলো কিসে যায় জানা
জানা যায় জ্ঞান পরিপূর ? ]

প্রশ্ন জাগে—

কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?
[ কাহারে জানিলে পরে সব হয় জানা ? ]

তাই হয়তো গোপী আমায় তামাশা করলো।

ম্লান হাসি হেসে বললাম—"হ্যাঁ গোপী, থেকে যাবোই মনে করছি। সিন্হা আর বাইসারিয়াদের সন্ধানটা নিই, তার পর।"

কোথায় আবার কেশবের বলা সেই দেশ। চলতে লাগলাম। শরীর যেন হাল্কা হয়ে গেছে, এমনই আনন্দ। গোপী আর কেশব এগিয়ে যেতে লাগলো। বিক্রম আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। পাখীটা-আস্টা দেখছে, পোকামাকড় লক্ষ্য করছে, আর মাঝে মাঝে বলছে—"দেখুন স্যার, দেখুন!" এতো যখন দেখার জিনিস, দুটো চোখ তখন কম মনে হয়। তাই বার বার ডেকে বলতে ইচ্ছে হয়—"চোখ ধার দাও, চোখ ধার দাও!"

পাহাড়টায় রোদ। দূরের পাহাড়ের পেছনটা অন্ধকার। লম্বা লম্বা গাছ গভীর খাদের মধ্য দিয়ে বরাবর ওপরে উঠে গেছে। এতো ঢালু পাহাড় এটা যে, এর গায়ে কোনও গাঁ নেই। এ পাহাড়টাও একসময়ে ঘুরে গেল অন্য মোড়ে। আর ঘুরতেই দেখলাম অদ্ভুত দৃশ্য।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা হাল্কা নরম মিষ্টি গোলাপী গন্ধ নাকে আসছিল। ওরা তামাশা করবে তাই জাহির করিনি কথাটা। কিন্তু তার রহস্যের এতক্ষণে সমাধান হোলো। আমি কি করে বোঝাবো সেই অনির্বচনীয় প্রকৃতি-শোভা?

সমানে বিরাট একটা উপত্যকা ঢাকা পড়েছে ঘন পাইন-বনের সারিতে। আরও গভীর দৃষ্টি হানলে দূরের গ্রাম দেখা যায় পাইনের ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু সমস্ত উপত্যকাটা সাদায় সাদা। পাইন-গাছগুলো পর্যন্ত সাদা। পাহাড় সাদা, পথ সাদা, বন সাদা, বনান্ত সাদা,—আর সব সাদার ওপর মহিমময় সাদা হিমালয়ের শিখরে শিখরে স্তূপীকৃত তুষারের আস্তরণ।

এতো সাদা এলো কোথা থেকে! অনবরত একটা গুন্‌গুন্ গুঞ্জরধ্বনি, কানে সেই সঙ্গীত, চোখে ঐ সাদার তরঙ্গ, নাকে একটা অপরূপ সুবাস, বাতাসে চঞ্চল লঘুতা—অপূর্ব মায়াময় ঘুমপুরীর দেশ এ। সাজানো চারিধার, অথচ জনবসতি নেই। থম্‌কে দাঁড়াতে হোলো গোপীকেও এবার। বললে—"তাজ্জব দেশ! গোলাপ? কেবল সাদা গোলাপ? এতো ফুল, এতো!" বিশ্বাস হয়না অনুভূতিকে।

পাহাড়ের লতানে গোলাপ। মোটা মোটা লতার বেড়ে পাইনকে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওপরে চলে গেছে, চলে গেছে ডাল থেকে ডালে, শাখা থেকে শাখায়, মাইলের পর মাইল। পথ জানেনি, বন জানেনি, মাটি জানেনি, আকাশ জানেনি,—সেই গোলাপের বন্ধন নিবিড় হতে নিবিড়তরে, দূর হতে দূরান্তরে চলে গিয়ে সমগ্র উপত্যকাটাকে ভরিয়ে দিয়েছে শুধু সাদা একপাটি গোলাপের সমুদ্রে। তারই গন্ধে বাতাস সুরভিত; আর সেই গন্ধ-প্রলুব্ধ মৌমাছিদের ঝাঁক অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ক্ষীণ পাখার গুন্‌গুনানিতে এই বনস্থলী গুঞ্জিত। সাদার গুঁড়ো নয়, সাদার তূলির কাজ—সবুজকে যেখানে সেখানে ঢেকে-ঢেকে সাদার কাজ। দুশো ফুটের মাথায় পাইন-গাছ জড়িয়ে রেখেছে ঐ সাদার মুকুট, আর সবার মাথায় তুষারমণ্ডিত হিমগিরি। অপ্সরা বা কিন্নরদের বাসভূমি চোখে দেখিনি। কল্পনায় যা এঁকেছি তাও এতো সুন্দর নয়। সকল কল্পনাকে পরাজিত ক'রে এই শোভা নিজের মহিমায় আমাদের অভিভূত ক'রে ফেললো।

আমরা যেন কেমন হয়ে গেলাম। কাউন্ট-অব্-মন্টেক্রেস্টো ধনভাণ্ডার পেয়ে হঠাৎ তা ছড়াতে শুরু করেছিল। হঠাৎ পেলে পাগল হয় অনেকে, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ পায়। আমরা ছুটোছুটি করে এ-ডাল কাটি ও-ডাল কাটি কেবল গোলাপ কুড়োবো, গোলাপ। সেই ইচ্ছে, সেই নেশা, সেই সব।

খানিকটা সময় এই প্রলয়ঙ্কর মত্ততায় কেটে যাবার পর হুঁস হোলো। তখন

সবাই সবাইকে দেখে খালি হাসি। কিন্তু বসতি আর বেশীদূরে নেই, কারণ ক্ষেতখামার দেখা যাচ্ছে এইবার। রাস্তার ধারে একটা ফলক দেখলাম ডাক-বাংলো লেখা। ছোট্ট পাহাড়ী কুঁড়ে, পাশটায় একটা ছোটো বাগান। দুটো নাশপাতি গাছ, দুটো আখরোট আর পাঁচ-ছ'টা আপেলের গাছ। আখরোট-ফুল ফুটে আছে ঝুমকো-ঝুমকো সাদার গুচ্ছ, যেন বড়ো বড়ো টগরের থোলো, পাপড়িগুলো রেশমের মতো নরম আর পাতলা।

ঘুমভরা চোখের মতো রাস্তাটা চলে গেছে গ্রামের পানে। সেই গ্রাম যেখানে সেই স্যাকরার বাড়ি, যে-বাড়িতে ওরা কথা বলেছে মেলায় যাবার জন্য।

গ্রাম এসে গেল।

গ্রাম তো এসে গেল। কিন্তু একি গ্রাম! জন-মনিষ্যি নেই। গরুগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিচিলি চিবোচ্ছে। ছাগল-ভেড়াগুলো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। ছাদে ছাদে মকাই গম বেছানো। খোলা-বারান্দায় খাট কাৎ করা, আর তার পাশে পরিত্যক্ত পাহাড়ী হুঁকো। কিন্তু লোকজন নেই। সেই স্যাকরার দোকানেও কেউ নেই। যেন নিদ্রিত-পুরী।

কেশব অপ্রস্তুত। বললে—"কিন্তু এই সে-গ্রাম। ঐ সেই বাড়ি। ওখানে বসে ওরা কাল কথা বলেছিল। আমি ঠিক জানি।"

একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বিদেশীদের অনধিকার-প্রবেশের বিপক্ষে প্রতিবাদ জানাতেই, চার-পাঁচটা কুকুর দৌড়ে এলো। তাদের ঐকতান থামতে-না-থামতেই একটি বুড়ো পাহাড়ী এগিয়ে এলো দু'খানা কুঁড়ের মাঝ দিয়ে।

আমরা তখন জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, কেশবের কথা ঠিক। কিন্তু গ্রামের সবাই গেছে মেলায়। রাতে আর কেউ ফিরবেনা। ফিরবে পরদিন সকালে।

শুনে আমরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম। ক্ষুধায় তখন পীড়িত ; আর চা। চা না পেলে আমায় স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে হবে।

বুড়োকে মোটেই প্রীত দেখলাম না। নেহাত পীরিত জমাতেই হবে তাই ওর হুঁকায় টান দিয়ে আত্মতাই দেখালাম। কিন্তু শক্ত ঝানু হাড়। কিছুতেই গললেনা। সাফ্ বলে—"চা-কা ব্যবস্থা করা যেতে পারেনা।"

বেনেলী কায়দায় কেশব বললে—"চিনি এনেছি, বুড়ো, চিনি এনেছি।"

কুৎকুতে চোখ চেয়ে বুড়ো বললে—"তোমাদের চিনিতে কাচের গুঁড়ো আছে। কাল তোমরাই এসেছিলে তো? আজ আমার গাঁয়ের লোক নিয়ে কয়েক ছোঁড়া গেছে মজা ওড়াতে। মেলায় জোয়ানরা গাঁ খালি করে গেছে জানতে পেরে তোমরা ধাওয়া করেছো। তোমরা আসছো খবর পেয়ে গেছি অনেক আগে। তাই দল বেঁধে সবাইকে মেলায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ঐ ত্মাখো, ওরা যাচ্ছে।"

দূরে পাহাড়ের গায়ে চাদর আর রঙীন জামা দেখা গেল। সারি সারি মেয়েরা চলেছে।

লজ্জায় যেন মরে গেলাম।

আমি বুড়োকে বোঝালাম যে, অপরের অসভ্যতার জন্য আমাদের সন্দেহ করা ওর খুব স্বাভাবিক হয়েছে—কিন্তু আমরা ওদের ধরতে এসেছিলাম।

বুড়ো আমার দিকে খানিকটা চাইলে, তারপর বললে—"হয়তো ঠিক। কিন্তু চা আমি দেবো কোত্থেকে? চায়ের পাতা আমি খানিকটা দিতে পারি!"

বিক্রম বললে, "বেশ, বেশ, আমি আগুন করে জল ফোটাচ্ছি। একটা লোটা দাওনা।" ব'লেই ফস্ করে একটা সিগারেট বার করে বুড়োর হাতে গুঁজে দিলে।

বুড়ো সিগারেটটা ধরালো। লোটাও দিলে। কিন্তু বললে—"দুধ নেই।"

নাঃ, নেহাত পাজী বুড়োটা। এত গরু চরছে, ঘরে গরু বাঁধা, আর বলছে: 'দুধ নেই!'

আমি কথাটা মনে পড়িয়ে দিতেই বুড়ো যা বললো, শুনে চক্ষুস্থির!

কি-এক সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করেছে গ্রামের গবাদি পশুকে—সাংঘাতিক ব্যাধি। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া সবার চোখের কোণে ঘা, দাঁতের মাড়িগুলো ঘায়ে থিক্‌থিক্ করছে,—ক্ষুরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, চামড়া আর ক্ষুরের সংযোগ-স্থানে ঘা। এমনকি শিঙের সন্ধিস্থলেও ঘা। মাছি ভনভন্ করছে।

"ও-দুধ আমরা খাইনা। বাঁটে ঘা হয়েছে, বাঁট ফাটতে সুরু হয়েছে। সব মরে যাবে বাবু, সব—"

যখন হয় এ-রোগ, সবই মরে যায়। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ওরা সরিয়ে

ফেলেছে অন্ত গাঁয়ে, বাকী পশুদের একটু ঠাওর হতে-না-হতে। একেবারে অন্য গ্রামে নিয়ে যায়নি। কিছুদিন মাঝামাঝি একজায়গায় রেখে দিয়েছিল। যখন নিরাপদ দেখেছে তখন গাঁয়ে নিয়ে গেছে। একধরন 'কোয়ারান্টাইন' বলতে হবে।

ঐ লোটাতেই জল-গরম চড়ানো হোলো, চায়ের পাতা সেদ্ধ করলাম, নৈলে কোনো পদার্থ ছিলনা চায়ে, চিনি দিলাম, এবং সেই 'র' চা একটু একটু করে পান করলাম কাঁচা নাসপাতি সহযোগে। অমন সুন্দর চা জীবনে কখনও আর খেয়েছি মনে পড়েনা।

বিক্রম হাসলো।

গোপী যেই চায়ে চুমুক দিতে যাবে অমনি বিক্রম ব'লে উঠলো—"মত্ পীজিয়ে, নবাব-সাব্।"

"কেন ?" জিজ্ঞাসা করলো গোপী আর্তস্বরে।

"সত্যই তো, কেন ?" আমিও জিজ্ঞাসা করলাম।

বিক্রম হাসতে লাগলো।

গোপী বললে—"কেমন বদ্‌তমীজ 'পায়জামা' দেখুন ; চায়ের সঙ্গে মস্করা করছে, জনাবকে মধ্যস্থ রেখে। তমাম দুনিয়াটা কোথায় চলেছে আল্লা !"

গোপীর ভগবদ্‌ভক্তি দেখে আমরা হাসছি। গোপী চায়ের বাটি আবার তুলতেই বিক্রম আবার হাঁকলো—"দোস্তীর কসম্, গোপী, ও চা খেয়োনা তুমি। ইমানদারির কথা !"

গোপী থম্‌কে বললে—"আমার অজাতপুত্রের মাতুল, তোমার দোস্তীর করতাজ্ আমার পয়জার হোক, খাবোনা কেন শুনি ? এই প্রচণ্ড পতনের পর তমাম পারস্তের শরাবখানা চেটে মারলেও আর পতন হবেনা জানি। তবে চা, সামান্য চা খেতে আপত্তি কেন শুনি ?"

বিক্রম বললো—"বেশ ! নবাব-সাবের খিদমৎগার খিদমৎ করতেই পাবে। নবাবী মেজাজে যা উচিত মনে হবে তাই সে করবে। তবে এও ঠিক, অনুচিতকেই যদি উচিত না মনে করবে, তবে আর নবাবী মেজাজ বলেছে কেন ?"

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—"আহা, দাওনা ওকে খেতে, বিক্রম—কেন বাগ্‌ড়া দিচ্ছ ?"

বিক্রম বললে—"আর পান? চা খাওয়ার পর নবাব-সাব্ পান না পেলে পথ চলবেন কি করে?"

হাতের বাটির চা অম্লান-বদনে মাটিতে তৎক্ষণাৎ ঢেলে ফেলে দিয়ে গোপী বললে—"বিক্রম আজ দোস্তীর বুকে ঢোকানো ছুরি টেনে বার করে নিয়ে দোস্তীকে বাঁচালো, জনাব। নৈলে গেছিলাম। নরক—এটা নরক! পান নেই, চা নেই, হুরী নেই, গরু-ভেড়ায় পোকা, মানুষে জরা—এ গ্রাম নয়, স্যার—এটা সেই *Ancient Mariner*-এর enchanted ship—"

বিক্রম বললে—"আর তোমার ঐ চা মাটিতে ফেলে দেওয়া albatross-বধের পাপ! খাও চা, শিগ্‌গির খাও, নৈলে গেলে!"

গোপী বললে—"না, ভাই। আর নয়। পান না পেলে মরে যাবো। কে জানতো এই বিপদে পড়বো? পান আনতে ভুলেছি। চা না খেলে আমার কিছু হবেনা।"

বিক্রম বললে—"না, চায়ের অপমান আমরা সহ্য করবনা।"—ব'লেই ওর বাটি আবার ভরে দিল।

গোপী ইতস্ততঃ করছে দেখে বিক্রম পকেট থেকে একটা পান বার করে গোপীকে দেখাতেই, কুঁদো বাঘের মতো গোপী ঝাঁপিয়ে পড়লো বিক্রমের ওপর, এবং সেখানেই তাকে মাটিতে ফেলে দুটো গালে একেবারে সাড়ে-নিরানব্ব‌ুইটা চুমো খেলে এলোপাতাড়ি বিরাট বিরাট শব্দ করে!

ততক্ষণে বুড়ো গ'লে মাই-ডিয়ার হয়ে গেছে। ঘুরে ঘুরে বাড়ি-ঘর-দোর দেখালে, খলিহান দেখালে, গোশালা দেখালে, বাগান-ক্ষেত-খামার দেখালে।

চমৎকার একটা দৃশ্য দেখলাম। ছবি আঁকতে জানলে ছবি আঁকতাম। পাহাড়ের ওপর খানিকটা সমতল। দু'ধারে সারি সারি দোতলা কাঠের ঘর। একটা পাশ খড়্। সে-ধারটায় দেয়াল-গাঁথা। সেই দেয়ালের পাশেই আর-একটা দেয়াল ভেতরের দিকে। তাতে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। মাথার ওপর ধামা-সুদ্ধ গম তুলে ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে ফেলছে। হু-হু করছে বাতাস। গমগুলো দুটো দেয়ালের মাঝে পড়ছে। সারা অঙ্গনটায় তুষ ছড়িয়ে পড়ছে, আর সেইসঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাজা গমের মাদক গন্ধ। মেঝেয় একটু বেশীবয়সী একটি মেয়ে ঝাঁটা দিয়ে ছড়িয়ে-পড়া গমগুলো একজোট করে

ডালায় ভরছে। মাথায় করে এনে চামড়ার জালায় ভরে রাখছে। ওরা কাজ করছে, তিনটি শিশু খেলা করছে। গাল ফেটে পড়ছে রঙে। মাথায় গোল গোল, তালু-চাপা ফেল্টের টুপি; এককালে সবুজ রং ছিল। গায়ে ঢলঢলে পট্টুর কোট। খেলা করছিল, আমাদের দেখে চম্‌কে দাঁড়ালো। একটি সম্পূর্ণ সুখী তৃপ্ত পরিবারের ছবি। বুড়ো বললে—"আমার বাড়ি। আমার মেয়ে, আমার নাতনী।"

"এরা মেলায় যায়নি?"

"নাঃ, আমি ওদের পাঠাইনি। দরকার ছিলনা। আমি তো রইলাম।"

আমি সুযোগ পেয়ে বললাম—"ওদেরই বা পাঠালে কেন?"

"ওরা নির্ভরযোগ্য ছিলনা। তা ছাড়া তখন রাগ হয়েছিল।"

"কখন?"

"যখন খবর পেলাম তোমরা আসছো।"

"আর এখন?"

"এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। তোমরা সব তো ছেলের মতো আমার। কাল যারা এসেছিল তারা ভারি বদ্‌লোক, বাবু। একজনকে দেখেছিলাম। ওঃ, ভীষণ পাজী লোকটা।"

মনে পড়ে গেল কাজের কথা: "আমি ওদের খোঁজেই এসেছিলাম। আমায় আজ মেলায় পৌঁছে দিতে পারো?"

বুড়ো বললে—"কেন বলো তো? তোমার মেলায় যাবার শখ কেন?"

বিক্রম বুড়োকে বোঝালো। বুড়ো বললো—"মেলার পথ বড়ো কঠিন। এখুনি রওনা হলেও, রাত ন'টার আগে পৌঁছানো যাবেনা।"

"তবে কি করি?"

বুড়ো বললে—"তোমরা ফিরে যাও। কাল আমি সব খবর তোমায় দেবো।"

"কাল হলে আমার চলবেনা। আজই চাই।"

বুড়ো খানিক ভেবে ওর নাতনী সেই মেয়েকে ডাকলো—"পান্না!"

নাতনী এসে দাঁড়ালো।

"তোর মাকে গিয়ে বল্, বাবুদের একটু ঘী আর দু'খানা করে রুটি দিক্।

ওদের কাছে চিনি আছে। বেশ লাগবে। অনেক পথ উঠতে হবে ওদের। আর তুই দৌড়ে চলে যা। ওদের গিয়ে ধরে ফেল্। মেলায় গিয়ে দেবীমাঈকে বাবুর চিঠি দিবি লুকিয়ে, কেউ না টের পায়।"

পান্না বললে—"তা আমি পারবোনা। ঐ বাবুটা মেলায় আছে—আমি যাবোনা। তা হলে তো আমি আগেই যেতাম। মাকে বলছি রুটি করে দিতে।"

আমি বললাম—"কেন যাবেনা, পান্না-বহিন্? ওরা খারাপ। অথচ ওরা আমার ছাত্র। আমিই খারাপ। আমি যদি ওদের না ঠিক করি কি হবে ওদের। ওদের জন্য আমি এতদূর এসেছি। আমি ওদের না নিয়ে ফিরবোনা। তোমার দাদু বলছেন সেখানে যাওয়া কঠিন। যত কঠিনই হোক, আমি যেতামই। কিন্তু তোমার দাদু আমার বড়দাদার মতো, আমারও দাদুর মতো। তাঁর কথা আমি মানতে বাধ্য। তাই তোমায় চিঠি দেবো, তুমি দেবীমাঈকে দিয়ো।"

পান্না খানিকটা তাকিয়ে, কিছু না ব'লে চলে গেল। কী যেন দেখলাম ওর চোখে।

বুড়ো বললে—"পান্না বড়ো খাঁটী মেয়ে। চমৎকার শিকারী। ছুটতে পারে হরিণের চেয়েও জোর। সেই রূপ আর গুণের দৌলতে ওর বিয়ে হয়েছে এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। ওর ননদ বিধবা হবার পর আর বিয়ে করতে চাইছেনা। অথচ ওর ননদের দেবর তাকে বিয়ে করবেই। ওর স্বামী সেই দেবরের পক্ষে। তাই বোনকে বাধ্য করছে বিয়ে করতে। বোন কান্নাকাটি করছে। ভাই-বোনে খিটিমিটি। জোর করে পান্নার স্বামী তার বোনকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছে। পান্নার অমতে হয়েছে। পান্না তাই স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে। ব'লে এসেছে, যদি ননদ টিক্লিকে ওর স্বামী লেখরাজ ফিরিয়ে না আনে, ও লেখরাজের কাছে ফিরবেনা।"

"বলো কি! লেখরাজ কী বলে?"

বুড়ো তামাকের গুড়গুড়িতে টান মেরে বললে—"লেখরাজ আর পান্নায় বড়ো ভাব। ওদের একসঙ্গে তো দেখনি। তেমন ভাব আকাশের সঙ্গে চাঁদেরও হয়না, কেলুর সঙ্গে বাতাসেরও নয়। আমি আমার এই গুড়গুড়িটাকে বোধহয় তেমন ভালবাসিনা। লেখরাজ বোধহয় কিছু ধারে টিক্লির দেওরের

কাছে। মরে-বেঁচে সে টাকা শোধ দিয়ে ও টিক্‌লিকে ফিরিয়ে আনবেই। তখন পান্না যাবে।"

"তবে যে বললে লেখরাজ জমিদারের ছেলে?"

হেসে বুড়ো বললে—"জমিদারের ছেলেই সে। জমিদার তো আর নয়।"

পান্না এসে হাজির। গরম গরম বেঁটে-বেঁটে গোলগাল পোড়া আটার তালের ভেতর ছেঁদা করে ঘী ভরা। কোথায় লাগে বিলিতী কেক্! সকলকে দু'খানা করে দিয়ে গেল। বললো—"বসুন, আরও আনছি। লেখরাজের কথা বুঝি বলছিলো বুড়ো?"

আমি হাসলাম; বললাম—"হ্যাঁ, লয়লা-মজনুর গল্প জানো?"

বুড়ো বিষম খেলো। "আরে আরে! ও জানবে কোত্থেকে? সে জানতো ওর দাদী।"

ততক্ষণে পান্না চলে গেছে।

"বড়ো ভালো মেয়েটা, বাবুসাব্। ও চলে যাবে আসছে শীতের পরেই। মনটা কেমন যেন করে। তার আগেই মরে যেতে সাধ যায়। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় ওকে আর লেখরাজকে দেখবার জন্যেই বেঁচে থাকি।"

আরও দুটো করে সেই খদ্দরী কেক্।

"কি রে পান্না? যাবি চিঠি নিয়ে?"

পান্না এবার পূর্ণকণ্ঠে বললো—"না, চিঠি নিয়ে যাবোনা। যাবো ভাইসাব্‌কে নিয়ে। যাবেন ভাইসাব্? চলুন। ছোটো পথে আমি সন্ধ্যার পরেই পৌঁছে দেবো আপনাকে।"

আমি পড়লাম বিপদে। একদিকে আস্থানা-বিহীন ক্যাম্প। আমি একা দুর্গমের যাত্রী। ছেলে-ক'টা পলাতক। এদের ছেড়ে দিয়ে আমার এগিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে যাবার লোভ, সঙ্গের লোভ, মেলার লোভ, অভিজ্ঞতার লোভ।

বিক্রম বিপদ বুঝতে পেরে বললো—"প্রিন্সিপল-সাব্, আপনি চলে যান। ক্যাম্প আমরা ঠিক রাখবো। কাল আপনি দশটার মধ্যে ফিরে আসবেন। ওদের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। আপনার যাওয়া উচিত। আমরা ক্যাম্পে খবর দেবো।"

কেশব বললে—"আর আপনার জীবন যদি বিপন্ন হয়, প্রিন্সিপল-সাব্?"

পান্না শুনছিল। হঠাৎ বললো—"আমি তার জামীন।"

মেয়ে এই কথা বলে! কেশব থেমে গেল। আমার ইচ্ছা ছিল কেশবকে সঙ্গে নিই। কিন্তু ঐ পথে ফিরে যেতে হবে ওদের। ওরা কেশবকে কিছুতেই ছাড়লোনা।

অগত্যা আমি ওদের খানিকটা এগিয়ে দিলাম।

চা আর রুটি খেয়ে তখন আমরা অন্য মানুষ। ওরা হাত নাড়তে নাড়তে ওপরে চলে গেল। আমি আর পান্না নীচের পথ ধরলাম। আমার গায়ে বুড়োর দেওয়া একটা দোহারা পাহাড়ী লুঙ্গি। পান্না আবার সেটা পাহাড়ী কায়দায় বেঁধে দিলো। কোমরটায় একটা লম্বা কম্ফর্টার দিয়ে বাঁধন দিলো। মাথায় একটা পাহাড়ী টুপি দিলো আর হাতে একটা গাদা-বন্দুক আর লাঠি। একেবারে পাহাড়ীর সাজ হয়ে গেল। আয়না থাকলে দেখে নিতাম। ওরা সঙ্গে থাকলে শট্ রাখতাম একটা।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই পাহাড়টার খাদের তলায় গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। এরপর একটা ঝরনা থেকে জল খেলাম। তারপর চড়াই আরম্ভ হোলো। বেলা তখন সাড়ে-চারটে।

যতই চেষ্টা করি—পান্নাকে ধরতে পারিনা। ও এগিয়ে যাচ্ছেই। ওর অল্প বয়স। প্রাণশক্তি প্রচুর। তা ছাড়া এই পাহাড়ের বুকেই মানুষ। আমি পারবো কেন ওর সঙ্গে? কিন্তু সে-কথা নয়। ইচ্ছে করলে তো আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতেও পারতো। আমায় ও এড়িয়ে চলেছে। এর সঙ্গেও ভার্মা-সিন্‌হার অতর্কিত আক্রমণ ও পশুবৃত্তির প্রতিক্রিয়া রয়েছে। মনটা যেন ভারি হয়ে উঠলো। আমি যেন ভার্মা-সিন্‌হা জাতের পশু। ও আমায় তাই পরিহার করে চলেছে সযত্নে।

পারবো কেন এই আত্মগ্লানিকে তুচ্ছ করে পথ চলতে। বেশ গভীর বনের তলায় একটা ঝরনা ঝরঝর করে বয়ে যাচ্ছে। বিরাট দেহ নিয়ে একটা পাথরের উৎপাত উবু হয়ে আছে জায়গাটার ওপর। মাথার ওপর ঝুলে আছে। ওপরপানে তাকালে মনে হয় এখুনি পড়বে ঘাড়ে। খণ্ডগিরিতে হাথীগুম্ফার কাছে এমনি একটা জায়গায় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ লোহার থাম দিয়ে মজবুত করে রেখেছে। গা বেয়ে-বেয়ে জল চুইয়ে পড়ছে, ছাতটা তাই শ্যাওলা-ভরা। যেখানটা দিয়ে হাঁটবো সেটাও শ্যাওলায় ভরতি। একটু অসাবধান হলেই

আছাড় খেতে হবে এবং গড়াতে হবে অনেকটা। ভয়ের জায়গা, তবু যেন রোমাঞ্চকর।

মনে পড়ে যায় *Kubla Khan*-এর সেই লাইনগুলো—

*'A savage place ! as holy and enchanted*
*As e'er beneath a waning moon was haunted*
*By woman wailing for her demon-lover !*
*And from this chasm, with ceaseless turmoil seething,*
*As if this earth in fast thick pants were breathing,*
*A mighty fountain momently was forced :'*

আমার দেরি দেখে পান্না পেছল জায়গাটার ওপারে গিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালো। চক্ষে হাসি নেই, সংকেত নেই, ভরসা নেই, এমনকি শুষ্ক অপেক্ষাও নেই—যা পথবাহী সহচরের চক্ষে থাকে। এই অপরিসীম ঘৃণার সান্নিধ্যে চলতে মর্মে মর্মে অপমানিত বোধ করছি। বাধ্য হয়েই বোধহয় পান্না বললো—"আপনার কষ্ট হয় আপনি গাঁয়ে ফিরে যান। আপনার বন্ধুদের খবর আমি আজ রাতেই এনে দেবো।"

আমার কষ্ট হওয়া-না-হওয়ার কথাটা সদম্ভে এড়িয়ে গিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম 'বন্ধুদের' কথাটার ওপর। আমি বললাম—"বন্ধু ? বন্ধু আমার কে ? ওরা ?" আমার কণ্ঠে কী সুর বেজেছিল জানিনা ; কিন্তু ও যখন মুখ ফিরিয়েই আবার চলতে আরম্ভ করে দিল তখন ওর চোখে যেন ঝলক দেখলাম।

আমি যতক্ষণে সেই পিছল পার হয়েছি ততক্ষণে পান্না আমায় প্রায় এক মাইল পেছিয়ে ফেলে গেছে। ওকে ধরার আশা করা বৃথা। চড়া খাড়াই আর যেন ভাঙতে পারিনা। কিন্তু একটা কিশোরী অবলীলাক্রমে যা পারছে তার সামনে মাথা নীচু করে নিতেও যে পৌরুষের বাধে সে পৌরুষাভিমান তখনও জরাগ্রস্ত হয়নি। চলছি ঠোঁটের ডগায় প্রাণবায়ুকে চেপে ধরে, বুক হাপর টানছে কল্‌জের আগুনের তাপ ঠিক রাখার জন্য। আর পারছিনা যেন। তবু চলেছি।

হঠাৎ একটা ঢাল পেলাম, অনেকটা ঢাল ; একেবারে ছবিতে দেখা তিমি-মাছের পিঠের মতো। মাঝখানটা ছোট ছোটো চক্‌চকে গাঢ় সবুজ ঘাস। চারপাশটায় লম্বা লম্বা পাইন। হঠাৎ দেখলে, বাংলাদেশের গ্রাম্যস্কুলের ফুটবল-মাঠের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তখন কিছুই উপভোগ করতে

পারছিনা। পাইনের বর্ডারের ধারে পৌঁছেই টাল খেয়ে পড়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ কেন জানিনা জ্ঞান হারালাম। এটুকু মনে আছে, লোভ হওয়া সত্ত্বেও পান্নাকে ডাকিনি।

জ্ঞান হতে দেখি পান্না পাতায় করে জল এনে মুখে চোখে দিচ্ছে। আমায় ডাকবার, জাগাবার চেষ্টা করছে। হাল্‌কা একটা শব্দ কানে আসছে। আর আসছে ডাক: "বাবুসাব্‌ ওঠো, জোরে না চললে মেলায় আজ পৌঁছানো যাবেনা। এই বনে রাত কাটাতে হবে। ওঠো তুমি, ওঠো—"

উঠতে তখন আমি পারতাম। কিন্তু লজ্জায় উঠতে পারছিনা। ছি-ছি, জ্ঞান হারালাম! এমন কি পরিশ্রম করেছি?

পান্না হাসছে। "দাদু তোমায় যেভাবে বেঁধে দিয়েছে, আমরাই ভির্‌মি যেতাম; ওঃ, পাহাড়ী লুঙ্গি, দোহারা তাও জড়িয়ে বাঁধা তোমার এই চামড়ার পোশাকের ওপর। ভেতরটা যেন আগুন হয়ে ছিল। কী ঘাম! সব এই ওড়না দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমার চামড়ার পোশাকের বোতাম দিতে পারিনি।"

আমি ম্লান হাসি হেসে বলেছিলাম—"বড়ো কষ্ট দিলাম তোমায় বোন্‌! আমি এখন সুস্থ। চলো—"

আমার মাথা ওর কোলে। ও মাথাটা চেপে বললো—"একটু আরও বিশ্রাম করো। তারপর চলবো। আমি নীচে নেমে জল নিয়ে এসে একটু পরিশ্রান্ত হয়েছি।"

ওর কোমল মনটির মাঝে কতখানি ভদ্রতা যে বাসা বেঁধে আছে এই স্বীকৃতিতে বুঝতে পারলাম।

"এতো নরম মন তোমার পান্না, অথচ লেখরাজকে কষ্ট দিচ্ছ তো?"

"জানি, দাদু তোমায় সব বলেছে, ভাইসাব্‌। আমি জানি, দাদু যাকে ভালবাসে তাকেই আমার কথা বলে। তোমার আসার অনেক আগে মাঙ্গারামের কাছে দাদু তোমার কথা শুনেছে। আশেপাশের অনেক গাঁয়ে তোমার কথা গেছে। দাদু তোমায় দেখেই আমায় পাঠালো। কিন্তু যত পণ্ডিতই হওনা কেন বাবুজী, লেখরাজকে চেনোনা। সে চাবুক নৈলে ঠিক থাকেনা।"

"চাবুক বুঝি দূরে বসে চুপ করে থাকায় ?"

"তোমার ঘোড়া-চড়ার ওস্তাদির খবর শুনে আমরা কতো হেসেছি। মাঙ্গারাম ঘোড়া নিয়ে প্রায়ই আসে কিনা ? ঐ ওস্তাদি নিয়ে চাবুকের রহস্য তুমি জানবে কি করে ? যত দুরন্ত ঘোড়া ততো লম্বা চাবুক, যত লম্বা চাবুক ততো দূর থেকে মারতে হয়।"

"যদি ছিটকে বেরিয়ে যায় ঘোড়া ?"

পান্না উঠে দাঁড়ালো। এবার দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগলাম। এখন যেন বেশ সুস্থ।

কথা চালিয়ে রাখার জন্য বললাম—"বললেনা, বোন—ঘোড়া ছিটকে গেলে কী করবে ?"

জ্বলজ্বল করে উঠলো সেই স্তিমিত চোখ। যেন যে ছুরির বাঁটটা দেখছিলাম এতক্ষণ, সেই ছুরিরই ফলা দেখলাম। যে মেঘের ঘনঘটা দেখছিলাম, তাতেই দেখলাম বিদ্যুৎচমক। "লেখরাজ আমার শিকার-করে-পাওয়া বুনো হরিণ। অনেক গভীর জঙ্গলের মধ্যে অনেক হায়রানির পর তীর মেরে জিতে নিয়েছি ওর মুহব্বৎ ( প্রেম )—পাহাড়ী রীতিতে একের শিকার অন্যে ছোঁয়না, যদি সে নিজে ভাগ না দেয়। লেখরাজ !—জানো ভাইসাব, লেখরাজের ওপর যদি আমার জোর না থাকতো তো ননদ আমার কে ? ভালবাসা দিয়েই ভালবাসা চেনা যায়, জান্ দিয়ে জান্, মুহব্বৎ দিয়ে মুহব্বৎ।"

হাল্‌কা নয়, বেশ জোরে শব্দ আসছে ঢোলকের। আমি বুঝতে পারছি মেলার কাছাকাছি এসেছি। বললাম—"শব্দটা কি মেলা থেকে আসছে, না ?"

"—হ্যাঁ।"

"এতো তাড়াতাড়ি এসে গেলাম ?"

"ছোটো পথে এনেছি। তা ছাড়া কম ছুটেছো তুমি ? অন্য কেউ দেখলে ভাবতো আমায় ধরার জন্য ছুটছো। আমি পাহাড়ী মেয়ে, একটা বাঙালীবাবু আমায় পাহাড়ের পথে এগিয়ে যাবে, সেই লজ্জায় আমি যতই ছুটি, তুমিও ততই ছোটো। আমি নিজেই প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। ভাগ্যি তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়লে, তাইতো একটু জিরিয়ে বাঁচলাম।"

"বলো কি! অথচ আমায় তুমি ডিঙিয়ে যাচ্ছো সেই লজ্জায় আমি মরিয়া হয়ে তোমার পিছু নিয়েছি। নৈলে কখন তোমায় ডেকে থামাতাম।"

দুজনেই হাসছি।

"তা ব'লে খুব কাছে নয় মেলা! পাহাড়ের গায়ে এমন কাছাকাছি শব্দ হলেও, ঘণ্টাখানেকের পথ আরও।"

যখন মেলায় পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। শেষের পথটুকু অন্ধকারেই এসেছিলাম। গ্রামের নাম 'বালী'। গ্রামের উপান্তে একটা তেমাথায় একটা ঝরনা। সেই ঝরনার ধারে পাথরের মন্দির। গায়ে রাখা বহু-পুরাতন সিঁদুর-লিপ্ত একখানা চৌকো পাথর। তার গায়ে লেখা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—সেটাই ওরা দেবীর পট ব'লে পূজা করে। ভিতরে একটা পাথরের সিংহ এবং একটা দেয়াল-ঢাকা লাল কাপড়। সেই কাপড়ের পিছনে একটি ছোটো তাক-গোছের। তার ওপর কেবল কর্পূর জ্বালানো হচ্ছে। তাকটার আশেপাশে সর্বত্র সিঁদুরের ছড়াছড়ি।

এইখানে আমি আমার জীবনের একটা স্মরণীয় রাত্রি যাপন করি। আজও আমি সেই রাত্রির বহু রহস্য ভেদ করতে পারিনি। কখনও পারবো ব'লে বোধ হয়না। সেই রহস্যলোকের কথা বলার আগে ছোটো একটা কথা সেরে নেবো।

পান্নাকে এতক্ষণ আমরা অনেকটা চিনেছি। ভ্রমণ-কাহিনীতে হঠাৎ-পাওয়া মেয়ের মতো এই পান্নাও হঠাৎ আমার এই কাহিনীর মধ্যে মিশে গিয়েছিল অকারণে; অকারণেই, সম্পূর্ণ অবান্তর ঘটনা-বিন্যাসে লেখরাজ-টিক্‌লির কথা এই কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে পড়লো। তাই পান্নার নাম করে ক'টা কথা এইখানে লিখে পান্নাকে আর লেখরাজকে ভুলে যাবার চেষ্টা করবো আমরা এই কাহিনীর বাকী অংশে। পথে পাওয়া পরিচয়—পথেই ছড়িয়ে দেবো।

মেলায় লেখরাজ এসেছিল। আমায় এসে সহজ প্রণাম করে দাঁড়ালো সুদর্শন ছেলেটি। চমৎকার আভিজাত্যপূর্ণ সুগঠিত অবয়ব। সে-ই জিজ্ঞাসা করলো—"আপনার সঙ্গে পান্নাকে দেখেছিলাম, সে কৈ?"

আমার কী হোলো। আমি চমকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কি লেখরাজ?"

তখন রাত্রি। মন্দিরের মধ্যে স্তিমিত দীপশিখা। তবু বুঝলাম চঞ্চল হয়েছে যুবক। "তা হলে আপনিও জানেন আমার কথা।...কৈ সে?"

"জানিনা তো। এইতো ছিল।"

ওরই গাঁয়ের একটি মেয়ে বললে—"ও চলে গেল গাঁয়ে।"

"এই রাতে?"

"হ্যাঁ। লেখুকে দেখেই ও চলে গেছে। আমায় ব'লে গেছে ভাইসাব্‌কে নিয়ে যেতে।"

চম্‌কে আমি উঠে দাঁড়ালাম। পরাজিত, বিধ্বস্ত সেই যুবক-মনের সমগ্র গ্লানি ও শোক যেন আমায় গ্রাস করলো। আমি বললাম—"না, তা হতে পারেনা। এখুনিই তো সে গেছে। কতদূরই সে গেছে? আমি যাচ্ছি তাকে ডেকে আনবো।"

লেখরাজ আমার হাত ধরলো। বললো—"আপনি জানেন না পান্নাকে। যদি সে সত্যি ফিরে যাবার মন করে থাকে, তাকে মৃত্যু ছাড়া কেউ ধরতে পারবেনা। আমি একবার দেখতাম তাকে। খাটছি, ভাইসাব্‌! আর ছ'মাস খাটলেই টিক্‌লিকে আমি বাঁচাতে পারবো। তখন পান্নাও আসবে। ততদিন পান্না আসবেনা। তার প্রতিজ্ঞার বড়ো দাম।"

বুঝলাম, প্রশংসা করলেও, অভিমানে সেই পাহাড়ী যুবকের বুক ভেঙে যাচ্ছিল। আমি সান্ত্বনা দেবো সে-ভাষা আমার ছিলনা। পান্নার কথা এইখানেই শেষ। পান্না যদি জোর না করতো, টিক্‌লির প্রেমকে কে সম্মান দিত? তাইতো বার বার বলি, polygamy বা polyandry সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গ। ব্যক্তিগত জীবনের বন্ধনের সীমা নির্দেশ কে কবে করে দিতে পেরেছে? দশরথেরই তো চার রানী ছিলো। অথচ রাম তো কৈ সীতাকে ছেড়ে অন্য পত্নী ধার্মিক প্রয়োজনে বা গুরুর নির্বন্ধেও গ্রহণ করেননি। মন্দোদরীর বা তারার দ্বিতীয় বিবাহানুষ্ঠানে যিনি যোগদান করেছেন তাঁর চোখে তো সীতা-বিরহ-অশ্রু এতটুকু বেমানান হয়নি! পান্না-টিক্‌লির কথাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য পাহাড়ী polyandry। মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করবে ততদিন, যতদিন সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার উর্ধ্বে থাকবে মানবের ব্যক্তিগত পরম জীবন, যেখানে সে একা একা থাকে সমাজের বাইরে।

আমার প্রথম সন্ধান সিন্‌হার জন্য। এর খবর যাঁর কাছে পেলাম তিনি ঐ মন্দিরে পূজারিনী 'দেবীমাঈ'। এঁর সঙ্গে ছিলাম কয়েকঘণ্টা। রাত্রির মধ্যযাম পর্যন্ত। তারপরেই আমি বাগী থেকে ফিরে আসি খাদরালায়।

যখন খাদরালায় পৌঁছাই তখন ভোরের আলো দেখা গেছে পূর্বের শিখরগুলির ওপর। সিন্‌হাদের কথা পরে বলবো। এখন বলবো সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা, যার প্রতি বর্ণ আজ মনে করলেও ভয়ে বিস্ময়ে গা শিউরে ওঠে। সেই ভয়ঙ্করী দেবীমাঈ আমায় বার বার নিষেধ করেছিলেন সে-কথা কারুকে বলতে, বা জানাতে। তাতে নাকি আমার ভয়াবহ ক্ষতি হবে। তখন মনে হয়েছিল কারুকে বলবোনা। কিন্তু আজ বলবোই। বামাক্ষেপার তারা-রুদ্রপীঠ আর বালীর সেই সিদ্ধপীঠ এক কিনা আমি জানিনা, কিন্তু ভীষণ সে-অভিজ্ঞতা, অতি ভীষণ।

*

প্রথমেই জানলাম ওরা প্রমত্ত অবস্থায় কোথাও বন্দী। এবং ওদের মুক্তির ভার দেবীমাঈর। কে এই দেবীমাঈ? তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতে যেতে হবে।

মন্দিরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এরই মধ্যে লেখরাজের আগমন, পান্নার অন্তর্ধান ইত্যাদি। বাইরে জোর মেলা চলেছে। হিমাচল-প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ নাচের হর্‌রা চলছে—সঙ্গে শিঙা, বাঁশী ও ঢাক বাজছে। বড়ো বড়ো মশাল জ্বেলে দোকানীরা খাবার বেচছে; বেচছে পশম, নুন, তেল আর কাপড়। বেচছে আয়না, ছুঁচ, পুঁতি আর সেলুলয়েডের চুড়ি-বালা এইসব। বেচছে কানের গহনা, চুল-বাঁধার ঝুম্‌কো ফিতে, ক্যাম্বিসের জুতো আর চা। দেশী-বিদেশী কত জিনিস, মুর্গী থেকে মোষ—কত পশু, শিকার-করা পশুর ছাল আর গাছ-গাছড়ার ওষুধ। সবই আছে। সাধু-সন্ন্যাসী আছে, যাদুকর আর দাঁতের ডাক্তার, চশমাওলা আর ফটোগ্রাফার—এরাও আছে। এরা একটা বড়ো দল। সব মেলাতেই ঘুরে বেড়ায়। মশালে মশালে জায়গাটা লাল হয়ে আছে। মানুষরা সব চলাচল করছে—যেন শ্মশানে প্রেতদল চলছে—নাক, কপাল, চিবুক—একটা পাশ লাল, চক্‌চক্ করছে, অন্যদিকটা অন্ধকার কালো। আর সবটা জড়িয়ে ধোঁয়ায়, কোলাহলে, নানা গন্ধে ও বীভৎসতায় মেলার জমক বেড়েছে একেবারে ষোলোকলায়।

এরই মধ্যে বসে সেই দেবীমাঈর জন্য। কে একজন বললে, তিনি এখানে আসবেন ঠিক রাত একটায়। তার আগে দেখা করতে গেলে তাঁর গুহায় যেতে হবে।

বুজরুকির সবটুকু আছে টের পেয়ে কৌতুক বোধ করলাম। পাথরের চাঁইয়ে 'মণিপদ্মে হুঁ' আছে, তার সামনে কর্পূর জ্বালানো আছে, সিঁদুর, কাজল, ত্রিশূল—সব। মধ্যরাত্র আছে, আবার গুহাও আছে। দেবীমাঈ অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মন্দিরের বাহিরে প্রকাণ্ড এক যূপকাষ্ঠ। সকাল হতে বহু বলি হয়ে গেছে। রাতেও হবে। সেজন্য মোষ, ছাগল সবই বাঁধা আছে।

রাত একটা অবধি শুধু অপেক্ষা করবো, সে চলেনা। লেখরাজ আর পান্নার রেখে-যাওয়া সেই মেয়েটা, নাম ভুলে গেছি, ডিম্পি বলবো, তখনও মন্দিরে বসে। তাদের দিকে চাইলাম। মন্দিরে অনবরত লোক আসছে, কর্পূর-আরতি করছে; ভোগ চড়াচ্ছে, চলে যাচ্ছে। পাণ্ডার বদ্‌লি যে-লোকটা ব'সে, তাকে যদি মদের ভাঁটিতে বা আদালতের সামনের রোয়াকে—বটতলায় দেখতাম বিস্মিত হতাম না। ঘর ধোঁয়ায় ভরতি। লেখরাজ বললো—"যেতে চান, নিয়ে যেতে পারি।"

"যেতে আমায় হবেই। আমি মেলা দেখতে আসিনি। আমাদের দলের নিয়ম মেনে চলতে হয়। ক'টি ছেলে নিয়ম ভেঙে চলে এসেছে, তাদের কড়া শাসন করবার জন্য এসেছি। তাদের নিয়ে আমায় আজই ফিরতে হবে, কাল কাজে লাগতে হবে তাদের।"

লেখরাজ আমায় নিয়ে মেলার মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলো। রাতে মেলার ভীড় কমলেও, মদের ভাঁটির সামনে ভীড়। মাংস-পোড়া, ঝল্‌সানো আপেল আর মটর-আলুর চাট বিক্রি চলছে। আর চলছে নাচ, বড়ো বড়ো ঢোলকের সঙ্গে। অনেক ধরনের নাচ। ছেলেমেয়ে মিলে নাচ দেখলাম না। মেয়েরা বেশী উল্লাস করে নাচছে। তাদের নাচের মধ্যে প্রাণের চেয়ে মাংস বেশী, রসের চেয়ে দেহ বেশী, গানের চেয়ে চিৎকার বেশী। এগিয়ে চলেছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শিরশিরে বাতাস দিচ্ছে। লাঠি হাতে, বন্দুক কাঁধে এগিয়ে যাচ্ছি। জনতা আমায় বুঝতে পারছেনা বিদেশী ব'লে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে একটা নির্জন অন্ধকার গিরিপথ দিয়ে চলতে চলতে একজায়গায় লেখরাজ দাঁড়ালো। ডিম্পি এগিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। দাঁড়িয়ে রইলাম এক দুই তিন ক'রে ক'রে প্রায় পনেরো মিনিট। এবার ডিম্পির হাতে একটা মশাল, সঙ্গে একটা পাহাড়ী পুরুষ। আসতেই বললো—"চলুন, দেবীজী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন; কিন্তু অল্পক্ষণ।"

Rider Haggard-এর লেখা *She* পড়ার পর এমন একচ্ছত্র অপ্রতিহত ক্ষমতা কোথাও দেখিনি, এমন রোমাঞ্চকর পরিবেশে। সেই নারী, সেই আদিম-মানব-সুলভ উদ্দামতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বীভৎসতা।

খাড়াই উঠে একটা গুহার ছোটো মুখ। প্রায় গুঁড়ি মেরে খানিকটা গিয়ে বিরাট গহ্বর। গুহাটার গায়ে তিন-চারটে মশাল গাঁথা। গুহাটার ভেতরে অন্ততঃ ১,০০০ বর্গফুট জায়গা।

ভিতরে বাঘের ছালের ওপর যিনি ব'সে তাঁর বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ তো বটেই। মাথায় জটার ভার। গায়ে গলায় রুদ্রাক্ষ। পরনে কৃষ্ণাজীণ। বুকের ওপর রুদ্রাক্ষের আর শঙ্খমালের স্তূপ ছাড়া কিছু নেই। সারা কপাল সিঁদুর আর কজ্জল লিপ্ত। চোখ-দুটো দপ্‌দপ্ করছে। বেশ বোঝা যায়, গাঁজার নেশায় টলমল। গাঁজার কড়া গন্ধ আমার নাকে ঢুকেছে অনেকক্ষণ।

আমি প্রণাম করিনি দেখে লেখরাজ বললে—"ইনি দেবীমাঈ, কালীর মন্দিরের সত্যিকারের দেবী।"

দেবীমাঈ বললেন—"উনি বাঙালী, তন্ত্রের দেশের লোক। কালীঘাটে, কামাখ্যায় ওঁর মাথা নেমেছে। এখানে নামবে কেন। তুমি ওদের সঙ্গে সকালে আসোনি কেন?"

কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ আমার সহ্য হচ্ছিলনা।

আমি যতটা সম্ভব খাদে জিজ্ঞাসা করলাম—"ওরা কোনও বেয়াদবি করেনি বোধহয়?"

একটা চিমটে নিয়ে সামনের ধুনিটা নেড়ে দিয়ে বললেন—"কোরতো। আমি করতে দিইনি। করবেই বা কী, ওরা তো ছেলেমানুষ, প্রকৃতির কতটুকু জানে। প্রকৃতি দেখলেই উন্মাদ হয়। শঙ্করও হয়েছিলেন। পরমপুরুষ নির্বিকার। প্রকৃতি তার বিকার ঘটায়। তাই প্রকৃতির পূজা। তাই প্রকৃতির লীলাকেন্দ্র। এদের নিয়ে যদি খেলায় না মত্ত থাকবে তো, পরমা-প্রকৃতির শ্মশানে ভূতপ্রেত-ডাকিনী-শাকিনীর নৃত্য চলবে কাদের দিয়ে। আমরা সবাই যে কঙ্কাল এ-বোধ আমাদের ক'জনের আছে! তোমারই কি আছে?"

আমি নির্বাক হয়ে এই অসংলগ্ন বাক্যস্রোতকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছি।

একটু থেমে বললেন—"তোমার তো শ্লাঘা অত্যধিক। নিজেকে নিয়ে

নিজে প্রমত্ত। ছিন্নমস্তার ভৈরব। তোমায় সময়ে পেলে অনেক কাজে লাগাতাম। তুমি এদের বাঁচাতে এসেছো। জানো কি, কী থেকে বাঁচাতে এসেছো?"

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার শরীর কেমন যেন হাল্‌কা হয়ে আসছিল। আত্মপ্রত্যয় কেমন যেন খসে পড়ছিল মন থেকে। অজ্ঞান অচৈতন্য নয়; তবু যেন আস্থাহীন, ইচ্ছাহীন, গতিহীন একটা সজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থা।

"বাঁচাতে আমি ওদের আসিনি, বাঁচাতে এসেছি নিজেকে, নিজের মানকে, আর সেই মানকে জড়িয়ে একটা মহৎ উদ্দেশ্যের মানকে।"

"মান! অভিমান, অপমান, সম্মান, প্রমাণ, অনুমান, নির্মাণ, পরিমাণ— একটা একটা উপসর্গের খোঁচাতেই মানের মান কোথায় পালায়। তোমার তিনটে উপসর্গ। কী ঠুন্‌কো মান তোমার। সত্যি করে বলোনা, সুন্দরীদের সঙ্গে মেলামেশা করার ভয়কেই তোমার ভয় বেশী, তাই নয়?"

আমি হতভেজ হয়ে বললাম—"সেটা কি এতই তুচ্ছ?"

"তুচ্ছ? তুচ্ছ কে বলে? ভয়ের শক্তি কি কম? কালভৈরব সৃষ্টি হোলো ভয়কে শক্তিমান করার জন্য। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সবাই ভয়ে চলে। উপনিষদ পড়োনি? খুব তো 'পড়িয়ে' ব'লে অহঙ্কার তোমার। আমার পঞ্চাশবছর বয়স এই গুহায় ঢুকেই বুঝে ফেলেছো! ভয়কে তুচ্ছ করবো? ভয়কে ভয় করিনা, ভীতুকে ভয় করি। বিষকে ভয় করিনা, সাপকে ভয় করি। বিষ তো পান-ই করি অহরহ।" ব'লেই একটা হাড়ের বাটি থেকে খানিকটা মদ খেলেন। "কিন্তু এইগুলোর ভয়ে আমি মরি।" লক্ষ্য করে দেখলাম রুদ্রাক্ষের ভিতরে এবং জটায় গোটা-তিনেক সাপ।

"তবে ওদের রেখেছেন কেন?"

"তোমায় গুহায় ঢুকতে দিলাম কেন? সাপকেও বশে আনা চাই। তোমার অখণ্ড অহংকে নিয়ে খেলা করতে আমার বিলাস। এই-যে পীঠ দেখছো, এটা এক-যোজন-ব্যাপী। এখানে মহাদেব গড়াগড়ি খান সতীর শোকে। জ্বালামুখী থেকে তারাদেবী পর্যন্ত এই মহাপীঠ একটা মহাশ্মশান। তার নাভিকেন্দ্র ঐ তাকটা, রাঙা কাপড়ে ঢাকা ঐ তাকটা, যাতে কর্পূর জ্বলছে দেখে তোমার মনে হাসি-বিদ্রূপ আর ধরেনা। যার সেবায়েতকে দেখে তুমি

সাহিত্যিক রসে ভরপুর। ভাঁটিখানার মালিক, আর উকিলের দালাল! ঐ ভাকটা আর ওরই মতো ভৈরব এই শ্মশানকে জীবন্ত করে রেখেছে।"

আমি মনের শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে বললাম—"আপনার চেয়েও ভালো 'thought-reading'-এর গুণী আমার দেখা আছে কাশীতে।"

"হ্যাঁ, তুমি সিদ্ধপুরুষ জিতেন-সাধুর কথা বলছো। তিনি তোমায় ভালবেসেছিলেন—ছেলেমানুষ ছিলে, ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করতে, সরল মনে নারায়ণ-গঙ্গাকে ভালবাসতে। ভালবাসার সামগ্রী ছিলে। এখনও তো তোমায় দেখে আমার কত আনন্দ। সংসার তোমায় বাঁধেনি। তোমার নিজের বন্ধনেই তুমি জড়িয়ে পড়েছ বেশী। নৈলে ভালবাসার জিনিস তুমি।"

আমি বিহ্বল হয়ে চিৎকার করে বললাম—"আপনি মায়া জানেন!"

খল্‌খল্‌ করে হেসে ভৈরবী বললেন—"মায়া! মায়া জানি। মায়াই যদি জানতাম, তোমায় আমি বেঁধে রাখতাম। জানিনা মায়াই। আর সব জানি! জানি তুমি ওদের খুঁজতে আসনি, এসেছো তোমার ক্ষুধার্ত চিত্তকে নিরস্ত করতে। ওরা কোথায় জান?"

"শুনেছি আপনি বেঁধে রেখেছেন।"

"হ্যাঁ। দেখবে?"

"শুধু দেখবোনা, ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।"

"বেশ, তাই যেয়ো। দেখি তোমার হাত।"

ডিম্পি আর লেখরাজ গুহার মুখে বসে আছে। দু-চারজন আরও লোক এদিক ওদিক। ধুনির ওপারে ভৈরবী, এপারে আমি। হাতটা আগুনের একপাশ দিয়ে বাড়িয়ে দিলাম আমি।

তৎক্ষণাৎ হাতটা সোজা ধুনির ওপর দিয়েই টেনে ধরলেন এবং অনেকটা সিঁদুর মাখিয়ে দিলেন হাতের তেলোয়।

আশ্চর্য! আগুনের শিখার মধ্য দিয়ে হাত প্রসারিত, একটু আঁচ লাগছেনা হাতে। সিঁদুর লেপা হয়ে গেলে বললেন—"চেয়ে ছাখো তো হাতে।"

মাথা আমার ঘুরে গেল। যেন টাল খেতে গিয়ে সামলে নিলাম। পাইন-বনের ধারে আমি অজ্ঞান হয়েছিলাম আজই বিকেলে।

হাতের মধ্যে দেখি ওরা তিনজন একটা ঘরে বসে তারস্বরে গান গাইছে। আর কেউ নেই। সামনে রুটি আর মাংস। এবার ওরা খাবে। ওদের মুখে অসীম তৃপ্তি আর আনন্দ। কিন্তু ওরা প্রকৃতিস্থ নয়। হয় আনন্দে পাগল, নয়তো মদে পাগল।

আমি কাতর হয়ে ভৈরবীর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন—"ওরা আজ যাবে এ ভরসা নেই। তবে চাও তো যেতে পারবে। কিন্তু কেন? ঐ-যে কিশোরটিকে দেখছো, ও এককালে প্রখ্যাত কবি হবে। ওর মধ্যে প্রকৃতির লীলা অপরূপ হয়ে উঠবে। আর বাকী দুটো তাল-বেতাল। শ্মশানের মড়া প্রাণ পেয়েছে।"

"কিন্তু আপনি যখন সব জানেন…"

আমার কথা শেষ হোলোনা, তিনি বললেন—"হ্যাঁ, সেই স্যাকরার কথাও জানি। স্যাকরাটাই তো অবিদ্যা। তাকে দেখবে?"

হাতের দিকে তাকাই। স্যাকরাটাকে আগে দেখিনি। দেখলাম সারা গায়ে ক্ষত নিয়ে একটা লোক বসে বসে একটা যুবতীর বক্ষ থেকে স্তন্যপান করছে। যুবতী পরম তৃপ্তিভরে শুয়ে আছে।

আমি এবার চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালাম—"একি বীভৎসতা! আপনি আমায় কি বিভ্রান্ত করে দেবেন?"

আবার সেই অট্ট-অট্ট হাসি। "ঐ ক্লেদাক্ত লোভ ও কামকেও প্রকৃতি তার স্তন্য দেয়। ঘৃণ্য কেউ নয় এই মহাপীঠে। মহামায়ার সন্তান সবাই। আমি স্যাকরাকে তাই আলাদা রেখেছি। ওর শরীরে ব্যাধি। তবু ওরও মা আছে। জানবে, প্রতিহনন করা মায়ের ধর্ম নয়। মা যে সকলকে বুকে টানবেন। রোগ, জরা, মৃত্যু—সবসুদ্ধ বুকে টানবেন।"

একি কথা শুনছি? এই কি হিমালয়? কোনও অহঙ্কার, কোনও পাপ, কোনও অন্ধতা কি এই মহামহিমময় দেবতাত্মার কন্দরে টিঁকবেনা?

ভৈরবী বললেন—"তোমার তো অবাক হবার কথা নয়, বাবা। তুমি বাঙালী; তোমাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন ব্রহ্মানন্দ গিরি, রামকৃষ্ণ, ভোলা গিরি, বামাক্ষেপা। বাংলাদেশটাই মহাপীঠ; বীরাচারের দেশ, বীরভূমি। দেখনি আচণ্ডালকে কোল দিতে শক্তি-উপাসক চৈতন্যকে? দেখনি কুকুর-শেয়ালের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে বামাকে? এই তো তন্ত্রের বীজ। শ্মশানকালীর

নিত্যকালের নাচন প্রমথদের নিয়ে—কারো হাত নেই, কারো মাথা নেই, কারো পেট নেই—কত কদর্য, বীভৎস, অসম্ভাব্যকে নিয়ে। তুমি কে? কেন তোমার এত শ্রম? নিজের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও। কতদিন ধরে রাখবে?"

আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলাম ভৈরবীকে। তিনি তাঁর ত্রিশূলটা দিয়ে আমার পিঠে একটা দাগ কেটে দিলেন।

হঠাৎ জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান হতে দেখি আমি সেই কর্পূর-প্রজ্বালিত মন্দিরে। লেখরাজ ও ডিম্পি নেই। আছেন ভৈরবী আর একজন লোক—যাকে চিনিনা।

আমি জাগলাম যেন। তখন অসীম স্ফূর্তি, অসীম বল। মন আনন্দে ভরপুর। নিস্তব্ধ নিথর রাত্রি। হাতঘড়িতে রাত ঠিক একটা। মেলার শব্দ ক্ষীণতম।

ভৈরবী বললেন—"কারুকে বোলোনা এসব কথা। বিশ্বাস করবেনা কেউ। আর অবিশ্বাসের পাপ তোমায় স্পর্শ করবে। ক্ষতি হবে তোমার। বই লিখবে তুমি, জানি। কিন্তু পারো তো বাদ দিয়ো।"

"পারবো না"—দৃঢ়কণ্ঠে বললাম।

ভৈরবী বললেন—"সাহস থাকে, লিখো। আমার নিষেধ রইলো।"

আমি সুযোগমতো বললাম—"আমি রামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপার দেশের লোক। ভয়ে মিথ্যাও বলবনা, গোপনও করবোনা। বলবনা একটি কথা।"

"কী কথা?" ভৈরবীর চক্ষে শিশুর কৌতুক।

"জানছেনই তো আপনি। বলবনা আপনি আমায় যা দেখালেন, যা দিলেন, আর যা ভালবাসলেন।"

"হুঁশিয়ার ছেলে! ওরে, সে যে বলা যায়না। ভালবাসার কথা বলা যায়? কেউ পেরেছে বলতে? তুই পেরেছিস?"

আমি বললাম—"আমি এখুনি বেরুবো।"

"এত রাতে? পথ তো জানোনা; যেতে পারবে?"

আমি পরম নির্ভয়ে বললাম—"তুমি আমার মা। আমায় তুমি পৌঁছে দাও!"

"এই লোক তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এর সঙ্গে কোনো কথা বোলোনা। একবারও নয়।"

আমার চাদর, টুপি, লাঠি আর বন্দুক ভৈরবীকে দিয়ে বললাম—"এগুলো ডিম্পিকে দিয়ে দেবেন।"

"আর, বন্ধুদের নিয়ে যাবেনা?"

আমি কাতরকণ্ঠে বললাম—"আমায় আর আঘাত দিয়োনা, মা! আমি একাই ফিরবো।"

প্রণাম করে যখন পথে বেরুলাম তখন আমার ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, অবসাদ নেই। মন ভরে উঠছে গানে। মাথার ওপর মেঘের খেলা, পাইনের দোল, আকাশের স্তব্ধতা। পাশে পাশে বনের গাম্ভীর্য, পাতার শষ্পতা, অরণ্যের পদক্ষেপ। পায়ের নীচে বসুন্ধরার তৃপ্ত স্পর্শ, মনের মধ্যে সুখস্বর্গ। গান আর গান! পূর্ণকণ্ঠে ধরলাম—

"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে
জানিনাই তো তুমি এলে আমার ঘরে—"

এ আমার কী হোলো! যে দুরন্ত খাড়াই নেমে আসার সময় আমি বার বার শঙ্কিত, বিভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত—সেই খাড়াই চড়বার সময়ে এ কী গানের পরে গানে পেলো আমায়! একটা কথা, সেই গোলাপ-ঢাকা উপত্যকা ধারে-কাছেও নেই। নতুন পথ, একেবারে নতুন পথ—অথচ নাকে সেই গন্ধ, সাথে আবার মন্দিরের ভেতরকার গন্ধ। আগে আগে চলেছে জমাট-আঁধার-মন্থন-করা অজ্ঞাত প্রদর্শক। তার পিছু, তার পিছু। কথা কইবনা, তার সঙ্গে চলবো পথ। বার বার প্রশ্ন আসে কণ্ঠনালীকে বিমথিত ক'রে: "বলো, এ পথ কোথায় পেলে? এ কোন্ পথ? 'কঃ পন্থা?' 'Quo vadis?'" কিন্তু নিষেধ-সতর্ক মন কিছুতেই কণ্ঠকে স্বর দেয়না, প্রশ্নকে ভাষা দেয়না। তাই আমার গান এলো—

"যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর—
আর পারিনা যে রাত জাগতে, হে নাথ, ভাবতে অনিবার"...

বাতাস জোর দোল দিচ্ছে রাতের পারাবারকে। অন্ধকারের গভীরে উঠেছে তরঙ্গায়িত বিভ্রম। আকাশে তারাগুলো দ্বীপান্তরের প্রদীপশিখার

মতো মিটিমিটি চাইছে; এই গভীর রাত্রির তরঙ্গে এখুনি বুঝি ভেসে যাবে, নিবে যাবে, ডুবে যাবে। পাইন-বন, পাইন-বন! তোমার দীর্ঘশ্বাসের dirge, তোমার অন্তস্তল হতে উৎসারিত Pindaric Odes, মন্দাক্রান্তার বিলম্বিত রোদনধ্বনি—আমায় আজ পাগল করে দেবে। আমার স্নায়ু যেন তারযন্ত্রের স্পর্শকাতরতা নিয়ে ব্যাকুল;—'মৌনীবীণা ধেয়ায় তোমার অঙ্গুলি-পরশ'—হঠাৎ তাই মনে পড়ে গেল—

> "হে অভিসারিকা তব বহুদুর পদধ্বনি লাগি আপনার মনে
> বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে
> দীপ চাহে তব শিখা, মৌনীবীণা ধেয়ায় তোমার অঙ্গুলি-পরশ
> তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আকুল অন্ধকার সঙ্গ সুধারস।"

'তৃষ্ণায় আকুল অন্ধকার'। এর রূপটি যে কেমন, বোঝা যায়না এই গভীরে ডুব না মারলে। কৃষ্ণা দ্বিতীয়া আজ। রাত এখন দুটো পেরিয়ে গেছে। আকাশের হিম-কাঁপা-তারার সভাতল উজ্জ্বল করে রেখেছে অদেখা চাঁদের জৌলষ। কিন্তু ধরণী সে-আলো থেকে বঞ্চিত। উঞ্ছবৃত্তির মুষ্টিভিক্ষার মতো অরণ্যের এখানে ওখানে মুঠো-মুঠো চাঁদের ধুলো ছড়িয়ে আছে হয়তো, কিন্তু ধুইয়ে-দেওয়া জ্যোৎস্নার তরঙ্গ—সে কোথায়? অরণ্য যে কত গভীর তা আমরা জানি কেবল দু'পায়ে ভেদ করে যাবার ব্যবধান দিয়ে; কিন্তু মাথার ওপরেও যে একটা দুর্ভেদ্য আবরণ অরণ্য রচনা করে তোলে, সে আবরণ যে ধাপে ধাপে শত শত সহস্র সহস্র ফুট উঁচু, উঁচু, আরও উঁচুতে চলে যেতে পারে; সে-অরণ্যের ছাতে ছাতে যে সহস্র সহস্র প্রাণী সংসার পেতে জীবন যাপন করতে পারে—এর অনুভূতি, এর অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় কি করে, যদি না এই কুমারী-অরণ্যের বুকের গভীরের দোলন ধরা যায় নিজের বুকে, যদি না এই অযুতবর্ষীয়া পার্বতী-কন্যার রহস্য-নিকেতনের সৌধচূড়-সংলগ্ন গবাক্ষপথগুলি প্রত্যক্ষ করতাম। এ 'আমি' যে কোন্ 'আমি' তা আমার আর মনে ছিলনা। লোকোত্তর একটা অরণ্যসত্তার একাঙ্গ আমি; মহারণ্য, বিশাল সৃষ্টি অরণ্যের একটা অণুর মতো এই আমার 'আমি'টুকু লেগে আছে যেন তাণ্ডব-মথিত এই সৃষ্টি-সংহার-চঞ্চল অরণ্যজঠরের প্রান্তে। উঠছি, উঠছি; চলছি, চলছি; সম্মুখে পুঞ্জীভূত, ঘনীভূত বিষবাষ্পের মতো শরীরী একটা সত্তা ক্রমশঃ এগিয়ে যায়; আমি পিছু-পিছু। মনে কোটি প্রশ্ন; স্নায়ুতে অযুত

অনুভূতি; অথচ উভয়ের ব্যবধান নীরন্ধ্র নৈঃশব্দ্যে স্তব্ধ। অসহ্য হোলো। এই জ্যোতি-পারাবারের তীরে বসে এই তিমির-বাটিকার মধ্যে আত্মসমাধি। আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হোলো। মনে হোলো, চিৎকার করে বলি: যে শরীরধারী নিস্তব্ধতা, আমার এই গভীরের স্বাধীনতায় ছেড়ে দিয়ে চলে যাও তুমি। পেতে দাও ফিরে আমার নিত্যকার সত্তাকে। অনিত্য এই তীব্র অনুভূতির দহনদাহন থেকে আমায় শান্তি পেতে দাও!—

"কে যায় অমৃতধাম যাত্রী
আজি এ গহন তিমির রাত্রি,
কাঁপে নভজয় গানে।"

তাই গান ধরলাম ব্যাকুল অসহায়তায়—

"চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে
অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে"…

মাথার ওপর পাখীরা ডেকে উঠলো; অন্ধকার যেন আলোর তরঙ্গে কেঁপে উঠলো; বাতাসে গন্ধ ভাসতে লাগলো না-জানা পরিমলের। … গান গেয়ে চলেছি নিজের কণ্ঠকে নিজের সঙ্গী করে রাখার বাসনায়—

"আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে জাগে কে জাগে
ঘন সৌরভ মন্থর পবনে জাগে কে জাগে
কত নীরব বিহঙ্গ কুলায়ে
মোহন আঙুল বুলায়ে—জাগে কে জাগে
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে—জাগে কে জাগে
এই অপার অম্বর পাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে …"

গান থেমে গেল। কই তাকে তো আর দেখছিনা! কোথায় গেল সে?

চাইছিলাম সে চলে যাক্, আমি একলা থাকি। কিন্তু সে যে কতো ব্যর্থ চাওয়া, হঠাৎ তার অদৃশ্য হওয়া দেখে বুঝতে পারলাম। কত ডাকলাম—"কই গো, কোথায় গেলে তুমি!"—কেউ এলোনা। একটা অশরীরী ভয় আমায় পেয়ে বসলো। পথ হারানোর ভয়, হারিয়ে যাওয়ার ভয়। খামোকা ছুটতে লাগলাম।

কতক্ষণ ছুটেছিলাম জানিনা। আর পারিনা যেন। চিৎকার করে ডাকতে

লাগলাম। আমার ধারণা আমি ডাকছিলাম। কানে আমার যে-শব্দটা পৌঁছাচ্ছিল, আমারই কণ্ঠস্বর, তা যেন আর্তস্বরে ক্রন্দন—"কে কোথায় আছো এসো!" কিন্তু কেঁদেছিলাম কি আমি? কি জানি!

হঠাৎ খানিকটা উঁচুতে একটা আলো দেখা গেল। বেশ বুঝলাম জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে কে দাঁড়িয়েছে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হোলো। আলোটা দেখে কী করব ভাবছি বটে। কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি সেই আগুনটুকুর দিকে। ঐ শিখার মধ্যে আমার ভরসা। শিখায় আগুন, আগুনে শিখা; আগুনে মানুষ, মানবসভ্যতা, মানবসমাজ। এবার আর অশরীরী বচনহীনতা নয়; এবার অগ্নি-উপাসক Prometheus-এর সন্তান মাটির মানুষ।

আমি জানিনা আমি কী বলেছি। কিছুই মনে নেই। কানে গেল বলছে—"জোর বৃষ্টি এসে গেলে এ-পথে উঠতে পারবেনা। সাবধানে গাছের ডাল ধরে ধরে উঠে এসো।"

নারীকণ্ঠ। হোক নারী। মানুষ! মানুষ পেয়েছি! সাবধানে পা রেখে রেখে উঠে এলাম। একটা প্রকাণ্ড গুহা। তিনটি মেয়ে বসে বসে আগুন সেঁকছে। বাইরে জোরে বৃষ্টি এলো।

খানিকটা পরে বুঝলাম এরা পথচারিণী। খুব রাত হয়ে গিয়েছিল তাই ওরা এখানেই কাঠ জ্বেলে রাত কাটাচ্ছে। একটা হল্ট্ (halt) মতো। বিপদে আপদে আশ্রয়। মেঝেটা আগুন জ্বেলে-জ্বেলে ছাইয়ে ছাইয়ে ভরতি। প্রত্যেকে কিছু কিছু কাঠ এনে রেখে যায় গুহায়। প্রায় সারাবছরই আগুন জ্বলে, যতদিন পথ-চলাচলের জন্য খোলা থাকে। পাহাড়ে মাঝে-মাঝেই নাকি এমনিতরো গুহা আছে।

"কোথায় থাকো তোমরা?"

বড়োটি বললে—"অনেক দূরে। এখান থেকে চারদিনের পথ। মেলায় যাচ্ছিলাম। সময়মতো পৌঁছতে পারলাম না। পথে বড়ো ঝড়বৃষ্টি গেছে।"

"এখন কি করবে?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"কী আবার করব? কাল যাব মেলায়। সেখানে এই মেয়েটার মাকে বার করবো।"

"ব্যাপার কি?"

ওরা ইতস্ততঃ করছে।

যে মেয়েটিকে নিয়ে কথা তার কাছে শুনলাম যে তার মা তার বাপকে ছেড়ে দিয়ে অন্যকে বিয়ে করে চলে গেছে অন্য গাঁয়ে। সে বাপকে ছাড়তে পারেনি কারণ তার বাপের দুটো পা-ই কাটা। বাপ পথের গ্যাঙে কাজ করতো। ডিনামাইটের কাজ। একদিন পাথর কেটে একটা এতবড়ো ধস্ নেমেছে যে, বাপ পালাবার আগেই নীচে পড়ে গেলো। পা-দুটো হাসপাতাল থেকে কেটে দিলে। হঠাৎ গাঁয়ে আপেলের দালাল এক ব্যবসায়ী এলো। সেও পাহাড়ী। তার মা সেই লোকটার সঙ্গে চলে গেলো। ওদের দেশে তো যায় এমন, বড়ো কথা নয়। কিন্তু ওর বাপের মনে সেটা খুব লাগে। যৌবনে সে যখন থিওগের রোড তৈরি করতে যায়—তখন এক জমিদারের সুন্দরী মেয়ে তার সঙ্গে সাদী করতে চায়। কিন্তু তখন সে ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ সে বিবাহিত। জীবনে মদ খায়নি সে আর স্ত্রী ছাড়া কোনো মেয়েমানুষকে জানেনি। তাই সেই স্ত্রী চলে যাবার পর থেকে লোকটা পাগলের মতো হয়ে গেছে। মেয়েটির সঙ্গে যে-ছেলেটির বিয়ের কথা, সে এখন আর দেরি করতে চাইছেনা। তাই সে এখন তার মাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কারণ সে তার বাপকে ছেড়েও যেতে পারেনা, বাপও মার বাড়ী-ঘর-দোর ছেড়ে নড়বেনা; এদিকে তার পীতমও ঘরজামাই হতে নারাজ।

বললাম—"তুমি অন্য পীতম ঠিক করো, গাঁয়ের পীতম।"

মেয়েটা ডাগর চোখে তীব্র চাহনি হেনে বললে—"আমি সদন পণ্ডিতের মেয়ে, বাবু! পীতম বদলাইনা! আমি জানি মেলায় মা গেছে। সেখানে গিয়ে মাকে ডেকে আনবো।"

"তোমার মা আসবে কেন?"

"এখন আসবে।"

"কেন?"

মেয়েটা চুপ করে গেল।

তার সহচারিণী বললো—"ওর মার খারাপ রোগে গা ভরে গেছে। বাবুজীটি পালিয়ে গেছে। মেলায় দেবীমাঈর কাছে রোগের ওষুধের জন্য গেছে সে।"

"সেই রোগসুদ্ধ্ তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনবে কেন? খুব ছোঁয়াচে রোগ। তার পাপের সাজা তাকে ভুগতে দাও।" আমি বললাম।

"সেকি বাবু!" চমকে উঠলো মেয়েটা। "ঘা হলেও, মা তো মা-ই। ছোঁয়াচে? মায়ের সবই তো ছোঁয়াচে। ছোঁয়াচ ছাড়া মাকে পেতাম কোথা থেকে। মা এখন লজ্জায় ঘেন্নায় আসতে পারছেনা। আমি গেলেই আসবে। আর বাবা খুব খুশি হবে। তারপর বাবা আর মা থাকবে। আমি পীতমের গাঁয়ে চলে যাবো।"

কিছু বুঝিনা এদের রহস্য। আমি খানিকটা থেমে বললাম—"খাদরালা কোথায় কতদূর জানো?"

ওরা হাসলো; বললো—"খাদরালাতে বসেই তো কথা বলছো। এই গুহার পথ ধরে নেমে বাঁকটা পার হলেই তো খাদরালা।"

ততক্ষণে ফরসা হয়েছে বাহিরটা। চেয়ে দেখি সত্যিই তো খাদরালার পাহাড়ের পেছনদিকেই মোড়ের মাথায় পাইন-বন যেখানে আরম্ভ সেখান থেকে শ'খানেক ফুট উঁচুতে গাছে ঢাকা এই গুহাটা।

পরে কতবার দেখেছি।

উঠে দাঁড়ালাম খাদরালার পথে। উত্তর দিকের হিমঢাকা পাহাড়গুলোয় সোনার রং চিক্‌চিক্ করছে। আমি ক্যাম্পে ফিরে আর ওপরে গেলাম না। নীচে দপ্তর-ঘরে আগুনের পাশে শুয়ে পড়লাম।

*

জাগলাম; এসে ডাকলো গোপী।

"কমাল্ সাব্ কমাল্। কখন এলেন? ওপরে গেলেন না?"

করমচন্দ্ বললে—"কেন বেকার কষ্ট দিচ্ছ। এই ঘণ্টা-দুই হবে এসে শুয়ে পড়েছে। জুতো অবধি ছাড়েনি। ঐ ভবানন্দ জুতো ছাড়িয়ে দিয়েছে। আমি কম্বল চাপা দিয়েছি, আগুন জোর করে দিয়েছি। আরাম করতে দাও।"

আর আরাম!

"কলকল গীতে সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে;
নামিল জোয়ার! ..."

এখানে 'নামিল ছেলের দল'।

চা খাচ্ছে আর চলেছে কাজে। আমার প্রবর্তিত সেই কার্ড নিয়ে নিয়ে হাজির। চা-রুটি খাচ্ছে, আর কার্ড জমা রাখছে।

আমি উঠে পড়েছি তখন।

বুদ্ধু গান জুড়েছে। আমি চ'টে উঠে বললাম—"লজ্জাও নেই ঘেন্নাও নেই! রাবিশ ফিল্‌মী গানগুলো এই সুরভরা আকাশে ছাড়চো? তোমার কণ্ঠে মাকড়সা জাল পাতবে।"

বুদ্ধুর রাগ নেই। বুদ্ধু ছেলেমানুষ। ইঁদুরের চাউনির মতো ভীরু-সতর্কতার মধ্যেও সদাজাগ্রত দুষ্টবুদ্ধি জ্বলজ্বল করে। অবিকল ছোটভায়ের ছাঁচে গড়া মন, প্রাণ, মেজাজ।

সঙ্গে সঙ্গে ধরলো—

"কাল রাতের বেলায় গান এলো মোর মনে—
তখন তুমি ছিলেনা গো, ছিলেনা মোর সনে।" ...

আমি মোটামুটি কৃত্য সেরে স্নানের জন্য এদিক ওদিক চাইছি—ডাক্তার এসে হাজির।

"গোশলখানায় যাও। তোমার রাতে অন্তর্ধানের খবর আমি পেয়েছি এবং সকালে যেভাবে পড়ে ছিলে সে-ছবিও দেখে গিয়েছি। তৎক্ষণাৎ এক টিন জল গরম করে রাখতে হুকুম দিয়েছি। গোশলখানায় যাও। আজ দেখবে মন-মেজাজ কেমন খুশি করে দিই!"

গোশলখানায় ঢুকেই বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বললাম—"জীতা রহো ডাক্তার, জীতা রহো! মাত্র এই একদিনের সেবার বিনিময়ে তোমায় আমার লেখায় বেঁধে দেবো। কোথায় পেলে ডাক্তার এমন ধোয়া টার্কিশ টাওয়েল—সাবানের নতুন কেক্—গন্ধতেল? ডাক্তার, ইচ্ছে করছে তোমায় জড়িয়ে নাচি!"

"ভেতো বাঙালী আর কি করবে? হ'তে পাহাড়ী, তো বলতে, ঘোড়ায় জীন জুতে ছুট্ লাগাই।"

"কিন্তু ডাক্তার, ঐ গরম জলে আমার নাওয়া চলবেনা; আমার আরামই নষ্ট হবে।"

"বন্ধু, আরামের জন্য হলে—তোয়ালে, সাবান আর গন্ধতেলের বন্যায় এই গাশলখানাকে মোগল-হামাম করতে পারতাম না। যা করেছি সবই

অতিপরিশ্রান্ত স্নায়ুপ্রবণ রোগীর জন্য ডাক্তারী ব্যবস্থা। গরম জলও সেই প্রেস্‌কিপ্‌শনের অঙ্গ। সুতরাং একেবারে ফুটন্ত গরম জলে গা হাত ধুয়ে ফেলো।"

স্নান সেরে নতুন গেঞ্জি আর শার্ট প'রে ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই সামনে পটে ভরা কফি আর প্লেটে সাজানো ক্রীম-ক্র্যাকার, একটুকরো মাখন এবং দুটো ডিম।

ডাক্তার রুগী দেখায় ব্যস্ত। আমি গোগ্রাসে খেতে লাগলাম। অন্য মানুষ যেন। সব খেয়ে একটা আপেল হাতে বেরিয়ে মনে হতে লাগলো কালকের রাত্রি যেন একটা ঘোর দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি।

ডাক্তার বললে—"পেলে ওদের?" ব'লেই হো-হো করে হেসে ফেললে। আমিও কি জানি কেন হাসতে-হাসতে বেরিয়ে পড়লাম কাজ দেখতে।

ফিরে অফিসের কাজ। তারপর খাদরালা-নিউজের লেখা। দুপুরের খাওয়াও সারা। খুব কাজ চলেছে। মহারাষ্ট্র দল দু'বেলাই প্রাণপণে খাটছে। একটা বিশ্রী পাহাড় ওদের ভাগে পড়েছে। সবটা শক্ত চাপ একটা। কাটতে ভীষণ হয়রানি। বাঁকের মাথায় ব'লে চওড়া করতে হবে বেশী।

বেলা আড়াইটা আন্দাজ বসে আছি ম'ম্-ক্লাবে। আমার ম'ম্ পড়া দেখে চার-পাঁচটি ছেলে জড়ো হয়ে বসে দুপুরবেলাটায় খাবার-হলের সামনের জায়গায় আকাশের তলায় একটা বড়ো সতরঞ্চি বিছিয়ে। আমি জোরে জোরে পড়ি, ওরা শোনে। বেশ কাটে ঘণ্টাখানেক। সেই সময় ভর্মা, বাইসারিয়া, সিন্‌হা ফিরলো। তাদের চেহারা যা দেখলাম তখন আর কিছু বলতে পারলাম না।

কিন্তু সারা ক্যাম্প উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো তাদের প্রতি কী আদেশ হয় দেখার জন্য।

আমি আগে থেকেই ব'লে রেখেছিলাম যে আস্থানা না আসা পর্যন্ত ওরা একটা বিশেষ তাঁবুতে অন্যসব ছেলে থেকে আলাদা থাকবে। তেমনই হোলো। ওরা শুধু প্রথমটায় তা বুঝতে পারেনি। আর যখন বুঝতে পারলো তখন ঘাঁটাতে সাহস করেনি।

করমচন্দ্‌জী আমাদের মধ্যে সবার বড়ো। তাঁর আসল পরিচয় তিনি অফিসের টাইপিস্ট। কিন্তু সেটাই তাঁর নকল পরিচয়। লোকটি স্বল্পভাষী,

রসালাপী, মধুর-স্বভাব এবং রাশভারী। আমায় একটু বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। বললেন—"ওরা লোক ভালো নয়। কি করবেন ওদের নিয়ে। আস্থানার পেয়ারের লোক। আস্থানা এসে ওদের আবার আস্কারা দেবে। তখন আপনার অবস্থা কী হবে ভাবছেন ?"

সিগারেট খাচ্ছিলাম আর চোখ বোলাচ্ছিলাম *Perennial Philosophy*-র ওপর। একটা জায়গায় লেখা—

Seccho-র বলা কথা :

*What life can compare with this ?*
*Sitting quietly by the window,*
*I watch the leaves fall and the flowers bloom,*
*as the seasons come and go.*

তার পরে-পরেই চোখে ধরছে—Ryo Neu-এর কথা—

*Sixty times have these eyes beheld*
*the changing scenes of Autumn.*
*I have said enough about moonlight.*
*Ask me no more.*
*Only listen to the voice of pines and cedars,*
*when no wind stirs.*

করমচন্দ্‌জীর কথাটাও কানে গেল।

প্রবৃত্তি নেই যে কিছু বলি। না-বলাও ভালো দেখায়না। ভদ্রলোক কী মনে করবেন।

বললাম—"আমি আমার কাজটুকুই সারতে পারি, করমচন্দ্‌জী। তার বেশী কিছু করবোও না, চাইও না।"

"তবে ছুটোপাটি করে গেলেন কেন ধাওয়া করে ?"

"একহিসেবে ওরা আমার পরমাত্মীয় ; বন্ধু। ওদের জন্যই জীবনে দুর্গমনীয়তে গমন করেছি, অভাবিতকে ভাবনা করেছি। ওদের অপমান আমি করবনা ; তবে ক্যাম্পের ভার নিয়েছি ; এ দায়িত্বকেও তুচ্ছ করবোনা।"

*

আজ আমার মন যেন কেমন উদাস। ক্ষণে ক্ষণে চিন্তার তরঙ্গে ভেসে আসছে শিশুদের চাঞ্চল্যে প্রাণবন্ত সেই খামার—খলিহান্ : পান্নার চকিত দৃষ্টি ;

লেখরাজের বিহ্বলতা; গভীর রাত্রে ভৈরবীর সদর্প প্রচার; নির্জন পথের মায়ার মধ্যে হঠাৎ আত্মবিস্মৃতি—সেই গুহা, আগুন, পাহাড়ী-কন্যার কাহিনী।

খাদরালা-ক্যাম্পের জলটা যেখান থেকে আসে সেধারটায় যাইনি। আজ একা-একা পথ ধরে ধরে সেদিকেই যাচ্ছি।

খাদরালা-হোটেলে উঠলাম।

সেই পাথরের-টালি-ছাওয়া বিশ্রী ঘর। একটা ঘরেই রান্না-খাওয়া। রান্নার জন্য বড়ো বড়ো গোটা চার উনুন। অন্যপাশে পাইনের গুঁড়ি মাঝখান থেকে দু'ভাগ চিরে উল্‌টে বসানো চারটা পায়ার ওপর—সেটাই টেবিল। সঙ্গে বেঞ্চ-ও ঐরকমই চেরা গুঁড়ি। একদিকটা প্লেন, অন্যদিকটা গোল। লম্বায় অনেকটা। পাশে খচ্চর আর গরুর থাকবার জায়গা। অন্যপাশে একটা মুদীখানা।

—"না বাবু, সিগারেট আর নেই, ফুরিয়ে গেছে।"

"বলো কি! আমার যে দরকার।"

"আজ তো লাচার। কাল খচ্চর আসবে মাল নিয়ে। তার আগে নয়।"

"দুধের ব্যবস্থা হোলো কিছু?"

"হ্যাঁ, আপনি পাবেন দুধ রোজ আধা-সের। তার বেশী হবেনা।"

"সে তো পাচ্ছিই।"

"তবে?"

"তোমাদের আমদানি না হওয়া পর্যন্ত তো যা-খুশি দাম নিচ্ছো।"

বনেদী হাসি হাসলো।

বিশ্বসংসারে দুটো পাকা-জাত আছে। কোনো কিছুই তাদের মধ্যে ফাটল আনতে পারেনি। একটা হোলো কুলী বা মজদুর, আর অন্যটা বেনে। জগতের সব মজদুর একধরনের। এক ঘাটে মাথা মুড়িয়েছে; এক ভাঁড়ে জল খেয়েছে; এক নৌকায় সফর করছে; এক বাজারে সওদা করছে। ওদের সমস্যা এক, স্বপ্ন এক, নিরসন এক, বুলি এক। তেমনি বেনে;—সেই তেলালো কথা, শাঁসালো নেয়াপাতি ভুঁড়ি, কায়েমী হাসি, শকুনে দৃষ্টি, ঘোলাটে বুদ্ধি এবং কুমীরে সমবেদনা। শেয়ালের মতো স্বার্থের গর্তে সুবিধার ল্যাজ ঢুকিয়ে লাভের কাঁকড়া খেয়েই চলেছে, খেয়েই চলেছে—তোয়াক্কা নেই।

মাডাগাস্কারের শেয়াল-কাঁকড়ার যা সম্বন্ধ, উরুগুয়েতেও তাই, ল্যাপ্চা-ল্যাণ্ড বা ইস্থেমাস্ অফ কোরিন্থে বা তাস্মানিয়ার কোনও প্রভেদ নেই। শেয়াল—ল্যাজ—কাঁকড়া—ত্রিকোণ সর্বত্র একই কাহিনী রচনা করে চলেছে সেই নোমাডিক্ যুগ থেকে আজ পর্যন্ত, রাজা জন্মেজয় থেকে প্রজা চার্চিল পর্যন্ত। একই ব্যাপার। তলিয়ে বোঝা দরকার।

আমি সিগারেট পেলামনা। নেবে চললাম আবার পথে। দূরে দূরে দল বেঁধে বেঁধে ছেলেরা ঘোরাফেরা করছে। আমার ম'ম্-ক্লাবের দু'একজন দেখা পেয়ে সঙ্গ নিলে। সাহিত্য-আলোচনা একটু-আধটু হোলো। কিন্তু কিছুক্ষণেই বুঝতে পারলাম ভালো লাগছেনা কিছু। একলা থাকতে ইচ্ছা করছে। একটু থেমে যেতে চাই "to cease upon the midnight hour"। একটু নিশ্বাস নেবার সময়।

ওরা বুঝতে পেরে এগিয়ে গেল।

আমি ঝরনার কাছাকাছি গিয়ে একটা পথ ধরে নেবে যেতে লাগলাম। বেশ বেলা আছে তখনও। এধারে বনও তত গভীর নয়। পাহাড়টা ভদ্রগোছের। ওপারের ক্ষেত-টেত-গুলোও স্পষ্ট। রোদে ক্ষেতগুলোর মধ্যে বেশ 'চেনা-গাঁ চেনা-গাঁ' ধরনের ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে। বেশ নিরিবিলি জায়গা দেখে বসলাম।

নেবে গেছে পাহাড় থরে থরে ঘাস রেখে রেখে—আর প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে মাঝে মাঝে পাইন গাছ। ওপারের পাহাড়ের চূড়ায় ঘন পাইনের জঙ্গলের গভীর সবুজ প্রায় কালো করে রেখেছে আকাশের ললাট। সেই ঘন সবুজের বেল্ট্ শেষ হবার পর খানিকটা হাল্কা সবুজের কার্পেট, ঘাসে ঢাকা, তারপরই গ্রাম আর ক্ষেত।

আমি খাদরালা-নিউজের জন্য কাগজ বার করে লিখতে বসলাম। শেষ সিগারেট ধরালাম। আলো যতক্ষণ আছে লিখবো। নোট নিয়ে নিলাম গতকালের ঘটনার! শ্রীমতীকে চিঠি লিখে আনন্দ জানালাম। বেলা গড়িয়ে এলো। সন্ধ্যা হোলো। এধার থেকে পশ্চিম ধারটা দেখা যায়। সূর্যাস্ত দেখা যায়না তা ব'লে। সেটা পাহাড়-ঢাকা পড়ে। তবু পড়ন্ত রোদের আভায় যে বেদনা-মাধুরী মেলানো, সেই মাধুরীর দীপ্তি পরিবেশন করছিল এই পশ্চিম গগনের টুকরোটুকুনি।

সন্ধ্যার বাতাস। কেমন যেন আমেজ আজ। কাল যেন কেটেছে ম্যাক্‌বেথের দৃশ্য দেখে, আজ যেন দেখছি উইন্টারস্‌-টেল্‌। কাল গিয়েছে প্যারাডাইজ-লস্ট প'ড়ে, আজ পড়ছি *Skylark* কি *Ode to Autumn*।

হঠাৎ শুনি মৃদু পদক্ষেপ।

ফিরে চেয়ে দেখি একটি সুশ্রী, সুঠাম মেয়ে। মুখখানা থ্যাবড়া গোলগাল। গাল-দুটো স্বাস্থ্যে টস্‌টস্‌ করছে। মুখে ফিক্‌ফিক্‌ হাসি। কাছ ঘেঁষে এসে বসলো।

"নমস্তে, মাস্টার-সাব্‌!"

আশ্চর্য! "নমস্তে। তুমি কে?"

হাত বাড়িয়ে বললে—"এই নাও।"

আশ্চর্য! চার প্যাকেট সিগারেট।

"সিগারেট? কে দিলে? তুমি কে, মা? আমায় চিনলে কি করে?"

"তোমায় অনেকেই চিনে গেছে—তুস্‌সীরাম, মাঙ্গুরাম, পেখাধারের সকলে—রোঢ়ু, কোটী, বাহলির লোকেরা সকলেই তোমায় জানে। তুমি মাস্টার-সাব্‌। আমিও তোমায় জানি।"

"হঠাৎ এতো নামী হয়ে উঠেছি জানতাম না তো?"

"হবেনা? এখানে ক'টাই বা লোক! এর মধ্যে কেউ এলেই জানাজানি হয়ে যায়।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, আমি তোমার কথা কোটীর তুলসীর কাছে খুব শুনেছি। তুমি ঘি খাওনা—কোন্‌ দেবীকে দান করেছো তাও শুনেছি। আমার নাম তুত্তা। আমি থাকি কাকোঈ গাঁয়ে। এখান থেকে পাঁচমাইল দূরে। দেওকীনন্দন গাঁয়ের মুখিয়া।"

"দেওকীনন্দন তো পেখাধারের মুখিয়া?"

"হ্যাঁ। পেখাধারের দেওকীনন্দন অন্য। আমাদের গাঁয়েও দেওকীনন্দন।"

ইংরেজ রাজাদের মতো এদেরও নামের ভাণ্ডার বড়ো স্বল্পবিত্ত।

ও বলতে লাগলো—"আমি ঐ হোটেলে বসে বসে টুপি সেলাই করছিলাম। তোমার কথা সবই শুনলাম। দুধ আর সিগারেট চাই তোমার, পেলেনা। তাই ভাবলাম আমি তোমার কিছু সেবা করি।"

এতোদিন এখানে এসেছি, কোনও পাহাড়ী মেয়েকে দেখে মনে হয়নি ঘরোয়া, ভালো-লাগার টান্‌টা ধরেনি। এ মেয়েটি পান্নার মতো চমকদার নয়, কিন্তু ভালো লাগলো একেবারে ওপারের গাঁয়ের মতো, ঝরনার জলের স্নিগ্ধতার মতো। জিতে নিলে এই নোংরা অথচ তাজা মেয়েটা। ওর মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল বছর দশেক আগে আমার ছোট যে বোন্‌টা মারা গেছে। তেমনি নাদুস-নুদুস, তোবড়ানো নাক-মুখ, গয়ার ঘটির গড়নে চেহারা।

"তা তুমি কেনই বা কষ্ট করলে, কী করেই বা পথ জানলে। তা ছাড়া জাননা কি এই ক্যাম্পে মেয়ে আসা বারণ, মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বারণ। আমি বড়ো; আমিই বারণ শুনবোনা ?"

হাসছে তুন্তা। একেবারে দু'খান-করা হাসি। লজ্জা-সরম বাধা-নিষেধ না-মানা হাসি। দাঁতের বাহারের পানে চোখ আট্‌কে থাকে।

"কষ্ট কি ? ঝরনার ওধারে আমার গাঁয়ের একজনার একটা দোকান আছে। তার কাছে সিগারেট থাকে। আমি জানতাম। আমি ছুটে নিয়ে ফিরছি। দেখি তুমি আসছো। আমি অনেক আগে পৌঁছেছি পাকদণ্ডি ধরে। ফিরে চললাম দোকানে। লক্ষ্য করলাম তুমি কি কর। অনেকক্ষণ লিখলে, মাস্টার-সাব্‌। আমি বলি কি, সিগারেট ধরাও, আমায় একটা দাও। আর ঐ দোকানে চলো। চা খাবে। কী ভাবছো ? ক্যাম্পে কেউ জানে নাকি যে আমি ঐ খাদরালা-হোটেলে রাত কাটাই ? ওঃ বাবা, তবেই তাড়াবে ! আমি হোটেলওলার বৌয়ের ঘরে থাকি। ওর ছেলের তদারক করি। গরুকে শানি-পানি দিই। খচ্চরের সেবা করি। বদলে থাকতে দেয়, ঘোমটা দিয়ে থাকি। তোমায় দেখে বড়ো ভালো লাগে তাই সিগারেট খুঁজতে এসেছিলাম।"

"তুমি তো দিলে, মা, আমি এখন কী দিই ?"

"ওঃ বাবা, তুমি তো বেনিয়া কম নও, মাস্টার-সাব্‌ ! তোমার জন্য আমি আমার পীতমকে দেখতে পাব। তোমাদের সঙ্গে কাজ করে আমার পীতম। আজ ছ'মাস পরে এদিকে এলো। খুব ভালো কাজ জানে তাই সিমলা থেকে আসতে সময় পায়না। একসঙ্গে একমাস থাকবে তাই বড়ো খুশী। আমিও খুশী। ওকে নিয়ে রোজ রাতে এই দোকানটায় চলে আসি। গাঁয়ের ভাই একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছে।"

দোকানে এসে গিয়েছিলাম। চা চড়লো। আমি গল্প করতে লাগলাম।

জীবনের রসে অবগাহন। এই লোলুপতা আমার যাবার নয়। যখন যেখানে গেছি—সরব, কলরবমুখর, প্রগল্‌ভ নরনারী আমায় টেনেছে। মানুষ। মানুষের কথা, মানুষের গান, মানুষের প্রাণ—আমার সব নেশার বড়ো নেশা। শ্রেণী নয়, শিক্ষা নয়, লিঙ্গ নয়, সংজ্ঞা নয়, জাতি নয়, ভাষা নয়—কোনও প্রভেদই প্রভেদ নয়—মানুষ যতক্ষণ মানুষ; তার প্রাণের কথা যতক্ষণ তার প্রাণের প্রবাহ।

আমি এদের পেলাম। গল্প পেলাম। চা পেলাম, সিগারেট পেলাম—and the wilderness is paradise now—আমায় গোপী না তুললে ডাক্তার না ডাকলে এখন আমি সমাহিত।

তুত্তার স্বামী কুলী-গ্যাঙে কাজ করে। তার বাড়ী কেকঙ্গ গাঁয়ে। বয়স ছাব্বিশ। তার বিবাহ হয় প্রথম এক কিশোরীর সঙ্গে। সাপের কামড়ে সে মারা যাবার পর কিছুদিন ও পাগলের মতো থাকে। তখন এক বর্ষীয়সী ধনাঢ্যা রমণী ওকে সেবাযত্ন ক'রে ভালো করে। কিন্তু তারপরে ওকেই সে বিবাহও করে। গাঁয়ে খুব বড়ো ভোজ হয়। কিন্তু সেই রমণীর পরিবারে এক পাহাড়ী চাষীও ছিল, ক্ষেতখামার তদারক করতো। একদিন একটা বিশেষ অবস্থায় সেই লোকটার সঙ্গে বর্ষীয়সী পত্নীকে দেখার পর ওর স্বামী হঠাৎ বুড়ীকে মারধোর ক'রে বসে, যেটা পাহাড়ী সমাজে গর্হিত ব্যাপার। ওদের বিয়ে ভেঙে যায়। তারপরেই তুত্তার সঙ্গে ওর ভাব-সাব আরম্ভ হয়। এখন তুত্তা জানে দুনিয়াটা যতবড়োই হোক, তার স্বামীর দিল্ আর কলেজার কাছে ছোটো, খুব ছোটো। আর তার গান। "মাস্টার-সাব্, শোনাবো তোমাকে তার গান। বনের সাপ, হরিণ, পাখীও বশ মানে।"

"বশ-মানা সাপ-ই তোর সতীনকে কামড়েছিল বুঝি তুত্তা?"

তুত্তা হেসে সবিনয়ে বললো—"সত্যি, চমৎকার গায়।"

ছোট্টো ঘর। ওরই মধ্যে চা তৈরী করে আমার হাতে যখন দিল তখন আমার মন ভরে আছে তুত্তার সরল মনের মতো ও-পাহাড়ের গায়ে আঁকা গ্রামখানার ছবি।

কিন্তু ফেরার তাগিদ আছে। আজ আমার কথা দেওয়া আছে দুর্গাপ্রসাদকে। তার সেই ডিবেট-ক্লাবের ব্যবস্থা করতেই হবে।

হোলোও। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে খাদরালা-নিউজ সংক্রান্ত কাজকর্ম সেরে ফেললাম পারীখের সঙ্গে। খাদরালা-নিউজের সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্

বুদ্ধু। প্রধান সম্পাদক যে পারীখ নিজে, আগেই তা বলেছি। বুদ্ধু দেখি হাসছে। পারীখ ততক্ষণ চলে গেছে।

ভারী দুষ্টু ছেলেটা। সেয়ানার অগ্রগণ্য! "হাসছো কেন শুনি?"

"মেড়ো বেটা ভাবছে উনি কতো ইম্পর্ট্যান্ট্! ওর ধারণা ও-ই সব খাদরালা-নিউজটি লিখছে!"

আমি কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললাম ( সত্যি রাগ করা যায়না বুদ্ধুর ওপর )—"আবার অশ্রদ্ধাভরে কথা বলছো? যাই কিছু বলোনা কেন, অসহিষ্ণুতা ও অশালীনতা প্রকাশ পাবে কেন?"

করমচন্দ্‌জীও হাসছে। বুদ্ধু জব্দ! ভবানন্দও মজা পাচ্ছে। বুদ্ধু জব্দ!

বুদ্ধু বললো—"আমি ওসব শালীনতা-ফালিনতা বুঝিনা বাবা। আমার রাগ হয় ওর ফড়ফড়ানি দেখে। আস্থানা ওকে নাচিয়ে তুলেছে।"

"তা নয় তুললো, তোমার জ্বালা কেন?"

"আমি দাদা চাল্ দেখতে পারিনা। একটা গল্প লিখেছে। ইংরেজী লিখেছে—He burst out his basket of love pathetically."

এরপর হাসি চেপে রাখা কঠিন হোলো। করমচন্দ্ ও ভবানন্দ একেবারে হো-হো হাসতে লাগলো।

বুদ্ধু মৌকা পেয়ে বললে—"Purgatory লিখতে purgative লিখে বলে slip of tongue হয়েছে।"

হাসতে হাসতে বুদ্ধুকে বললাম—"থামো বুদ্ধু, থামো। দশহাজার ফুটের মাথায় এডিটরি করতে গেলে purgative ছাড়া purgatory-র তল্লাস মেলেনা। বড্ড উঁচু কিনা। ঐ পারীখের রসজ্ঞান আছে।"

করমচন্দ্ আর ভবানন্দ খুব হাসতে লাগলো। এর মধ্যেই দেখি দুর্গাপ্রসাদকে নিয়ে গোপী আর বিক্রম। গোপী বললে—"জনাব, মুসলমান সাদী ক'রে তিনবার 'তালাক' বললেই খালাস। কিন্তু জনাব, দোস্তীর গাঁঠ থেকে মুক্ত হবার মন্ত্র কোরান-হদিসেও নেই। আপনি জালিম।"

একগাল পান। দামী জর্দার গন্ধ। খুব সেজেছে। হাতে ছড়ি।

বিক্রম বললো—"কাজ কেমন এগুচ্ছে স্যার? সন্ধ্যের কাজ দেখলেন?"

"আজ আর যাইনি কোথাও, বিক্রম। দুর্গাপ্রসাদ রিপোর্ট দেবে।"

দুর্গাপ্রসাদ বললে—"দিল্লীর মোহন খান্নার দলে খুব কাজ চলেছে। বিক্রম

ঐ দলে, আর তিনটি বাঙালী ছেলে আছে ঐ দলে। একেবারে শেষ দলটা। যেতেই হয় প্রায় আড়াই মাইল। কিন্তু খুব speed-এ কাজ করছে। আর মহারাষ্ট্র-দল। ওঃ, অমানুষিক পরিশ্রম। ওরা পাথর সরাবার মতো ধৈর্য নিয়ে এসেছে। কী কঠোর পরিশ্রমী! দু'বেলা সমান খেটেছে। খান্নার অর্গানাইজেশন ভালো। মীর্জাপুর বেশীর-ভাগই আড্ডা দিচ্ছে। কিন্তু পাহাড় থেকে ছিঁড়ে সিদ্ধিপাতা কাঁচা খাচ্ছে আর গুণ্ডার মতো কাজ করে যাচ্ছে। অনেকটা সাফ করে ফেলেছে। এ ছাড়া ক্যাম্পের ওধারে পাহাড়ীদের দলটাও খুব খাটছে। ওদের কাজ আর খান্নাদের কাজ দেখলে ভরসা হয় আমরা কাজ শেষ করবো।"

আমি একটু মজা দেখবার জন্য বললাম—"গোপী কোন্ দলে আছ?"

বিক্রম হেসে ফেললো।

গোপী কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বললো—"জী জনাব। উড়েদের ভাষাটাই আজও undeveloped, তাই ওদের ভাষায় সত্যকথা বলার বয়স এখনও আসেনি। এই উড়েটার কথায় রিপোর্ট নিচ্ছেন স্যার?"

"কিন্তু আমি তো ইংরেজীতে বললাম।"

গোপী বললে—"ঐ তো দেখুন্‌না বুদ্ধির বহর। ওকি ইংরেজীতে ভাবছে? ভাবছে তো ওর সেই উৎকলী ভাষায়। যে ভাষায় এখনও 'সাফ্ লফজ্' ব'লে জিনিসই নেই। হকিকত্ (সত্য)-এর প্রতিশব্দ নেই। ওদের জীবনে এর ব্যবহার নেই।"

দুর্গাপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললে—"তোমার উৎকল-ভাষার ওপর তো যথেষ্ট অনুরাগ দেখতে পাচ্ছি। পড়েছো ও-ভাষা?"

"তোবা, তোবা; পড়ে সমালোচনা? সে উৎকলী primitive-রা করে। দুনিয়া এখন এগিয়ে গেছে হে দোস্ত্। এখনকার latest report—না দেখে, না গিয়ে তো হয়ই, সেটাই বিধি। In fact যা হয়নি, তাই নিয়েই modern journalism। পড়ার পর বইয়ের সমালোচনা ঐ কটকে এখনও চলে। আমাদের এলাহাবাদ-বা-লণ্ডনের মতো জায়গায় সমালোচকরা না-লেখা বইয়ের সমালোচনা in advance block করিয়ে রাখেন। যখন যেমন বই পান একটা কষে ছেড়ে দেন। Latest mechanised form of criticism—উড়ে, তোমরা বুঝবে কি?"

"উড়ে-উড়ে করছো? উড়ে কি মানুষ নয়?"

"হকিকত্ এই যে, আমি জানিনা। ডারউইন কন্সাল্ট করতে হবে। তবে আমার এক উকিল বন্ধু—জজিয়তি পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছেন ছাপান্নবার—তিনি বলেছেন ইংরেজী আইনে মানুষ খুন করার সাজা ফাঁসি হলেও, উড়ে মারলে ফাঁসি হয়না।"

দুর্গাপ্রসাদও যত হাসে আমারও তত হাসি। আর গোপী ততই বলে—"হকিকত্—হকিকত্—বিল্কুল্ জনাব, বিল্কুল্। তবে আমি জানিনা আপনারা মানবেন কিনা। ভালো কথা, সার কথা, ক'জনাই বা মানেন।"

"কিন্তু কোন্ দলে কাজ করছো তুমি? সেখানে কিরকম কাজ চলছে?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

গোপী বললে—"সবচেয়ে কঠিন জায়গা এবং সবচেয়ে দূরে।"

দুর্গাপ্রসাদ বলবার আগেই বিক্রম বললে—"শালা, চোর!"

করমচন্দ্ বললে—"নং ৫ গ্যাঙ হবে। খুব নরম মাটি, পাথর নেই বললেই হয়। বড়ো বড়ো গাছ। কেটে চাড় দিলেই মাটিসুদ্ধ পড়ছে।"

"হ্যাঁ, আর রুমাল দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে ফেলা হচ্ছে! আপনি শ্বেতগুম্ফ হয়ে এইসব সাদা-মিথ্যা (সফেদ ঝুট—white lie) ব'লে চলেছেন। আর মশাই, কাছে মানেই তো আমরা দূরে। কারণ নিকট ও দূর তো relative কথা। যারা দূরে তাদের খেয়াল আপনাদের এতো বেশী তারা দিলের কাছে কাছে আছে। আর আমরা আপনাদের দিল্ থেকে বহু-বহু-দূরে, জনাব। দূরত্ব যে কী তা বিরহী ততো বোঝেনা। এক রাস্তার এপার-ওপার জানলায় বসে যারা প্রেম করে তারাই বোঝে—I am here and you are there and a hundred miles between."

বিক্রম বললে—"সাবাস্। আর নরম মাটিটা শক্ত করবে কি করে?"

"নরমই হোক আর শক্তই হোক, প্রশংসা পাওয়াটাই শক্ত। আরে বাবা, এসেছি যেকালে, সাফ করে দিয়েই নামবো। কিন্তু 'প্রশংসা পাবোনা' এই দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে কাজ করা, এবং 'প্রশংসা পাবো' এই আশার মধ্য দিয়ে কাজ করার মধ্যে শক্ত কোন্টা জনাব, আপনি তো হিক্মত্দার আপনিই বলুন।"

"শুনছো দুর্গাপ্রসাদ ?" আমি ইঙ্গিত করলাম দুর্গাপ্রসাদকে।

দুর্গাপ্রসাদ বললে—"গিলছি দাদা, গিলছি! মডার্ন রিপোর্ট কি করে দাখিল করতে হয় তারই তালিম নিচ্ছি।"

মাথা নীচু করে একহাতে লক্ষ্ণৌ-সুলভ আদাব জানিয়ে গোপী দুর্গাপ্রসাদের শ্লেষটুকু গ্রহণ করলো। দুর্গাপ্রসাদ প্রত্যভিবাদন করলো গোপী:কে ব্যঙ্গ করে।

যেভাবে গোপী 'উড়ে' 'উড়ে' ব'লে দুর্গাপ্রসাদকে ধরেছিল তাতে আর-কেউ হলে রেগে যেতো। কিন্তু সত্যিকার প্রীতির বন্ধনের এতো জোর-বাতাস যে—ধুলোবালি, খড়কুটোকে দাঁড়াতেই দেয়না। সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, রেখে যায় নির্মল জীবনের ইঙ্গিত। আমি লক্ষ্য করেছি যে, যে-কোনো ভালো আড্ডায় একজন করে বিদূষক থাকে। ইংরেজীতে বলে 'butt'। এরা ঠিক ভাঁড় নয়। কিন্তু এদের ঠ্যাং সহজেই ধরে কাৎ করা যায়, এবং সকলের উৎসারিত শ্রী-হস্তে এরা এদের ঠ্যাংটি এগিয়ে দিতে দ্বিধা করেনা। এদের উদার মনটির একটা মাত্র জানলা, সেদিক থেকে খালি বয় রহস্যের মনমাতানো বাতাস। হাজার ঠাট্টা-বিদ্রূপের একমাত্র পরিচয়—'তোমায় আনন্দ দিল কি ?' —তা যদি দেয়, তা হোলেই হোলো। মূল্য তাকে দিতে হয় হোক। সে আনন্দিত। মেসে, হোস্টেলে, হোটেলে বড়ো বড়ো দলে এই লোকটিকে আশ্রয় করে জাত তুলে, সমাজ তুলে, বা জিলা তুলে কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হতে দেখেছি। সুরসিক তার রসে স্নান করে। 'গাড়োল' যারা তারাই ক্ষেপে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে ;—সে আবার তখন অন্যধরনের মজা! হোস্টেলে, ক্লাবে, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই ধারাটি আন্তর্জাতিক। আমাদের দেশে 'বাঙাল', 'ঘটী', 'যশুরে', 'বারিন্দির', 'দখ্‌নে' ইত্যাদি কথার চল্—সরল পরিহাসকে যে কতো নব নব রসে সঞ্জীবিত করে রেখেছে, কতো সুন্দর মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে, কতো পরম বন্ধুকে নিকটতর পরিবেশে টেনে এনেছে তার ইয়ত্তা নেই।

যারা ব্যক্তিগতভাবে এইসব আলোচনা চালায় বা এসব কথার মূল্য মান-অপমান দিয়ে যাচাই করে তাদের বলতে ইচ্ছা যায়: "আপনি কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না!"

দুর্গাপ্রসাদ এসেছিল সেই debate নিয়ে আলোচনা করতে। ঠিক হয়ে গেল—কাল প্রথম পলিটিক্যাল সভা হবে। করমচন্দ্ নোটিশ টাইপ করলো, আমি স্বাক্ষর করলাম এবং নোটীশ-বোর্ডে টাঙিয়ে দিলাম।

ওপরে ওঠার আগে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে পারলাম না।

"ভাই, শীত করে ভীষণ। ঘুমুতে পারিনা।"

"শীত ভাঙে তুই আর রুই।"

"তুই আর পাই কোথায়? রুই পাইয়ে দিতে পারো?"

"কি চাই? কম্বল? ক'টা চাই? আমার কাছে এই হাসপাতাল ব'লে খান কুড়ি আছে। লুকিয়ে তোমায় চারখানা দিতে পারি।"

যতক্ষণ পাইনি, বেশ দরকারী বোধ হচ্ছিল। এখন পেয়েই মনে হোলো ডাক্তারের সঙ্গে আলাপের সুবিধা বাগিয়ে আমি চারখানা কম্বল হাঁশিল করলাম। ঠিক। কিন্তু ঠিক কি? এই শীত তো অনেকেরই হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে; আমি কেন বিশেষ সুবিধা নেবো।

ডাক্তার মিটিমিটি হাসছে।

"হাসো কেন?"

"নেবেনা কম্বল, নয়?"

"ঠিক বলেছ। না নেওয়াই উচিত।"

ডাক্তার বললে—"যখন চাইলে তখনই কাগজের টুকরোয় একটা কথা লিখে ঐ বইটার তলায় রেখে দিয়েছি। কাগজ তোলো, পড়ে দেখে নাও।"

একটু থেমে বললাম—"না, আমি দেখবোনা। আমায় আর-একজন বসে-বসে study করছে ভাবতে আমার বিশ্রী লাগে। আমি দেখবোনা।"

"আর পয়সার বদ্‌লি আর্টিস্টরা যখন ন্যাংটা ক'রে মেয়েদের বসিয়ে রাখে, study করে, তখন? তখন সেটা ভালো লাগে তো?"

"সে-কথায় কাজ কি? আজ আমি তোমার সঙ্গে কথায় ফাঁসবোনা। ওপরে গিয়েই লম্বা ঘুম দেবো। আজ বড় ক্লান্ত। Study করতে যাদের ভালো লাগেনা তাদের কিছুতেই ভালো লাগেনা। আমি একজন বাঙালী মহিলা-আর্টিস্টকে জানি। জীবনের বেশীর-ভাগই তিনি প্যারিসে থেকে আঁকেন। মাঝে মাঝে ভারতে আসেন। আমার একজন বিশেষ পরিচিতা বান্ধবীর কথা বলছি শোনো। এম.এ. পাস করে চাকরি খুঁজছে, কাজ চাই। এটা-ওটা-সেটা করতে করতে ঐ আর্টিস্টটির কাছে লোভনীয় কাজ পেলো। দু'চারটে চিঠি লেখা, টাইপ করা; একটু-আধটু সময় সঙ্গ দেওয়া, গালগল্প করা; ব্যস্। পয়সা মন্দ নয়। ইতোমধ্যে আমার বান্ধবীর সাংসারিক অবস্থা

বেশ খারাপ হয়ে এলো। কাজ ক'রে আরও পয়সা চায়। কাজ পায়না। এ-কাজটা ছাড়তে পারেনা। অভাব, অভাব। কাগজের জন্য লিখতে লাগলো, ভালো ভালো লেখা। প্রত্যেকটা ফিরে আসে। (পরে এই কথা নিয়ে আমার বান্ধবী অনেক হাসাহাসি করেছে—কারণ প্রত্যেকটি article অবিকল পরে কাগজে ছেপেছে, এমনকি দাম দিয়েছে ভালো;—কিন্তু তখন তিনি বিশেষ পদস্থা—বলেন আর হাসেন।) এই অবস্থায় হঠাৎ সে একদিন ও-কাজটাও ছেড়ে দিল। আমি তো শুনে স্তম্ভিত। আর্টিস্ট মহিলাটিকে যতদূর জানতাম খুব ভালো, খুব ভদ্র ব'লে জানতাম। তাঁর সঙ্গ এমনি পাওয়াই একটা বিশেষ ভাগ্যের কথা; অথচ তার ওপরে টাকা। এ কাজ ছাড়লো কেন? আর্টিস্ট তার কাছে একদিন বলে যে, টাকা সে অনায়াসে রোজগার করতে পারে—চেহারা যখন তার এতো ভালো। সে যদি নিরাবরণ হয়ে রোজ দু'ঘণ্টা ক'রে বসে আর ছবি আঁকতে দেয়, বহু টাকা এখুনি সে পাবে ঐ আর্টিস্টের কাছে। শুনেই আমার বান্ধবী পালিয়ে এসেছে। আর্টিস্ট বলেছেন নাকি যে, প্যারিস হোলে এই ধরনের প্রস্তাব বিখ্যাত শিল্পীর কাছ থেকে পাওয়া যে-কেউ শ্লাঘার মনে করতো। কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও ভারতবর্ষ। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন সে পালালো। বুঝলাম যে তার অভাব তাকে অনেকটা ঠেলে এনেছে তার পূর্বপুরুষের আভিজাত্য থেকে বটে। কিন্তু উৎকোচ এবং অভাব, শূন্য কলসী আর নদীর জল পাশাপাশি বেশীদিন রাখা যায়না। কলসীর ক্ষুধা জলকে চাইবেই এবং একদিন কলসী জলে ভরে যাবে। তখন লোকে কলসী দেখিয়ে বলবে—'একটু জল ঢালো তো!'—কলসীর কথা কেউ বলবেনা। সে ধারক, বাহন, আধার মাত্র। কথাটা ভারী সুন্দর করে বলেছিল সে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান সব সময় অহঙ্কার নয়। এবং নিজেকে আর কেউ study করছে এই বোধটা সব সময় বেশ রুচিপ্রদ হয়না, খুব রুচিকর পরিবেশেও। আসল কথাটি, মানুষ বড়ো আজব জীব। আর তার মনটি রামধনু-বাটা রঙে রঙীন। বাতাসে বাতাসে, আলোয় আলোয় বদলাচ্ছেই, বদলাচ্ছেই। বোঝা ভার।—আচ্ছা, শুভরাত্রি! চলি—"

*

শীত করেনি সে-রাতে।

বিক্রম আর গোপী জানতো আমার শীত করে।

ওরা দুজনে একটা বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করেছে, আমায় দিয়েছে ওদের বক্রী একটা তোশক এবং একটা লেপ।

বললে—"দুজনে আমরা এক লেপে, বেশ গরম হবো। আমরা দুই, আপনি নিন্ রুই। সঙ্কোচ করবেন না। বরং গরম হয়ে একটু 'ট্যাগোর' পড়ে পড়ে মানে বোঝান্। বলুন ট্যাগোর থেকে দু-একটা প্রেমের কবিতা—ব্রাউনিং হার মানে এমনি।"

হেসে বলি—"ঐ ব্রাউনিং? ব্যস্? কেন তোমাদের গালীব, জৌক্—এঁরা?"

শুয়ে পড়েছি। আলো নিবে গেছে। বাইরে গ্যাস্‌টা জ্বলছে। এধারে চুল্লীতে গরম জল ফুটছে। তুস্‌সীরাম অগ্নিরক্ষায় ব্যস্ত আছে নিশ্চয়। ওধারে তাঁবুতে দুর্গাপ্রসাদ ঘুমুতে পাচ্ছেনা; পটনায়ক আর সর্দাররা মিলে তাস চালাচ্ছে। "আমার থ্রী হার্টস্ দেখেও থ্রী স্পেড্‌স্ ডাকলে; নো-ট্রাম্প্‌স্ ডাকলেনা?"··· ওধারে মীর্জাপুরের চ্যাংড়াগুলো ফিল্মী গান গাইছে, আর মাঝে মাঝে এমন হল্লা করছে, বোঝা যাচ্ছে অশ্লীল এয়ার্কি করছে পুরোদমে।

বিক্রমের গলা সাড়া দিলো; ও বললে—"প্রেম নয়, কাব্য। শুনুন—

'কোঈ উমীদ্ বর নহীঁ আতী। কোঈ সূরত নজর নহীঁ আতী।
আগে আতী থী হালে দিল্‌পে হঁসী। অব কিসী বাত পর নহীঁ আতী।
হম ওয়াঁহ্ হঁয় জহাঁসে হমকোভী। কুছ হমারি খবর নহীঁ আতী।
মোত্ কা একদিন মোয়ইয়ন্ হ্যয়্। নীঁদ ক্যোঁ রাত ভর নহীঁ আতী।
মরতে হঁয় আরজু মে মরণে কী। মোত্ আতী হ্যয় পর নহীঁ আতী।
কাবে কিস্ মুঁহ সে যাওগে গালীব। শরম তুমকো মগর নহীঁ আতী।' "*

---

* আশাহীন দিন; উপায় বিহীন; এ—কেমন?
কতই হেসেছে ফকির মনেরে হেরিয়া মন!
আজ সেই হাসি নাইরে নাই।
পড়ে আছি আজ—সমাজ যেখানে খবরহীন।
মরণ যখন নিশ্চিত হবে একটি দিন—
চোখে ঘুম কেন নাইরে নাই?
মরণ চাহিয়া মরিয়া মরিয়া মরিব কি?
পলে পলে মরি তবুও মরিনা ভাগ্য কি!
মরণ তবুও নাইরে নাই!
তোমার আবার তীর্থ গালীব! হায়রে হায়!!
কোন্ মুখে যাবে তীর্থ করিতে? যাবে কোথায়?
তোমার মরণ নাইরে নাই।

"আমাদের কবি বলেছেন শোনো"—বললাম আমি—

'আশাহীন দিন কুয়াশায় লীন মলিন উষার স্বর্ণ
কল্পনা যতো বাদুড়ের মতো রাতে ওড়ে কালো বর্ণ
আবর্জনার অচলপুঞ্জে যাত্রার পথ রুদ্ধ
শীর্ণ কুসুম শুষ্ক কুঞ্জে বৈশাখ রহে ক্রুদ্ধ
হঠাৎ তখন কহে মোরে মন মিথ্যে ওসব মিথ্যে
প্রাণে যদি রয় গান অক্ষয় সুর যদি রয় চিত্তে।'"

—ধ্বনিটাই এদের অভিভূত করেছিলো। তবুও অর্থ বলার পর ওরা সমস্ত কবিতাটাই শুনলো।

তখন গোপী বললো—"আচ্ছা, এইধরনটায় কী আছে রবীন্দ্রনাথে বলুন—

'*What if we still ride on we two*
*With life for ever old yet new,*
*Changed not in kind but in degree*
*The instant made eternity,—*
*And heaven just prove that I and she*
*Ride ride together, for ever ride ?*'"

আমি হেসে বলি—"বিলিতী পীচ আর চেরির স্বাদ আম আর পেয়ারায় খুঁজলে পাবে কেন গোপী? রসবস্তুর স্থূলরূপটি আলাদা হলেও, সূক্ষ্মবোধে তারা একই। শোনো রবীন্দ্রনাথের দুটো কবিতা—

'চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল
একথা বলিতে চাও বোলো—
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল
তারপরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাবোনা আমি শপথ তোমার
আসা যাওয়া দু দিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই
আবার আসিতে হয় এসো—
সংশয় যদি হয় তাহে ক্ষতি নেই
তবু ভালো বাসো যদি বেসো ...'

আর একটা এই সঙ্গে শোনো—

'উড়াবো ঊর্ধ্বে বিজয়নিশান দুর্গমপথমাঝে
দুঃখের দিনে দুঃসহতম কাজে—
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাবো
চাইনা শান্তি সান্ত্বনা নাহি চাবো।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছো আমি আছি।'"

ওরা যখন ইংরিজীর মাধ্যমে কবিতার অর্থ উপলব্ধি করলো, তখন উঠলো কাব্যে ধ্বনির স্থান নিয়ে কথা। আমি ধ্বনি-পিয়াসী। তা ব'লে 'শিশুপালবধম্' বেশী ভালবাসিনে 'মেঘদূত'-এর চেয়ে; 'গীতগোবিন্দ' তত ভালবাসিনে যতো ভালো লাগে 'কিরাতার্জুনীয়ম্'। ওদের শোনালাম রবীন্দ্রনাথেরই 'মরণ' কবিতাটি। ··· এতো ভালো লেগেছিলো এ-কবিতার ধ্বনি ওদের যে, আমাকে এর পরেও এ-কবিতা দু'বার ওদের কাছে এক সান্ধ্য-সভায় পড়তে হয়েছিলো।

প্রবাসী বাঙালী আমি। ভুক্তভোগী ও দরদীর অভিজ্ঞতা নিয়ে বলছি—বাংলার কবিতা যদি নাগরী লিপিতে ছাপাবার ব্যবস্থা হয়—বাংলার, বাঙালীর, ভারতীয় এবং সাংস্কৃতিক অনেক উপকার হয়। রসিক যাঁরা তাঁরা অবাঙালী হলেও বাংলার সম্পদ মর্মে মর্মে গ্রহণ করে খুসীতে ভরে উঠবেন।

আমি বলি—"আরও গালীব শুনবো। শোনাও। গালীব সত্যিই চমৎকার কবি!"

এবার গোপী চাঙ্গা হয়ে শোনালো—

"ফির মুঝে দীদ্-অয়ে-তর্ য়াদ আয়া।
দিল্ জ়িগর্ তিষনয়ে ফরিয়াদ আয়া॥
দম লিয়া থা না কয়ামত্ নে হনূজ,—
ফির তেরা ওয়ক্ত্-এ সফর য়াদ আয়া॥
কোঈ বীরানী সী বিরানী হ্যয়্,—
দস্ত্ কো দেখকে ঘর য়াদ আয়া।
ম্যয়্ নে মজ্নু প্যয়্ লড়কপন মে অসদ্—
সঙ্গ্ উঠায়া থা কি সব য়াদ আয়া॥"

[ আবার মনে পড়ে যায় সেই জলভরা চোখ-দুটি ;
হৃদয় আমার শুকিয়ে ওঠে ব্যাকুল তৃষ্ণায়।
সৃষ্টির শেষদিনের সেই প্রলয় বুঝি একটু থেমেছিলো ;—
অমনি মনে এলো তোমার-আমার সেই শেষদিনের কথা।
চেয়ে থাকি শুধু খাঁ-খাঁ শূন্য প্রান্তরের দিকে ;
তবু তো মনে পড়ে যায় একখানি বাসার তৃপ্তি,—যা হয়নি।
হাসতাম ছেলেবেলায় মজনুর গল্প শুনে !
মনে পড়ে যায় আজ সব ; সেই হাসির কথাগুলোও ! ]

সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম অন্ধকারের মধ্য থেকে গেয়ে উঠলো—

"দিল্ হী তো হ্য় না সঙ্-ও-খস্ত্, দর্দ সে ভর ন আয়ে কেঁ্যা ?
রোয়েঙ্গে হম হজার বার, কোঈ হমে সতায়ে কেঁ্যা ?
দয়ের নহীঁ, হরম নহীঁ, দর নহীঁ, আস্তা নহীঁ,
বৈঠে হ্যঁয়্ রহ্-গুজ়র প্যয়্ হম্ কোঈ হমে উঠায়ে কেঁ্যা ?
গালীব্-এ খশ্তা কে বগৈর কৌন সা কাম বন্দ্ হ্যয় ?
রোঈয়ে জ়ার জ়ার কেঁ্যা ? কীজিয়ে হায় হায় কেঁ্যা ?"

[ হয়তো শুধুই হৃদয় ; মানি ; তা ব'লে পাথরও নয়, ইটও নয়।
যদিই ব্যথায় গুমরে ওঠে, উঠতে দোষ কি ?
যদি ( তার ফলে ) কেঁদে-ককিয়ে উঠিও বা কখনও,
তাতে কার কি ? কেন আমায় বিরক্ত করা ?
আমি তো কারুর ঘরে নেই ; কোনো মসজিদে নেই ;
কোনো মন্দিরে যাইনি ; কোনো অট্টালিকায় বাসা বাঁধিনি।
এইতো, পথের ওপরেই বসে আছি।
তবে কেন এতো উঠিয়ে দেবার গরজ ?
গালীব তো এমনিতেই পরতে পরতে ভেঙে পড়ে আছে ;—
তার বিহনে কার কোন্ কাজ আটকালো ?
তবে তাকে নিয়ে এতো চিৎকার, এতো গলাবাজি,
এতো কান্না, এতো হায়-হায় কেন ? কেন ? কেন ? ]

ওরা কাব্য বলে জৌকের, ফিরাকের, হাফিজের, ইকবালের,—আমি বলি রবীন্দ্রনাথ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি থেকে ;—তারপর রাত্রি হয় গভীর গভীরতর। পাইন-বন ডাকতে থাকে। গোপী খানিকক্ষণ আগেই ঘুমিয়েছিল, বিক্রমও ঘুমোয়।

খাদরালার জঙ্গল আর ঘুমোয়না। চোখ বুঁজি, ঘুম আসেনা। নিশির-

ডাকের মতো খাদরালা-অরণ্যের উদ্বেলিত ধ্বনি-তরঙ্গ আমায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রাণপণ চেষ্টা করি লেপের মধ্যে থাকবো ; বেরুবো না। বোঝাই নিজেকে যে আমি বড়ো ক্লান্ত। আজ আমার ঘুমানো উচিত ;—আজ আমি ঘুমাবো। কিন্তু নাঃ—আমায় ডাকছে কে—"শোবে কি গো! দেশে গিয়ে কতো শোবে। এসো এসো, দ্যাখো কতো সেজেছি!"

না বেরুলে দেখতে পেতামনা গিরিচূড়ায় প্রতিফলিত রক্তাভ চন্দ্রালোকের জ্যোতি-তরঙ্গ। ম্লান জ্যোতি ; কিন্তু পাহাড়ের রক্তস্রাব তাতেই যেন বিহ্বল।

আর ডাকছে পাখী। নিরন্তর ডাকছে। কেউ ওর ডাকে সাড়া দেয়না, তবু ডাকছে। ··· যেমন ডাকছে আমার মন। কেউ ওর ডাকে সাড়া দেয়না, তবু ডাকছে।

তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। জাগলাম একেবারে তুল্সীরামের নাড়া পেয়ে—"বাবুসাব্—চা!"

আস্থানা খুব সকাল-সকাল পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করেনি। আমি পরম্পরায় কানাঘুষা শুনলাম যে এখানকার খরচ-খরচা নিয়ে সরকার এবং কংগ্রেসে একটু সমালোচনা হয়েছে। তাতেই আস্থানা একটু মুষড়ে গেছে। মুষড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কীই-বা বয়স ; নতুন উদ্যম, এবং নতুন অভিজ্ঞতা। যেখানে উৎসাহ পাবে আশা করা গিয়েছে, প্রশংসার বদলে সেখানে কটু, মিথ্যা, বক্র উক্তি পেলে ছেলেমানুষ কেন, অভিজ্ঞ মনও মুষড়ে যায়।

গুড় আর ছোলা বিলি করে ফিরে একটা গাছের তলায় বসে নোট্‌স্ লিখছি—একটি ছেলে খবর দিয়ে গেল আস্থানা অফিসে তলব করেছে।

বললাম—"তাঁকে বলো একটু পরে যাচ্ছি।"

আস্থানা ঠোঁটের কোণ দাঁতে কামড়াতে কামড়াতে হাজির। হাতে একগাদা খবরের কাগজ।

"এই নিন্ ক'দিনের কাগজ।"

সত্যিই তো সংবাদপত্র বস্তুটাকেই প্রায় ভুলেছিলাম। রোজই যে জগতের যাবতীয় সংবাদ আমাদের দরকারি তা নয়। রোজই যে দেশের

নেতাদের গতিবিধির, রোজনামচার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন আমাদের সুখপাঠ্য তাও নয়। বিবেচনা করা যাক্, কারুর সুখ-দুঃখের ওপর ভরসা হারিয়ে একটি বিনিদ্র রজনীও কি আমরা যাপন করি? অনাহার, অনিদ্রা যেসব কারণে গৃহস্থ-জীবনে ঘটে থাকে, তার বেশীর-ভাগটাই এইসব তথাকথিত সুখনীড়ের চার-দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ। অথচ খবরের কাগজ মারফত তো তার কোনও খবরই জানতে হয়না। বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়না, খুবই সত্য; কিন্তু ফ্যাকাশে প্রভাত ও পান্‌সে চা-র অত্যাচার সহ্য করতে হয়ই, যদি ভোরবেলায় ধূমায়িত চায়ের বাটির সঙ্গে আন্‌কোরা সংবাদপত্রখানার সাক্ষাৎলাভ না হয়।

তাই খবরের কাগজ যাদের নেশা তাদের প্রয়োজন নেই; যাদের প্রয়োজন তাদের এ নেশা নেই। গৃহস্থের পক্ষে খবরের কাগজ একফালি আকাশ। রোজকার বেগুন, মুলো, রেড়ির তেল আর বাতাসা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কয়েকটি বেকার মুহূর্ত। এই ক'টি মুহূর্ত ঘেঁটে ঘেঁটে একটু তবু হিল্লি, ডিল্লি, বারমুদা আর জেনারেল নাজীব চট্‌কানো যায়, একটু তবু নার্গিশকে দেখা যায়, গ্র্যাণ্ড-হোটেলের নাচের বায়নায় চোখ বোলানো যায়, সম্মানিত আই.সি.এস্.-এর খিট্‌কেল গলাধঃকরণ করা যায়; একটু তবু ক্ষণিকের তরে রাজনৈতিক মুরুব্বী আর আর্ট-সমালোচক, খেলা-মাতব্বর আর বাজেট-চাঁই সাজা যায়। সবজান্তা হবারও এমন কল নেই; সব ঘুরিয়ে আনারও এমন পুষ্পকরথ বা কমেট-এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ নেই।

আমিও খবরের কাগজের নেশায় মত্ত একটি পাঁড়। এ ক'দিন খবরের কাগজ ছাড়া ছিলাম ভাবতেও যেন গা কেমন করছে। সাগ্রহে কাগজগুলো নিলাম।

"তারপর কাজ কেমন চলেছে?"

"চমৎকার! আপনি ভাববেন না, আস্থানা।"

"কিন্তু কাগজওলারা যা-তা লিখছে, পড়ে দেখুন।"

"কোন্ কাগজ?"

"*Times of India.*"

"দমবেন না। ওরা যে আসেনি। লিখবেই খারাপ। কিন্তু যারা এসেছিল?"

"*Hindusthan Times* ভালো লিখেছে ; *Statesman*-ও ভালো। তা ছাড়া Congress-এর খাস কাগজ যেটা দপ্তর থেকে বের হয়, সেটায় খুব ভালো বলছে। Working Committee আলাদা resolution করে ফেলেছে।"

"তবে আর কি ?"

"না, কিছু নয় তেমন। তবে আমরা নাকি অনেক খরচ করিয়ে ফেলেছি। এর অর্ধেক খরচে নাকি এতটা কাজ হয়ে যেত।"

"হয়নি কেন তবে ?" আমি এই ধরনের কথায় চটে উঠতাম।

"কি জানি ?"

"কি জানি কি মশায় ? আপনি না এই Camp-এর Director ? আপনার বিশেষ করে জেনে নেওয়া দরকার কেন এতদিন হয়নি। আমি বলছি, কেন হয়নি। খাদরালার জঙ্গল, জলের কষ্ট, লোকাভাব, স্থানীয় লোকের জড়তা ও আলস্য, সর্বোপরি শাসনকর্তাদের গেঁতোমি এই দশহাজার ফুটের মাথায় বড়ো বেশী কার্যকরী করে তুলতে পারেনি রাস্তাঘাট তৈরী করার সুখস্বপ্নকে। এখন এই ছেলেরা এসে এই কঠিন তিনটি মাইল করে দিলো, এখন দিব্যি চলবে এদের কাজ। টাকা আর টাকা! এই ছেলেগুলো এসে এসব কাজ করে গেল, একটা আদর্শকে রূপ দিয়ে গেল, সেসব কিছু নয়। মশায়, এক আনায় একরাশ পলাশফুল কিনতে পারেন। তারই ছবি একখানা তেমন-তেমন শিল্পীর আঁকা কিনতে যান—দাম হাজার টাকা। বাগানে কচুগাছ না করে লোকে রজনীগন্ধা করে কেন ? টাকা, টাকা! Finance-এর কর্তারা যদি planning-এ থাকতেন, ম্যাজিস্ট্রেট যদি মিনিস্টার হোতো, executive যদি policy করতে যেতো—জাতি ধ্বংস হয়ে যেতো। টাকা, টাকা!"

আস্থানা আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললো—"আপনি নেমে গিয়েই একটা article লিখবেন! কেমন!"

"আলবৎ, ওসবে দোস্ত্‌ খুব মজবুত!" ব'লেই দাঁড়ালো ডাক্তার। "কথা আর লেখা! কুঁড়েদের দুটো কাজ শিক্ষকদের একচেটিয়া।"

"আচ্ছা ডাক্তার, কোন্‌ পরিশ্রমকে তোমরা বড়ো মনে করো—পৈশিক না স্নায়বিক, হাত-পা'র কাজ না মস্তিষ্কের ?"

ডাক্তার বললে—"মস্তিষ্ক যদি না থাকতো মানুষ আরামে থাকতো! তুমি যদি না থাকতে, ভার্মা-বাইসারিয়া কত আরামে থাকতো!"

হাসি আস্থানার সহ্য হয়না, ও-মুখে মানায়ও না। কেমন ঠোঁটের কোণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছালের টুকরো দাঁতে কাটাই ওকে মানিয়ে গেছে ও মানায়।

ও বললে—"হ্যাঁ, ব্যাপারটা কী হয়েছিলো বলুন তো প্রিন্সিপ্যাল-সাব্। আপনি drastic action নিয়ে বসলেন। ওরা কোন্ ঘরানার ছেলে জানেন?"

"কোন্ ঘরানার জানি বৈকি! খাদরালা-ক্যাম্প-ঘরানার। এ ছাড়া কোনও জাতি গোত্র নেই আমাদের।"

ডাক্তার বললে—"আস্থানা-সাহেব, আপনাদের ভুল হয়েছে বদরসিক এই মাস্টারকে সঙ্গে আনা। ওরা কি বুঝবে কেন এই ছোঁড়াগুলো এদিক-ওদিক ধায়। আমি আজ থেকে এই বদলোকটার ভার নিলাম। আপনি ওদের মুক্ত করে দিন। ওরা চরে বেড়াক। তারপর খবরের কাগজে যা বেরুবার বেরুবে। সে 'কেয়ার' কে করে?"

আস্থানার যেন টনক নড়লো। "না না; সেকি কথা! খবরের কাগজ বাদ দিয়ে চলতে বলার কথাই নয়। কিন্তু বদনাম ছড়িয়ে পড়বে এইসব drastic steps নিলে!"

ডাক্তার বললে—"না নিলে? সে কেমন নাম ছড়াবে, আস্থানা?"

বুঝলাম আস্থানার মনোভাব।

রাগ করে স্থানত্যাগেন সোজা চলে গেলাম সেই চটিটাতে যেখানে চা পাওয়া যাবে। সকালবেলায় আমায় ঐ চটিতে দেখে চটিওলা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সসম্মানে বেঞ্চিটার ওপরটা ঝেড়ে দিল। ঢালাও হুকুম দিলাম—"খুব ভালো করে চা দাও আর এক প্লেট অম্লেট।"

সামনের দেয়ালে ছোট্ট একটি ফুকুর,—ভালো বাংলায় গবাক্ষ বলা চলে। তা দিয়ে খাদরালার দূরের পাহাড়ের বন দেখা যায়। চক্‌চক্ করছে দিগন্তের গিরিশিখরে তুষারস্তূপ। তার নীচে খানিকটা ধোঁয়াটে। তারপরেই সবুজের ঢলাঢলি আর রহস্যের নিবিড়তা।

টেবিলে কাগজ রেখে লিখতে বসলাম। সামনে পটে করে চা। এক প্লেটে তাজা-ডিম-ভাঙা অম্লেট। সঙ্গে পাহাড়ী ব্যাঙের-ছাতার সুস্বাদু

সাচার। সুন্দর তার। অমনটা আর কোথাও খাইনি। এতো যে নাম অ্যাস্‌প্যারাগাস্‌-স্যুপের, যার গন্ধটি একেবারে প্রথম প্রেমের মতো মনকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়, তাকেও হার মানায়। এই ছত্রকটির নাম আদায় করা গেলনা; জরানো সোজাসুজি ভিনিগারে, তাও দিশী চোলানো ভিনিগার। তার সঙ্গে ওপর থেকে ছড়িয়ে দিয়েছে ভাজা জিরের গুঁড়ো একটুখানি। ঝাঁঝের জন্য পুরো একটা টুকরো খাওয়া যায়না একসঙ্গে, কিন্তু একটুকরো অম্‌লেটের সঙ্গে তার স্বাদ যেন সব-কিছু বিলাসকে ছাপিয়ে উঠেছে। জল-ফড়িং যেমন হাল্‌কা পাখার ভরে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেচে চলে যায়, রচনা করে যায় জলের ওপর ছোটো ছোটো আবর্ত, তেমনি কোমল রেখাপাত ক'রে গেলো ঐ অপূর্ব ব্যাঙের-ছাতার স্বাদ আমার চিত্তের রসসায়রে।

একটা কথা মনে পড়ে এইসূত্রে। বিদেশে থাকতে দেখেছি, ওরা বিচিত্র ভাবে mushroom (ব্যাঙের-ছাতা)-এর চাষ ক'রে প্রচুর উপার্জন করে। আমাদের দেশেও পাঞ্জাব, কাশ্মীর, পাহাড়ী এলাকায় mushroom-এর সুপ্রচুর ব্যবহার। বিশেষ করে নিরামিষাশীর মধ্যে। Mushroom হবার ঋতুতে mushroom সংগ্রহ করে, শুকিয়ে বেচে। রাঁধতে হয় শুকনো ছোলার মতো সারারাত ভিজিয়ে রেখে। দাম প্রায় ষোলো থেকে কুড়ি টাকা সের। কিন্তু আমেরিকানরা, ক্যানাডিয়ানরা, অস্ট্রেলিয়ানরাও রীতিমতো বিশিষ্ট পদ্ধতিতে mushroom-এর চাষ করে। টিনে প্যাক ক'রে রপ্তানি করে দেশ-বিদেশে। সুস্বাদু, পুষ্টিকর এই খাদ্যটির খাতির বিদেশে খুব। আমাদের দেশে এর তেমন প্রচার নেই। এর স্বাদুতাও অপরিচয়ের ফলে প্রায় অবহেলিত।

ব্যাঙের-ছাতার প্রসাদে মন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। বেশ লিখছি তন্ময় হয়ে। হঠাৎ আস্থানা এসে হাজির। বুঝতে পেরেছে চটেছি। অনেকটা আলোচনার পর স্থির হোলো যে ওরা আজ ছাড়ান পাবে বটে, কিন্তু ক্যাম্পে ওদের মাথা যাতে হেঁট না হয় সে-ব্যবস্থাও করতে হবে।

আমি বললাম—"সিন্‌হাকে তাড়াতেই হবে।"

আস্থানা বললো—"ওকে আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। খুব বকে দিয়েছি। এখন ও ঠিক থাকবে। কিন্তু ক্যাম্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওকে ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা।"

এইসঙ্গে ঠিক হয়ে গেল আজ বিকেলে প্রথম বক্তৃতা-সভা আহূত করা হবে।

বিষয় হবে : 'দেশে যুব-সংঘটনের দায়িত্ব, উপযোগ ও পরিকল্পনা'। আস্থানা মোটামুটি খুশী করেই দিয়ে গেল। ও পেল ওর বন্ধুদের মুক্তি, আমি পেলাম দুর্গাপ্রসাদের প্রস্তাবিত সভার সূত্রপাত।

*

তাঁবুতে আজ চড়া রোদ। জামা কাপড় বিছানা ইত্যাদি রোদে দিয়ে দিয়েছে গোপী ও বিক্রম। আমি একটা ছোট্ট হ্যামক-মতো করে নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছি এবং দুপুরের আরামে সুখালস-পরিপুর উদ্বেলিত মুহূর্তগুলি উপভোগ করছি। কন্‌কনে শীতের পর ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে চড়া রোদ যেন তখন লাগছে পঞ্চমে বাঁধা গলায় মিয়াঁমল্লারের সঙ্গে সরোদের ভরাট সঙ্গত। পাখোয়াজের সঙ্গে ভৈরবীর মিলাপ। আকাশ ঘন নীল। ধবধবে সাদা মেঘের পানসী ভেসে যায়না, থেমে-থেমে চেয়ে-চেয়ে দেখে-দেখে পথ চলে। পাখীর দল উড়ে চলে দক্ষিণ-পানে। যায় বুঝি সিংহলে, কি অস্ট্রেলিয়ায়, কি মাদাগাস্কার, কে জানে। ওপরের বন থেকে একটা খট্‌খট্‌ শব্দ আসছে—হঠাৎ শুনলে কাঠঠোক্‌রা মনে হয়।

বিক্রম ডাকলো—"চা খাবেন ?"

চম্‌কে চেয়ে দেখি গরম চা।

তাঁবুর ভেতরটা চমৎকার গুছিয়েছে। ধবধবে সাদা চাদর বিছিয়েছে। ডাকছে যেন তাঁবু।

দুর্গাপ্রসাদ বড়ো খুশী। বহু ছেলে জড়ো হয়েছে। যারা দুপুরের আরাম উপভোগ করে, আরামের হাতেই বন্দী, তারা ছাড়া আর-সবাই এসেছে। ডাইনিং-হলের সামনের খোলা জায়গায় সবাই বসেছি। বিষয়টার অবতারণা করে বাইসারিয়াই প্রথম বললো। চমৎকার বললো। তারপর চলতে লাগলো বক্তৃতা প্রদেশ হতে প্রদেশের। বেশ ভালো স্তরের আলোচনা। তাজা মন লাগাম-ছাড়া হয়ে খোলাখুলি পরিচয় দিচ্ছে নিজের আদর্শবাদকে, ভালো হবেনা কেন ? সবশেষে বললো আস্থানা।

সভাটা হওয়া এবং তাতে সকলের মতামত পাবার সুযোগে সবাই যেন বর্তে গেল। সেদিন বিকালবেলাটায় আর-কেউ গ্রাম, গ্রামান্তর, দূরের চাহনি, নিকটের স্বর্গ নিয়ে কথা বলেনি ; দুর্গাপ্রসাদ আনন্দে যেন ফেটে পড়ছে।

দূরে, খুব দূরে, সোজা পথ বেয়ে চলে গেছি। একটা নির্জন পাহাড়ী পথ নীচে নেমে গেছে। পথ ভেবে নেমে যাচ্ছি। দেখি পথ নয়। মাত্র পাহাড়ের ঢাল, ঘাসে ঢাকা। কোনও গাছ নেই। খানিকটা নেমে থেমে গেছে। প্রান্তে গভীর খাদ। নিস্তব্ধ নির্জন একটি আঙিনা যেন। বসে বসে গান গাইছি।

বুদ্ধু আর তিন-চারটি কে ছেলে।

"বা দাদা, একা বসে বসে বেশ গান গাইছেন। আর আমাদের শোনাতে বললেই···"

ওরা হাঁপাচ্ছে।

"দাঁড়ান, পরিচয় করিয়ে দিই। অমর চৌধুরী, দিল্লীর ছেলে, জানেনই। এর নাম হোলো প্রফেসর নির্মল ব্যানার্জী—কোলকাতার কোনো কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক, ইনি দিলীপ—দিলীপ,—কী ভাই?···"

"দিলীপ রায়"—বললো ছেলেটি। "এখনও পড়ি।"

"আর এটার পরিচয় নেবেন না, দাদা; একেবারে বাজে, নিরেট, গবেট···"

হাসি পড়ে গেল। দুজনায় ছোটোখাটো একটু দ্বন্দ্বযুদ্ধও হয়ে গেল।

"অধ্যাপক? এতো অল্প বয়স? কলকাতার কলেজ-ক্লাস—ফার্স্ট্ ইয়ার ক্লাস!—বিশ্বসংসারে এর চেয়ে মারাত্মক কাজ আছে ব'লে আমার জানা নেই। অ্যাটমাইজ্‌ড্ টাইম-বমের ওপরে গা এলিয়ে কবিতা লেখার চেয়েও দুঃসাহসিক কর্ম কোলকাতার বুকে কোনো কলেজে ফার্স্ট্ ইয়ার ক্লাস পড়ানো—শোনো কথা। আমার এক বন্ধু—ভালো শিক্ষক, সত্যি ভালো,—চোখের জল ফেলতে ফেলতে পালিয়ে বেঁচেছেন। তুমি পারো কি করে?"

খদ্দর পরে। বেঁটে-খাটো সহজ ছেলে। দুঃখে কষ্টে মানুষ বোঝা যায়। মনটায় চাপা আগুন। বাহিরটায় তত স্ফুরণ নেই। চিরদিনের বাংলার ভাঁড়ারের ইন্ধন, যা চিরদিন জ্বলে এলো মহাভারতের স্বাধীনতার যজ্ঞে। শক্ত দাঁত, মুখে একটু বেশী দাগ, বসন্ত বা ব্রণ বা দুই-ই। দিলীপ সে-তুলনায় সৌখীন, ভাববিলাসী, বাংলার তরুণমনের চিরন্তন ছবি। আমাদের সুবোধ থাকলে বলতো 'উত্তীয়-মার্কা ছেলে'। প্রেমের ফাঁসে জড়িয়ে, পরের জন্য প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু আরও দেখলে বোঝা যায়—রোম্যান্টিক হলেও আদর্শ মানে, এবং লেখাপড়াটা করে।

বিনয়ের কথা আগে বলেছি। চতুর্থ ছেলেটির নাম বোধহয় পরিতোষ কি রাখাল দাস। ঠিক মনে নেই। রাখালই বলবো। সত্যি দরিদ্র, পরিশ্রমী, সদালাপী ছেলে। বাংলামায়ের সতীন-পো যেন! হেলায় অছেদ্দায় মানুষ —কিন্তু 'মানুষ'। কঠোর পরিশ্রম করতে পারে। এখানে এসে বোম্বাই, য়ুপী, দিল্লী, পাঞ্জাবের ছেলেদের বিলাসিতা, চাকচিক্য, তুবড়ি-ছোটানো ইংরিজী দেখেশুনে হক্‌চকিয়ে গেছে। কেমন একটা complex জন্মে গেছে। বাংলায় বলা যায়, কেমন যেন 'ম্যেদা মেরে' গেছে।

নির্মল বললে—"অনেকদিন কথা বলবো-বলবো ভাবছি, সুযোগ পাচ্ছিনা।"

দিলীপ বললে—"আমি আপনার পাশের গুজরাতীদের ক্যাম্পে। কিন্তু জানতামই না আপনি বাঙালী। এমন বিশ্রীরকম উর্দু বলেন যে—"

সম্পূর্ণ করলো বুদ্ধু—"ও-মুখ দিয়ে আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা বেরুনো উচিত নয়।"

নির্মল অভিমান করে যা বললো তার অর্থ এই যে, ওদের দাদা হ'য়ে আমার এইভাবে সরে সরে থাকাটা আদৌ ভালো নয়। বাঙালীদেরই একটা দল হোক, যদিও ও চায়না, তবুও মাঝে-মিশেলে আমাদের একসঙ্গে থাকা ভালো।

বুদ্ধু খাপ্পা। "মাঝে-মিশেলে? মাঝে-মিশেলেই বা কেন? ওদের নেই? সব province একটা করে দল হাঁকড়েছে। সবাই দল বেঁধে বেড়াচ্ছে, আমরা করলেই provincialism?"

আমি চাইলাম বুদ্ধুর দিকে।

বুদ্ধু অমনি ব'লে উঠলো—"হ্যাঁ, আপনি তো খালি আমায় ধমকান। আমি জানি আপনি provincialism শুনলেই চটেন। কিন্তু ওদের এই ঘোরাকে আপনি কী বলবেন?"

হেসে বললাম—"খুব ভালো। তোমরাও তাই করো।"

রাখাল বললে—"আর আপনি?"

"সবাই কি আর ভালো কাজ করবার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মায়, না, ভালো কাজ করে। আমি মন্দ কাজ করেই বেশী তৃপ্ত।"

দিলীপ বললে—"এ তো আপনার sentimentalism। এ তো আপনার প্রাণের কথা নয়। এড়িয়ে যাচ্ছেন। এবং আজ এই মুহূর্তে আলোচনা-প্রসঙ্গের যে ধারা তাতে বলতে পারা যায় আমাদের অপমানই করছেন।"

"তোমরাও অপমান করে চলে যাও।"

রাখাল বললে—"তা কেন করবো। আপনি অন্যায় করলেই আমরাও কেন অন্যায় করবো ?"

আমি বললাম—"করতে নেই বুঝি ?"

রাখাল বললে—"না।"

"তোমায় তো বুদ্ধু নিরেট বলেছে। তোমার মতটাও হয়তো নিরেট। সবার তোমার মতে সায় নাও থাকতে পারে।"

দিলীপ আর অমর ব'লে উঠলো একসঙ্গে—"সেকি কথা—আপনাকে অপমান আমরা কেন করবো ? আপনি করলেও করবোনা।"

আমি জোর দিয়ে বললাম—"কিন্তু কেন ? আমি যদি করি তো, তোমরাও কেন করবেনা ?"

বুদ্ধু বাণী দিলো—"অন্যায়ের প্রতিবাদে অন্যায় করা যায়না।"

নির্মল হাসিতে ফেটে পড়লো। খুব হাসতে লাগলো।

নির্মলের হাসি দেখে রাখাল তো চ'টে আগুন। "হাসি !! হাসির কী দেখলেন ওর কথায়। খুবই সত্যিকথা বলেছে।"

নির্মল তখন হাসতে হাসতেই ব'লে—"ওরে অর্ধসিদ্ধ বুনো-কচুর দল, তোরা যদি স্বীকারই করিস্ অন্যায়ের প্রতিবাদে অন্যায় করা সভ্যনীতি নয়, তখন আবার ওদের প্রাদেশিকতার প্রতিবাদে তোদের প্রাদেশিকতাকে সমর্থন করিস্ কোন অর্ধদগ্ধ মুখে ! স্তব্ তোদের চটিয়ে দিয়ে এই কথাটাই আদায় করে নিলেন।"

বুদ্ধু ও রাখাল বলতে লাগলো—"ওঃ, আপনি তো সাংঘাতিক লোক !"

দিলীপ আর নির্মল হাসতে লাগলো।

যাক্, provincialism-ই বজায় রইল। ওরা যখন বললো—সন্ধ্যায় আমরা ঘণ্টাখানেকের জন্য মিলিত হবো কেবল সাহিত্য-আলোচনা করতে, তখন আমি রাজী হয়ে গেলাম এবং বললাম—"গোপী, বিক্রম, ভৌমিক, এবং দরকার হলে ডাক্তারকেও সঙ্গে ডাকা যাবে।" ওরা এটুকু স্বাধীনতা দিল আমায়।

আমাদের সাহিত্য-সংসদের পত্তন হোলো। হিমালয়ের তুঙ্গে সাহিত্য-সংসদ আরও আছে অনেক। কিন্তু দশহাজার ফুটের মাথায় নিবিড় জঙ্গলে বাংলা

সাহিত্য-সংসদ বোধহয় এই প্রথম। এই সাহিত্য-সংসদে খুব ভালো ভালো রসঘন আলোচনা চলেছে। খুব ভালো না হলেও, রসোত্তীর্ণ লেখা পড়া হয়েছে; মনোজ্ঞ অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা গেছে, আর শোনা গেছে গান। গান, গান, বহু গান। যদিও অল্পদিনের সাহিত্য-সংসদ তথাপি বেশ মনে আছে সেই সন্ধ্যাগুলো। সেজন্য আমি ঋণী একান্তভাবে বুদ্ধুর কাছে; এবং সুহৃদ-ভাবে নির্মলের কাছে।

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে গোপী আর বিক্রমের সঙ্গে আলোচনা হতে লাগলো রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উৎকর্ষ নিয়ে। ওদের বলতে হোলো যে কোনো 'ভালো' বোঝাতে গেলে, 'ভালো'র একটা সহজবোধ্য সংজ্ঞা থাকা দরকার। তোমার 'ভালো'র আর আমার 'ভালো'র একজায়গায় মেলা চাই। ওরাই বললো যে, ওয়ার্ডস্বার্থের *Imitation Ode*, বা *Tintern Abbey*, শেলীর *Adonais*, বা *Epipsychidion*, কীট্‌সের *Nightingale Ode*, বা রসেটীর *Blessed Damozel* ওদের 'ভালো' লাগে। 'ভালো' লাগার একটা মান স্থিরীকৃত হোলো। তারপর বোঝাতে লাগলাম *Tintern Abbey*-র চেয়ে কতো 'বড়ো' কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে'; *Imitation Ode* আর 'বলাকা'য় কেন কোনও তুলনা হয়না; শেলীর ভাবালুতার রং আর সুরের সঙ্গে কোথায় রবীন্দ্রনাথ মিশিয়ে দিয়েছেন বস্তুর সোনা, চিন্তার রাজ্য;—বোঝালাম Rossetti বা Pre-Raphaelite-দের একসঙ্গে গুলে ফেলে punch করার ফলেও একটি 'পতিতা' বা একটি 'বিজয়িনী' বেরুবেনা। রোমান্টিক সুরগ্রামে আধ্যাত্মিকতার চিরমানবতার, বিশ্ববোধের এমন সঙ্গীত পরিবেশন, এমন সুকোমল হৃদয়ধোয়া মীড় তুলে বর্ণ, রূপ ও রসের সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া আর হয়নি গো হয়নি। কবি কালিদাস-ও শব্দবর্ণব্যঞ্জনায় আমাদের কবিকে অনেক আক্কেল দিলেও, শেষের পিঠটা রবীন্দ্রনাথই নিয়েছেন। কে জিতেছে সে-গণনা মহাকাল করে যাচ্ছেন। ফলাফল জানা যাবে। দ্যাখো, আমি গালিব, জৌক্, ফিরাক্, বচ্চন্ পড়েছি; সুরদাস, কবীর, মীরা বা বিদ্যাপতি পড়েছি। ভালো ভালো চীনা-জাপানী পদ্য পড়েছি। অমন যে ফার্সী কবিতা তাও দেখেছি। সবাই বড়ো, সবাই ভালো; সত্যিই ইংরাজী লিরিকের মতো সম্পদ যে-কোনও জাতিকে ভাগ্যবান করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন একটা লোকোত্তর বিস্ময়। কবিতার সংজ্ঞা, কবিতার পরিবেশ, সীমা, ধারণা, রূপ—সবই যেন তিনি একার

হাতে বদলে দিয়ে গেছেন। দু'-লাইনে তত্ত্বকথা শোনানোয় ফার্সীর জুড়ি নেই; উর্দু তার দোস্ত্ সাগরেদ; আরো ছোটো ক'রে, কথা-না-বলাকেই আর্ট ক'রে, নীরবতা দিয়ে কাব্যরচনায় চীনদেশ সেরা। কিন্তু স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, ইহকাল-পরকাল সবই কবিতার পেয়ালায় ধরে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ যেন ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছেন; এক-একখানা বই এক-একটা experiment,—জীবনের শেষ পর্যন্ত experiment করে গেছেন। যারা বুঝতে পারেনি তারা নিন্দে করেছে। যারা এটা ভালবেসেছে তারা ওটাকে রাবিশ বলেছে; যারা এটাকে রাবিশ বলেছে তারা ওটাকে ভালো বলেছে। রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি খেয়ে হজম করেছে এমন লোক কম। দু'-চারজন যাঁরা আছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথ-ভক্ত নন্— 'গুরুদেব'-ভক্ত। তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হওয়ায় একটা সূক্ষ্ম বিপদ ছিল। আপনার অস্তিত্বকে, ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলতে হয় অমন সর্বগ্রাসী প্রতিভাময়, স্নেহময় পুরুষের কাছে এলে। ভক্তের কথা সত্যিই সব সময়ে সঠিক কথা নয়। দূরে বসে তাঁর সান্নিধ্য না পেয়ে, মাত্র তাঁর কাব্যময় সত্তা থেকে তাঁকে যারা জেনেছে, এমন জ্ঞানী সুরসিক ভাগ্যবান খুব কম আছে। একবার কাশীর একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকের কাছে জানতে চাই 'বলাকা'র কবিতাগুলির অর্থ। তিনি বললেন—"আগে 'কণাদ' পড়ো, Bergson পড়ো। তখন বুঝবে 'বলাকা'র প্রাণস্পন্দন কোথায়।" আমি বিরক্ত হয়েছিলাম ব'লে বললেন— "অসহিষ্ণু অধিকারী হয়না রবীন্দ্রচিত্তমন্থনজাত সুধাকলসের।"—এই গেল বিখ্যাত দার্শনিকের কথা। রবীন্দ্রনাথের লিরিক একধরনের আলেয়া। লিরিকের লণ্ঠন ঢুলিয়ে মনকে তিনি নিয়ে যান অবাঙ্মনসগোচর লোকে। ভারতবর্ষ ছাড়া অর্থাৎ ষড়দর্শনের দেশ ছাড়া, গৌতমবুদ্ধের দেশ ছাড়া তাঁকে পেতেও না, বুঝতেও না। পশ্চিম রবীন্দ্রনাথকে আজও বোঝেনি। যেদিন বুঝবে সেদিন পলিটিক্সের দেনা অনেক কমে যাবে।"

ওরা যেন অভিভূত। আমি যেন মাতাল। নিজের গলা নিজের কাছেই যেন ঘড়ঘড়ে ব'লে বোধ হতে লাগলো।

গোপী বললে—"কেউ কারুকে, কোনো কারণে, এতো ভক্তিশ্রদ্ধাভরে ভালবাসে দেখলেও প্রাণটায় আশা ভরে ওঠে।—গুড্ নাইট্, স্যার, গুড্ নাইট্!"

বিক্রম বললে—"আমি কা'ল থেকে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ শুনবো। হিন্দী খুব ভালো জানি। আমি বুঝতে পারবো। বোঝাবেন?"

"হ্যাঁ"—ব'লেই গাইলাম—"আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে!"

গানটা শুনে বিক্রম বললো—"অদ্ভুত, অদ্ভুত—যেমন ধ্বনি, তেমনি রূপ। আর কী metaphor! Symbolism আর metaphor যেখানে এক হয়ে যায় সেখানটাতেই কাব্য।"

আমি বলি—"যেন আকাশ আর পৃথিবী এক হয়ে যাবার বাসরে চাঁদের জাগা, সূর্যের ঘুম।"

*

অনেক রাত।—

ডাক্তার আজ খুব টেনেছে। ডেকেও পাইনি। ওর সঙ্গে কাল থাকবো। ডাক্তার আবার এতো ঘন ঘন বেহেড্ হয়ে পড়তে লাগলো কেন?

হঠাৎ বুদ্ধু এসে খবর দিলে—"দাদা, শীগ্‌গির আপনি চলুন। মহারাষ্ট্র বিদ্রোহ করেছে।"

"মহারাষ্ট্র-বিদ্রোহ চৌথ দিলেই শেষ হয়, বুদ্ধু; ইতিহাস সাক্ষ্য। জুলুম-জোরে মহারাষ্ট্র-বিদ্রোহ কোনওদিন আয়ত্তে আসেনি।"

"কী চৌথ দেবেন?"

"ওরা অসুস্থ। ওদের কাছ থেকে সুস্থ সবল চিন্তা আশা না করা ভালো। চাইছে যেতে, যেতে দাও। ওরা গেলে ক্যাম্পের কোনও ক্ষতি হবেনা, এবং ওদের মনও খুসী থাকবে। এই চৌথ।"

আস্থানাকে বলতে, ও বললো—"না না, এ হতে পারেনা। আপনি যা-ই বলুন, দায়িত্ব তো আমারই। আমায় ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে।"

নিজের তাঁবুতে চিত হয়ে শুয়েছিল আস্থানা। কটিবাস ছাড়া সেই দেহ সম্পূর্ণ নিরাবরণ। একটা পাহাড়ী তার শরীরে তৈলমর্দন করছে। আশেপাশে সাঙ্গোপাঙ্গ বসে। থমথমে মুখের ভাব। কোটীর মেলার পর অপমানের পাল্‌টা নিতে চায় ব্যক্তিগতভাবে আমায় হেঁট করে। মহারাষ্ট্র-দলের বিপত্তি যেন আমার রচনা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, সমগ্র জগতের ইতিহাসে ছোটো ছোটো ব্যক্তিগত রেষারেষিই পরে দীর্ঘকালব্যাপী দাবানল সৃষ্টি করেছে; লোকক্ষয় ধনক্ষয় থেকে শুরু করে স্বাধীনতাক্ষয় পর্যন্ত ঘটে গেল এই ব্যক্তিগত রেষারেষিতে। এ্যানেবোলিনের বিবাহের ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই আর্মাডা,

মেরী কুইন অফ্ স্কটের হত্যা, ইংলণ্ড-স্কটল্যাণ্ডে রেষারেষি ; রাজা ফিলিপ এবং তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিগত মনোভাবের বিকৃত রূপ থেকে আলেক্‌জাণ্ডারের দীর্ঘ রক্তক্ষয়া ইতিহাস। দারা আর আওরংজেবে যদি মিল হোতো ছেলেবেলা থেকে, ভারতবর্ষে অন্য ইতিহাস রচিত হোতো; শাহ্‌জীর স্ত্রীর প্রতি বিজাপুরের অসৌজন্য, ঘসেটী বেগমের সঙ্গে সিরাজের মার দ্বন্দ্ব, বেগম সমরুর দুরন্ত প্রেম ফরাসী সৈনিকের প্রতি—ছোটো ছোটো এইসব ঘটনাকে আশ্রয় করে কী ঘটনাই ঘটে গেছে! একা রঘুনাথ রাও যদি ব্যক্তিগত জীবনে একটু সরল, উদার হতেন, ভারতের ইতিহাসের ধারা বদলে যেতোই। ব্যক্তিগত ভাব-অভাব রাষ্ট্রকে শক্তিহীন করেছে ইতিহাসে এর নজীর ভূরি ভূরি। ছোটো একটুখানি হলেও মূলশক্তির বাহক হিসাবে স্ফুলিঙ্গ আর দাবানলে প্রভেদ কোথায়? আজকের শিশির-ই কালকের প্রলয় পয়োধি।

শান্ত হয়ে বললাম—"আপনার দায়িত্ব ব'লেই আপনাকে ভেবে কাজ করতে হবে। ক্যাম্পটা তো বন্দীশিবির নয়। যাদের এনেছেন, সকলেই স্বেচ্ছাসেবক। বড়োজোর ওদের বোঝাতে পারেন, এমনকি সারা ক্যাম্পকে ডেকে মত নিতে পারেন। কিন্তু ওদের এমন করে বন্দীর কোঠায় ফেলা সমীচীন হবেনা।"

তৈলমর্দন চলছিল। ভর্মা বললে—"আমার মনে হয়, যাঁর দায়িত্ব তাঁর ওপরে ছেড়ে দিলেই ভালো হয়। আপনি কাজ দেখার যে ভার নিয়েছেন সেটাই দেখুন।"

আমি মাথা গরম করতে পারিনা। সব পণ্ড হবে। আমি হেসে বললাম—"এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে?"

কিন্তু আনন্দ টিঁকলোনা। বিকেলে মীটিং করা হোলো। সমস্ত ক্যাম্প প্রতীক্ষা করছে এই অভাবিত নাটকীয় পরিস্থিতির ফলাফল দেখার জন্য। ক্যাম্পের কিছু ছেলে অসুস্থ ব'লে অব্যাহতি চায়, বাড়ী ফিরতে চায়। তাদের অসুস্থতা কাজ না করার অছিলা, তাদের পরিচর্যা ও সেবার ভার নেওয়া সত্ত্বেও তাদের ফিরে যাবার বাসনা একরকম কাপুরুষতা, তাদের দেশ বেড়াবার সখ মিটেছে তাই তারা ফিরছে—ইত্যাদি অবান্তর কথায়-বার্তায় তাদের মন বিষাক্ত করা হয়েছে। এখন সারা ক্যাম্পের দরবারে তাদের বিচার করবার দায়িত্ব নিয়েছেন আস্থানা। আমি আর ডাক্তার দূরে বসে কেবল নিরীক্ষণ করছিলাম। ক্যাম্পে দুটো মত। একটা ওদের বাধ্য করা হোক থাকতে;

অন্তটা এই সুন্দর পরিবেশে বাধ্যবাধকতার জুলুম একেবারে অস্বীকার্য। তুমুল বিতণ্ডা। খানিকটা পরেই গোলমাল।

এর মধ্যে বম্বে-দল অদ্ভুত মনোবলের পরিচয় দিলে। পারীখ ব'লে সুশ্রী দীর্ঘাবয়ব ছেলেটি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললে—"বাধা কেউ দিতে পারেনা। সে-কথা ওঠেনা। পায়ে হেঁটে যেতে হয় তারা যাবে কেবল বাধার বিপক্ষতা করতেই। কিন্তু তারা চলে যচ্ছে বা তাদের যেতে হচ্ছে এটাই তাদের লজ্জার কারণ। ক্যাম্প অনুমোদন করুন যে যারা অসুস্থ তারা ফিরে যাক্, যারা সুস্থ তারা সানন্দে কাজে হাত দেবে। এতে পৃষ্ঠভঙ্গের কোনও কথা নেই।"

কিন্তু কী একটা উক্তি করেছে আস্থানা—দূরে বসে শুনিনি। কেউ বলে বলেছে 'বাধ্য করবই', কেউ বলে আর-কিছু। বম্বে-দল সভা ছেড়ে চলে গেল। উষ্মা এমন বেড়ে গেল যে, আস্থানার চেয়ার টল্‌মল্।

বাইসারিয়া এসে বললে— "আপনি একবার চলুন।"

আমি বললাম—"যাবনা, কিন্তু একটু পরে ব্যবস্থা হবে। সভা তো ভেঙে গেছে, ভাবনা কি?"

ডাক্তার আমার হাত ধরে সভার মধ্যে নিয়ে গেল। আমি বাধ্য হয়ে কিছু বললাম। ছেলেরা শান্ত হোলো। কিন্তু বম্বে-দল সভা ত্যাগ করে আগেই চলে গিয়েছিল।। তাদের কিছু বলতে পারিনি। গেলাম তাদের সেই ঘরে। তারা মালপত্র বাঁধছে।

সে যে কী ঝামেলা তখন। এই চমৎকার জায়গায়, চমৎকার পরিবেশে এসে নাগরিক জীবন ও সভ্যতার নোংরামি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে আমার যে মর্মপীড়া তার অবধি নেই। তবুও ওদের সঙ্গে ওদের মধ্যে বসলাম। অনেক কথার মধ্যে লক্ষ্য করলাম বাঙালীকে ভাবপ্রবণ ব'লে যে গাল দেওয়া হয় তা একা বাঙালীর প্রাপ্য নয়। এদের অভিমানে দারুণ আঘাত লেগেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আস্থানার হয়ে ওদের বুঝিয়ে স্থির হোলো—ওরা পরদিন যাবে ও সারা ক্যাম্পে ওদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাবে।

মন ভারী হয়ে আছে। বিকেলে আমরা সাহিত্য-সংসদের আসর জমাবো, সে-চিন্তাও মনকে উৎসাহিত করতে পারছেনা। এর মধ্যেই কাজ এগিয়ে চলেছে। দুই-একটা দল ছাড়া সমস্ত দলই সব কাজিয়ার উর্ধ্বে কাজ করে চলেছে। একা একা পথ ধরে চলেছি, উদ্দেশ্য—কোথাও নির্জনে বসে একটু

চিন্তা করবো, ভাববো। কতটা চলেছি জানিনা। দূরে একটা কুটীর দেখতে পেলাম। জনমানব নেই। পরিত্যক্ত কুটীর। পথ থেকে নেমে একটা ঢাল বেয়ে যেতে হয়। অনেকটা সমতল। একটা ধার দিয়ে ঘন পাইন-বন। অন্যধারটায় চোখ দিলেই বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা উপত্যকা দেখা যায়। অনেক দূর—অনেক দূর। সেদিকটা রোদ ঝলমল করছে। গ্রামের পর গ্রাম। বোধহয় একটা নদীও আছে। প্রাণের সাড়ায় জীবন্ত। অথচ নিঃশব্দ মৌন দূরান্তে ছবির মতো নিজেকে মেলে দিয়ে বসে আছে।

বসলাম একটা শিশু-পাইনের হাল্‌কা সবুজের তলায়। উপত্যকাটা সাদায় সাদা। দূরে থেকে মনে হয় তুষার পড়ে আছে বুঝি। কাছে গিয়ে দেখি সাদা-সাদা ঘাসের ফুল। পাহাড়ের সমস্ত পিঠটা সাদায় সাদায় ভরা। ছোটো ছোটো সাদা-পাখার প্রজাপতি এরই মধ্যে চুরি-বাটপাড়ি করে বেড়াচ্ছে। একটা হাল্‌কা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভাসে। বসে বসে চিন্তাহীনতার অবকাশে মনকে ছেড়ে দিয়েছি ঐ প্রজাপতিগুলোর পাখার নেশায় ভরপুর হয়ে বেড়াতে। কোথায় বা দিবসের গ্লানি, কোথায় বা মনের খেদ, কোথায় বা মানুষের সংঘাতের ধূলিজীর্ণ প্রত্যহের স্তূপ! এখানে একা আমি। এই গাছ আমি, পাথর আমি, ঘাস আমি, ঘাসের ফুল আমি, আমিময় ঐ নীলাকাশ, ঐ দিগন্তরেখা, ঐ ঘনসবুজ প্রচ্ছদপট—যার ওপারে অজ্ঞাত বাজায় সাপ-বশ-করা বাঁশী।

বিক্রম আর গোপী।

বিক্রম বললে—"সত্যিই অদ্ভুত জায়গাটা তো!"

গোপী বললে—"প্রিন্সিপ্যল-সাব্‌, আপনার চোখ-দুটোর ক্ষমতার তারিফ করতে হয়। ওঃ, এ জায়গা তো আগে দেখিনি। কী ঝরঝরে পরিষ্কার!"

"তবেই ভ্যাখো, আমায় হক-না-হক কতো গালমন্দ করো। যতো খারাপ বলো আমায়, ততো খারাপ আমি সত্যিই নই।"

"গুস্তাকী মাপ হোক;—জনাবকে খারাপ বলেছি কবে, জানতে পারি?"

"বলোনি, বলতে পারো তো। তোমাদের বাদ দিয়ে ঘুরি…"

আমার কথা কেটে গোপী বললো—"হ্যাঁ মশায়, তা বলবো। ক'দিন ধরে আপনি আমাদের যেভাবে বয়কট করেছেন তাতে আপনাকে খারাপ না বলা বোধহয় আপনার প্রতিই অবিচার করা হবে।"

বিক্রম বললে—"প্রেম করতে গেলে নির্জনে, গোপনে করতে হয়, গোপী। প্রিন্সিপ্যল-সাব্ এখন প্রেম করছেন।"

বিক্রমের হাতে হাত মিলিয়ে গোপী বললো—"একটা পাক্কা চুঁরাদিয়ার মতো কথা বলেছো। মার্কা-মারার মতো কথা! মাপ করলাম জনাবকে। খাদরালার জঙ্গলের সঙ্গে আশিকানা করতে গেলেও একাকিত্ব দরকার। আর এমন মিঠে চাউনি দেখে মুহব্বত না জমে পারে?" ব'লে ওর সোনা-বাঁধানো চশমার ভেতর দিয়ে পূর্ব-উত্তর কোণের উন্মুক্ত আকাশের দিকে চাইলো।

বিক্রম বললে—"বলতে পারেন এসব দৃশ্য দেখলে মনটা এমন করে কেন?"

আমি বললাম—"এই যে পিপাসা সুন্দরকে পাবার, সুন্দরকে ধরে রাখার—এ থেকেই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ। চিদ্‌ঘন আনন্দরসের প্রথম সোপান এই আনন্দ-পিপাসা,—এই quest for bliss ; প্রকৃতিতে এই bliss ছড়ানো আছে। দেখতে পারলেই ধরা দেয়।—

'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।

ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে।'

যখন ধরা দেয় তখনই মনকে দেয় ইশারা। মনের গবাক্ষে পিপাসা-ভরা চাহনি সর্বদাই ওৎ পেতে আছে। আর প্রকৃতির রাজপথ দিয়ে যখনই সুন্দর হেঁটে যায় তখনই মনে আর সুন্দরে রসালাপ চলে। রবীন্দ্রনাথ এই আলাপকে চমৎকার রূপ দিয়েছেন একটা গানে—

'মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরেনা ঘুরি।'

'মাধুরী' যখনই দেখা যায় তখন মন দিয়ে দেখতে হয়। বধূবেশে সেজে আছে মন—'কখন আসে' 'কখন আসে'। হাতে তার বরমাল্য। যেই আসে মাধুরী সজ্জায় সজ্জিত সেই প্রিয়সঙ্গ, তখনই মন ডেকে ওঠে: 'এসেছে' 'এসেছে'।—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'He comes, He comes, He evercomes'. বাইবেলে Solomon করুণসুরে গাইছেন—'I will go now, and go about the city in the streets, and in the broad way I will seek him whom my soul loveth.'...মীরা বলছেন—'শুনি ম'য় হরি আওয়ন কী আওয়াজ। আসে, আসে, আসে'—একেই বলে মন-কেমন-করা। এর রূপ

ঙে দাও—ছবি ; ভাষায় দাও—সাহিত্য, কাব্য ; সুরে দাও—গান ; সাধনায় াও—ভগবান। ললিত-কলার প্রতিটি মাধ্যমকে ললিত হওয়া চাই-ই—কারণ ৰষয়টি হোলো মাধুরীর প্রকাশ। মন-কেমন করবেনা?”

সাহিত্য-দলের ওরা এসে গিয়েছে। ওরাও ততক্ষণ বসে গিয়েছে।

বুদ্ধু র হাতে আমার পোর্টফোলিও।

“ওকি! ও-ব্যাগটি এনেছো কেন?”

“এতে আপনার লেখা আছে।”

“ছি ছি—লেখা ; মানুষের লেখা বড়ো personal, ব্যক্তিগত জিনিস। যারা প্রাণের আবেগে লেখে তাদের পক্ষে এর চেয়ে গভীর ও ব্যক্তিগত জিনিস নেই। াহিত্য সক্ষম হলে ব্যাপকতার মধ্যে সে নিজেকে বিলোয় সত্য ; কিন্তু প্রথম নবস্থায় সে ভ্রূণের মতো গোপনীয়, যত্নের সামগ্রী, ব্যক্তিগত ভালবাসার ফল। বেজীবনের সঞ্চারে গর্ভিণীর আনন্দ বোধকরি সাহিত্যিকের জীবনের প্রথম লখাগুলোর মতোই ও নিভৃতপুলক। সে-লেখার প্রকাশ অসময়ে হলে লজ্জার কারণ হয়।”

নির্মল বললে—“আপনি বলতে চান, লেখেন ; অথচ সে-লেখা শোনাতে চান্না। এই সর্বসাধারণ দুর্বলতা আপনার নেই?”

দিলীপ বললে—“রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’য় এই সর্বজনীন একটা দুর্বলতাকে নিয়ে নাটকীয়তার রসসৃষ্টি করেছেন।”

“না, তা যদি আমি বলি, মিথ্যা বলা হবে, ভাই। আমারও সে-দুর্বলতা আছে। তবে একবারও ভাবিনি এই অবাঙালী পরিবেশে সেই দুর্বলতা আমায় পেয়ে বসবে। সেই দুর্যোগে পড়বো এমন সম্ভাবনাকেও মনের প্রত্যন্তে স্থান দিইনি। সবই বাংলায় লেখা ব’লে বুক ঠুকে লেখার খাতা নিয়ে বেরিয়েছিলাম।”

“কেন, ইংরিজীতে লেখেন না বুঝি?” গোপী বললো।

কথা প্রধানতঃ এখন ইংরিজীতে চলছে।

“না, ভাই। বাংলা যা লিখি তার রূপরস ঠাওর করে দেখার পর আর আস্থা নেই ইংরিজীতে। চিরজীবন ইংরেজ দপ্তরের ফাইলের-ঘোড়ার পিঠে জীন এঁটে যাঁরা পৌছালেন রায়বাহাদুরির দরগায়, ও.বি.ঈ.-র অভয়াশ্রমে আর আই.এস্.ও.-র স্বর্গে—তাঁরা সব রিপোর্টের কঙ্কালের ওপর জামা-কাপড় পরিয়ে

ভাবলেন ভাষার প্রাণে সাহিত্যের তমুলতায় হিল্লোল তুলেছেন। আমাদের ইংরিজী যে কতদূর অপাঠ্য তা বিবেচনা করে দেখতে গেলে, মহাত্মা কেরী, মার্শম্যানের বাংলা বা মথিলিখিত সুসমাচার পড়তে হয়। 'গোরা গাস্ কাতী হ্যয়্' লিখেও হিন্দী-অনুবাদে উচ্চ নম্বরে পাস ক'রে, বিলিতী O'Connell বা ফার্গুসন্-বাচ্চা ঢুকে ম্যাজেস্টরি থেকে Executive Councillor হয়ে গেলেন। আমাদের ইংরিজী শুনে সায়েবদের হাসি আমরা শুনতাম না। আগেকার কালে রাঙা সায়েবী ক্লাবে কালা-সায়েবদের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। মনে হয় তার একটা আঁতের কারণ ছিল। ক্লাবের ঐ চৌহদ্দীর মধ্যে ওরা তবু খানিকক্ষণ 'গোরা গাস্ কাতী হ্যয়্'-মার্কা ইংরিজী শোনার হাত থেকে রেহাই পেতো। হঠাৎ মনে হয় একজন পেন্সনারকে যদি প্রশ্ন করা যায় জীবনে ক'মাইল 'with reference to your office memo no.'-এর ওপর চোখ বুলিয়ে তিনি রায়-সাহেব হয়েছেন, তা হলে তিনি নিজেই হয়তো অবাক হয়ে যান। ওঃ, সারা জীবন ইংরিজীর মাধ্যমে যে রাবিশ এঁরা ঘেঁটে আসেন তার এক-চতুর্থাংশও যদি মাতৃভাষায় লেখবার সুযোগ এঁরা পেতেন, কী পরিমাণ সমৃদ্ধি দিয়ে অলঙ্কৃত করে যেতেন দেশকে ও দশকে ; বৃদ্ধবয়সে হৃদয় ভরে কী আনন্দে নিজের সৃষ্টির প্রতি করুণাঘন দৃষ্টি মেলতে পারতেন তার বুঝি সীমা নেই। আমরা আবার ইংরিজীতে লিখতে পারি ! ওটা স্রেফ একধরনের স্পর্ধা !"

বিক্রম বললে—আপনি বড়ো বাড়াবাড়ি করে বলছেন। আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে খাসা ইংরিজী লিখনেওয়ালা নেই ?"

মাথায় হাত ঠেকিয়ে বললাম—"এ পাপ করবো আমি ? রবীন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণণের ইংরিজী পড়ার পর ? না, না। তবে বলবো সত্যেন ঠাকুর আর বলেন ঠাকুরে প্রভেদ ঐ ইংরিজী-বাংলায়। ভালো ইংরিজী লেখেন এমন দশে দেশে নামজাদা লোককে পেন্সন নিয়ে রায়বাহাদুর সেজে বেরুতে দেখবেনা। সারা জীবন ইংরেজ ঘেঁটেছে যারা, তারা ইংরিজী জানবার সুযোগ পায়নি। না না, আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে প্রত্যেক ভারতীয়ের প্রাণের ভাষা তার মাতৃভাষা। যেটুকু সে পারে, নিজের কথা তবু যেটুকু বলতে পারে, তা মাতৃভাষাতেই পারে। অন্য ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস অন্যের ক্ষেতে ফসল বুনে আসার মতো পণ্ডশ্রম। আমি বাংলাতে লিখি, কারণ বাংলা যে জানিনা তা তবু বুঝতে পারি ; ইংরিজীর অজ্ঞতা বোঝার বিদ্যেও আমার নেই।"

টিপ্‌নী পাড়লো বুদ্ধু—"যদিচ সারাজীবন ইংরিজীর ভুলে ঢেড়া মেরেই কাটলো।"

সবাই হাসলো।

আমি বললাম—"সে তো profession, পেশা। পেশাদার বেশ্যা শ্যামকীর্তন গায়; পেশাদার ভিখিরী-নট সাজাহান সাজে; পেশাদার আই.এস.ও. আর রায়বাহাদুর আফিসে বসে Lytton, Curzon আর Willingdon-এর রোয়াব হাঁকড়ায়। বাইরে এলেই সব যে-ঝাঁকের মাছ সেই ঝাঁকে। আমি ক্লাসে যখন খাতায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিই তখন ভাবি—'ওঃ, কী ভালোই লিখি আমি'—আর বাইরে এসে লেখার চরম লেখা লিখলাম হয়তো 'Farewell Address to Sir Owen Dickinson, K.C.S.I., C.I.E.' ইত্যাদি—যা আমার বড়োকর্তা শুধরে দিয়ে বললেন—'Valedictory Apostrophe to Sir Owen etc. etc.' এবং শেষ অবধি হয়তো তস্য বড়োকর্তা-ফেরত ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে এলো 'To Sir Owen etc. etc.—A Parting Invocation'—কাজেই আমাদের ইংরিজীর বিদ্যে নিয়ে আর কাজিয়া করে লাভ নেই।"

বিক্রম আর গোপী তো হাসতে হাসতে অস্থির। গোপী বললে—"সত্যিই জনাব, আমাদের ইংরিজীতে সাহিত্য করার চেষ্টা সবই হয়ে আসে ঐ অফিস-draft। আমি একবার একটা সনেট লিখেছিলাম। আমার ইংরিজীর অধ্যাপক দেখে বললেন—bad for 'Letters to the Editor' and good for boiling tea;—আমি বললাম, ওটা Letters to the Editor নয়, Sonnet। শুনে বললেন—'যাও যাও। গুরুজনের সঙ্গে এয়ার্কি! সনেট কাকে বলে জানিনা যেন!'"

বিক্রম বললে—"গোপীর গুল্‌-মারার কথা ছাড়ুন। আমার বাবা একদিন আমার একখানা ইংরিজী চিঠি পেয়ে ফেরত ডাকে লিখেছিলেন—'টাকা দিয়ে যা শেখালাম সবই শেস অবধি ধুয়ে ফেলতে হবে, কারণ এ ভাষা বুঝতে গেলে পঁয়ত্রিশ বছর ফাইল-পড়া বিদ্যে সংগ্রহ করতে হয়। তোমাদের সময়ে ইংরিজীর এমন কদরদান সব থাকলেও তোমার ছেলেকে এ ভাষায় চিঠি দেওয়া চলবেনা।' বাবা তারপর একখানা তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠিয়ে দিলেন।"

ওৎ পেতে ছিল দিলীপ। ও কথার মোড় ফিরিয়ে বললে—"নিজের লেখা শোনানো একটা দুর্বলতা বুঝি?"

"এ কথা কাল হবে, দিলীপ। আজ তো এখন রাত হোলো। চলো ক্যাম্পে ফিরে একটু গান গাওয়া যাক্। করমচন্দের অনেক কাজ ফেলে রেখেছি। ফেলে রাখলে মার লাগাবে। কাল মারাঠা-দল যাচ্ছে। ওদের কাছেও যাবো কথা দিয়েছি। অনেক কাজ। রাতে বিক্রমকে রবীন্দ্রনাথ পড়াতে হবে। চলো ফিরি।"

লক্ষ্মীছেলের মতো ক্যাম্পে ফিরে খাওয়া সেরে নিলাম। সে-রাতে সেনী ধরেছে, সঙ্গে একটি শিখ ছেলে। নাম—অওতার সিং। ওদের দলে বেশ ক'জন।

"এতোজন আছি। গান-বাজনার আসর হচ্ছে, মুশায়রা হবে, নাটক হবে,—আমরা বলছি একটা 'Athletic meet' হোক্—'Mr. Khadrala' প্রতিযোগিতা হোক্—কি বলেন?"

যৌবন সর্বত্রই যৌবন। 'তরঙ্গ রোধিবে কে!' বাঁধা পড়েছে এই গিরিদুর্গমের বাহুবেষ্টনে। একই জীবনযাত্রায় চলে চলে এই বারোদিনেই ওরা হাঁপিয়ে উঠেছে। উৎসাহ দিয়ে চললাম ওপরের দিকে।

*

... আমার সেই নিশি-পাওয়ার ডাক। ঘুম আসেনা। অনিদ্রা আমার অজ্ঞাত যন্ত্রণা। এ অনিদ্রায় যন্ত্রণা তো নেই—সুবিমল আনন্দ। চাঁদের হাসির মতো অনাবিল আনন্দ মনপ্রাণকে ভাসিয়ে দেয়। 'ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো'—এখন সেই সুর।

কি করি, স্কাউট্-ক্যাম্প অবধি হেঁটে গিয়ে সেই হোটেলটার তলা দিয়ে সরকারী ঘোড়া রাখার খোলা জায়গাটায় এসে বসলাম।

ঘোড়ার আস্তাবল—গন্ধও তেমনি। নীচের তলাটায় ঘোড়া, ওপরে ঘরে গ্যাঙের কুলীসর্দাররা, আর একটায় forest manager—বন-বিভাগের পদস্থ কর্মচারী। খাদরালা সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গল—এই জঙ্গলের রক্ষাকর্তা, ভাগ্যবিধাতা। একটা বেঞ্চি পাতা। তার ওপরে বসে বসে বাজেশান গ্রামটার পানে চেয়ে আছি। দূরে, অনেক দূরে ডাইনিং-হল্, রান্নাঘর, ডাক্তারখানা। ডাক্তার কি জেগে আছে? ... হঠাৎ পেছনে দাঁড়ালো সেই রেঞ্জার, নাম ছত্রসিং। ছত্রসিং মদ খেয়েছে। হাতে বোতল ধরা। "আসুন, ঘরে চলুন।

আমি দেখে নেমে এসেছি। চলুন, খুব ভালো মাল পেয়েছি আজ—আসল আপেলের রস প্রায় ষাট বছরের পুরোনো মাল। আসুন, চলুন।"

"আমি তো ও-রসে বঞ্চিত।"

"আরো ভালো। আমি খাবো দেখবেন। একা একা খাচ্ছি—ভালো লাগছেনা। চলুন।"

ভদ্র মুখ, দু'দিন না-কামানো দাঁড়ির খোঁচায় সঙ্কুল। পড়ন্ত বয়সে পুরন্ত মধ্যদেশ, কটি ঘেরে একটি ভুঁড়ি, বড়ো নয়। ভারী চেহারা, মাথায় হাল্‌কা চুল। পাহাড়ীদের মতো রং। মদ খেয়ে লাল হয়েছে গাল-দুটো তাই রাতের আলোয় অত ঘামাটে আর তামাটে দেখাচ্ছে। মাথার চুলগুলো ফেঁপে উঠেছে। কথায় একটা লালিত্যভরা জড়তা এসেছে। মনের কপাট খুলে দূরের আকাশ ঢুকে পড়েছে। আমি বসলাম ওর পাশে। মানুষ! মানুষ পেলেই গল্প, গল্প পেলেই অভিজ্ঞতা ; মানুষকে জানার দুর্নিবার আকর্ষণ। "চলো যাই—চলো।" বসলাম ওর ঘরে।

ঘরে গেলাম। একখানা খাটের ওপর বিছানা। দু'খানা চেয়ার, একটা বাক্স ; সামান্য টুকিটাকি জিনিস ছড়ানো। কোণে বন্দুক, গাম-বুট একজোড়া। আলো দিচ্ছে একটা লণ্ঠন। ছত্রসিং বিছানাটা ঝেড়ে-ঝুড়ে বললে—"বসুন। ...কেমন লাগছে খাদরালা? আমরা বলি খাদরালার সৌন্দর্যের তুলনা নেই...তবু ভয়ে কেউ আসেনা।"

"আমার তো ভালোই লাগছে। বিশেষ করে এর জঙ্গল। এর রহস্য গভীর। আমি তো প্রেমে পড়ে গেছি।"

"আপনি তো বাংলার ছেলে। সুন্দরবনের জঙ্গল দেখেছেন?"

"না, দেখিনি। কিন্তু এই লঘু বাতাস, গাছের এমন সুঠাম দীর্ঘ কান্তি, জঙ্গলের বুক চিরে ওঠা দীর্ঘকাতর রোদন—এ যেন কল্পনা করতে পারিনা সমতলের জঙ্গলে, যেখানে কাদা আর জলের মধ্যে মশা আর পোকার রাজত্ব।"

"দেখলেন এদেশের জানোয়ার?"

"বিশেষ কই। মাঝে পাইথন দেখেছি।"

"দেখেছেন?" লাফিয়ে উঠলো ছত্রসিং। "দেখেছেন? কতবড়ো? কবে? গিয়েছিলেন দক্ষিণের পাহাড়ের দক্ষিণ পিঠের জঙ্গলে? পাইথনের রাজত্ব

ঐ জঙ্গলে। ঐ জঙ্গলে আমি কতবার গিয়েছি, কতবার,···বারবার।" স্বরে একটা ব্যাকুলতা, চক্ষে একটা দীপ্তি।

এ কি সেই ছত্রসিং? সকালে মোটা বপুটি হেলিয়ে দুলিয়ে, খাকী পোশাকের নিরেটত্বে নিজেকে ঢেকে নিয়ে, চামড়ার স্ট্রাপের মধ্যে নিজের মেদকে আবদ্ধ ক'রে, গোঁফ চুমরে সিগারেটে টান মারে—আর প্রভাহীন চোখে চেয়ে ভোঁতা কথা, এ কি সেই ছত্রসিং?

"কেন যাও বলো তো?"

"কেন?···কেউ জানেনা। জিজ্ঞাসা করে সকলে। ঐ জঙ্গলে একটা পরী থাকে, পরী। আমি তাকে কতবার দেখেছি; কতবার। কত খুঁজেছি, পাইনা। খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হলাকান হয়ে ফিরে আসার পথে হঠাৎ দূরে গাছের আড়ালে দেখি সে হাসছে। অমনি কলেজা জ্বলে ওঠে। আবার ছুটি—পাইথনকে ভয় করার অবসর পাইনি। খান্, খান্···এক চুমুক খান্···বড়ো ভালো মাল। আঃ!"

"তাকে কত কাছে দেখেছো?"

বুকে হাত দিয়ে বললো—"এতো কাছে। এই বুকের ধড়কের মতো সত্যি আর গরম। প্রথম দেখি তখন আমার বয়স হবে আঠাশ। এই সময়ে কাশ্মীরী মুসলমানেরা গরু মোষ ভেড়া নিয়ে এই পথ দিয়ে রামপুরের মেলায় যায়। কাশ্মীরের পাহাড়ের ধারে এই সময় চারার অভাব হয়। এধারটায় এই সময়টায় খুব চারা। একসঙ্গে দু'শো-আড়াইশো মোষ নিয়ে ওদের দল চলে আর জঙ্গলের ধারে আড্ডা করে থাকে।···আমার বয়স আঠাশ। ফিরছি ঘোড়ায় চড়ে। জোরে বৃষ্টি এলো। একটা পাহাড়ী ফাটলের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। সন্ধ্যা হয়-হয়। আর দেরী করতে পারিনা। ঘোড়ার লাগাম ধরে এগুতে লাগলাম। ওই দক্ষিণের পাহাড়টার গায়ে এসে যখন উঠেছি তখন যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি; একটু এগুতে পারিনা। পাহাড়-ধোয়া জলের স্রোতে পা যেন টেনে নিয়ে যায়। শীতে সমস্ত শরীর কাঁপছে। বাজ পড়ছে মুহুর্মুহু—বিজলি চমকাচ্ছে। মন দমে যাচ্ছে। মাথার ওপরে হঠাৎ মোষ ডেকে উঠলো। মনে হোলো কাশ্মীরী গয়লাদের দল হয়তো আস্তানা নিয়েছে। ঘোড়াটাকে এমনি ছেড়ে দিলাম। ও হয়তো ঠিক ফিরে যাবে আস্তানায়। নিজে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে

লাগলাম। আমার ভুল হয়েছিল। জঙ্গলের ওপরে জনমানব নেই। এদিকে অন্ধকার গভীর হয়ে এলো। এমন বিপদে পড়িনি কখনও। কি করি। হঠাৎ দূরে একটু আলো দেখলাম। এগিয়ে গেলাম। অন্ধকারে কিছু দেখা যায়না, তবে একটা জায়গায় আগুন আর তার পাশে একটা মেয়ে বসে। জায়গাটা গভীর বনের পাশে ; জল থেকে একটু বাঁচোয়া জায়গা, কারণ মাথার ওপরে একটা পাথরের চাঁই ঝুলছে। আগুন জ্বলছেনা, তবে নিভছেওনা। যেই পাশে থাক্, প্রাণপণে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আমায় দেখে বললো—'জলে পথ হারিয়েছো বুঝি?' আমি তখন পথের সঙ্গে খুব পরিচিত। বন-বিভাগে কাজ করি। একথা বলতে পারলাম না। বললাম—'হারায়নি, জলে এগুতে পারছিনা।' 'তবে বোসো।'—বললে সে। পাশে একটা লোক আকণ্ঠ মদ গিলে বুঁদ হয়ে পড়েছিল। দেখলাম। চেয়ে আছি লোকটার দিকে। অন্ধকারে ভালো দেখা যায়না। মেয়েটা বললে —'কাসিম, ছাখো মেহমান্ এসেছে।' পরক্ষণেই হেসে বললে—'আর দেখবে ও! দেখা ওর শেষ হয়ে এসেছে! হতভাগা, বজ্জাত। খাবে? মদ খাবে? আছে হয়তো ওর পাশে ঐ বোতলে।' আমি ঐ অবস্থায় মদ খেতে পারলাম না। তা ছাড়া তখন এতো খেতামও না। আমি শীতে কাঁপছি। এমনি কাঁপুনি থামেনা, আগুনও জ্বলেনা। দাঁতে দাঁত লেগে যেতে লাগলো। কি করি। মেয়েটা বললো—'শোও, গরম করে দিই।'—আমি ইতস্তত: করার আগেই আমায় কাছে নিয়ে ছড়িয়ে দিলে কম্বলের একটা দিক। ভারী কম্বল। নিজের দিকটা মুড়ে নেবার আগে আমার দিকটা মুড়ে দিলো হাত দিয়ে। দুজনে গুটিসুটি মেরে ঐ একটা কম্বলের মধ্যে রইলাম। বাধ্য হয়ে রইলাম। নৈলে মারা খেতাম। তখনও ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি যেন মুহ্যমান হয়ে গেছি শীতে, ক্ষুধায়, পরিশ্রমে। রাত বেড়ে চলেছে। কিভাবে কতক্ষণ গেছে জানিনা। হঠাৎ মেয়েটা হেসে বললে—'তুমি কি পুরুষ?' আমি পাহাড়ী বাচ্চা! এতোবড়ো অপমান আমায় কেউ কখনও করেনি। আমি বললাম—'ও কি তোমার স্বামী?' আবার হাসতে হাসতে বললে—'স্বামী? ও আমার স্বামী? অন্ন দিয়ে অন্ন খায়, তাতেই স্বামী হয়? আমার কুকুর, আমার মাথার উকুন।' ব'লেই একটা পা দিয়ে নেড়ে ওকে ঠেলে দিলে এক কোণে। সেই একটা পদাঘাতে কতো ঘৃণা, কতো সঞ্চিত অপমানের বোঝা

তা আমি বোঝাতে পারবোনা। 'একটা নেশাখোর আহাম্মোক। ওর জন্যে আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে পালিয়েছি। আর ও একটা ঘেয়ো কুকুর।' বুঝতে পারিনা এ রহস্য কী। জিজ্ঞাসা করি এমন সাহস নেই। সাড়ও নেই মনে, বড্ড শীত! শীতে যেন কেঁচো হয়ে গেছে দেহ, মন। আমি বুঝিবা একটু ঝিমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে দেখি মেয়েটা দাঁড়িয়েছে। 'কে আসছে দেখছো? প্রস্তুত হও। মরার জন্য প্রস্তুত হও।' দূরে দেখি প্রকাণ্ড-দেহ কে একটা এগিয়ে আসছে অন্ধকারের সমুদ্র ঠেলে। সোজা এসে দাঁড়ালো কাছে। মেয়েটা চিৎকার করে উঠলো—'মেরোনা, আমায় মেরে ফেলোনা! আমি বলছি শোনো। বলতে দাও। বলতে দাও!!' কিন্তু বিরাট শব্দ করে বন্দুকের নল দিয়ে আগুন ছুটলো। মেয়েটা একটা শব্দ করে গড়িয়ে পড়লো। লোকটা পা দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলো পাশের লোকটাকে আর আমার গালে জোরে একটা চড় মারলো। ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি। কিছু বলবার আগেই বললে—'তুমি কে হে? তুমি এখানে কেন? মাসুমকে জানো বুঝি? ও-হো-হো, সরকারী উর্দী? তার মানে, পথ হারিয়েছো? ও হতভাগাকে বুঝি জানোনা? মাসুম ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে আমার মোষের দল থেকে। ক'দিন খুঁজেছি। আজ পেলাম। কাসিমের বয়স বাচ্চা। ওর দোষ নেই। দোষ ঐ মুখপুড়ী মাসুমের। ওই ভুলিয়ে এনেছে বেচারা অকবরের ঐ একটি ছেলেকে। মাসুম এর আগে চার-পাঁচটা ছেলেকে খেয়েছে। আজ তোমায় ও খেতো। আমি বাঁচালাম, দোস্ত্। আমায় খাইয়ে দিও। চলো তোমায় পথে ছেড়ে দিয়ে আসি।' ব'লেই উঠে দাঁড়ালো। গাছের ডাল থেকে জল পড়ছিল। বাইরে জল কমেছিল। আমি যন্ত্রচালিতের মতো দাঁড়াতেই মনে হোলো মাসুম যেন আমার পা হাত দিয়ে টানছে। আমি বসে পড়লাম। লোকটা টলতে টলতে বললে—'তবে থাকো তুমি। পুলিস তোমায়ই ধরবে। বাঁচাতে চাইলাম, চাইলেনা।' হাতড়ে বোতলটা বের করে যা ছিল গলায় ঢেলে চলে গেল। যাবার আগে একটা লাথি মেরে মেয়েটার দেহকে গড়িয়ে দিলে খাদের মুখে। আমি আঁতকে উঠে বুঝিবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হোলো যখন, তখন দেখি আমি একা; ওরা কেউ নেই। সেই মাতাল কাসিমও নেই, মাসুম তো নেই-ই—মাসুমের হত্যাকারী লোকটাও নেই।"

"এইসব হোলো তোমার সামনে ?"

"হ্যাঁ, একেবারে কাছে। শোনো তো। একা একা নেমে চলেছি সেই অভিশপ্ত জায়গা থেকে। হঠাৎ মনে হোলো কে যেন ছুটে চলেছে। ঠিক যেন মাস্থম। জঙ্গলের গভীরে ছুটছে। ভোরের আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। ভালো দেখা যায়না। বৃষ্টি ক্ষান্ত হয়েছে। আমি চমকে ছুটলাম পিছু-পিছু। খানিকটা গিয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য—ভয়ঙ্কর। মাস্থম বলছে চিৎকরে করে—'মাতাল বেহেড্‌টা গুলী ছুঁড়েছিল আমায়, কিন্তু লেগেছিল কাসিমের মাথায়। কাসিমের দেহ এইখানে কবর করবো ব'লে রেখেছিলাম। তোমার সাহায্য নেব ব'লে তোমায় ডাকতে গেছি। গিয়ে দেখি তুমি নেই। এদিকে আসছি —আর ঐ ছাখো, চেয়ে ছাখো ঐ অজগর সাপ কেমন করে গিলছে কাসিমের দেহ। আমি ওরই সঙ্গে ওর পেটের মধ্যে ঢুকে কাসিমকে বার করে আনবো।' চোখের ওপর দেখছি কাসিমের কাঁধ অবধি অজগরের গ্রাসে। সারা দেহটা বাইরে পড়ে। আর মাস্থম ছুটছে সেই অজগর মারবে ব'লে। মাস্থম আমার হাত ছোট্‌কে অজগরটার পিঠের ওপর চেপে একটা লম্বা ছোরা গেঁথে দিলো। অজগর লেজ দিয়ে মাস্থমকে জড়িয়ে ধরলো। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দুটো পাহাড়ী আমায় এখানে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মাস্থম মরেনি। আমি তাকে অনেকবার ঐ জঙ্গলে দেখেছি। পরে ঐ মাস্থমের স্বামী লতিফের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। প্রতিবৎসরই হয়। সেই কাশ্মীরীটা মরেনি। সেও বলে, মাস্থম বেঁচে আছে, আর ঐ জঙ্গলেই আছে। তাকে দেখতে ঐ জঙ্গলে আমি আজও যাই। কাল চলো, কাল তোমায়ও দেখাবো। ডাক্তারকে দেখিয়েছি।"

"কিন্তু মাস্থমের তো এখন বয়স হয়েছে !"

"একটুও না, সেই যেমন তেমনি।"

হঠাৎ চেয়ে দেখি ডাক্তার !

"গল্প হচ্ছে ?"

আমি গল্প শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। অজ্ঞাতে মনের মধ্যে নানা কথা উঁকি-ঝুঁকি মেরে যাচ্ছে। এই খাদরালার জঙ্গল যেন বিরাট একটা কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান। আলোছায়ায় সঙ্কুল বৈচিত্র্যময়ী এই প্রকৃতির মধ্যে কতোই গুপ্ত রোদন, সুপ্ত বুভুক্ষা, অবহেলিত আর্তনাদ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত। এর

বনবিটপীর বাকলে স্বাক্ষর আঁকা কত জন্ম, কত যুগের আঘাত সংঘাত। প্রাণ পেলে এর প্রত্যেক গাছ, প্রতিটি শৈলচূড়া, পথের ধুলা কাঁকর চিৎকার ক'রে ব'লে উঠতো নিজের কাহিনী—যেমন বলছে এই ছত্রসিং, যেমন বলেছে গুহার মধ্যে তিস্তা, যেমন বলেছে ভৈরবী, পান্না, লেখরাজ। মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, সে মানুষ। প্রকৃতি, সভ্যতা, পোশাক, ভাষা সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষ একই রইল দেশে দেশে, কালে কালে। সকল রস, সকল রীতির মধ্যে এই বিশ্বজনীনতার বোধই সাহিত্যের, শিল্পের, রসের প্রাণবস্তু।

কিন্তু ছত্রসিং তো এখন মদমত্ত। গভীর রজনীর জঠরে বসে সে তার স্খলিত ভাষায় যে কাহিনী রচনা করে দিল, তার মধ্যে মধ্যে তারার চমক থাকলেও গ্রহ-সংস্থানের বাস্তবতা নেই যেন।

ডাক্তার বললে—"চলো—ছত্রসিং তার মানুষের স্বপ্ন দেখছে।"

সত্যিই ক্লান্ত ছত্রসিং শুয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত চোখের পাতার ধারে জল চিক্‌চিক্ করছে ; মাথায় ঘাম, ঠোঁট শুকনো।

ডাক্তার কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল ছত্রসিংকে। তারপর বেরুলো বাইরে। পূবদিকে চাঁদের আধখানা তখন অনেকটা চড়ে গেছে আকাশে। চাঁদের আলোয়, হিমে, নিস্তব্ধতায় কালের গতি যেন সুনিবিড় আর স্তব্ধ হয়ে এসেছে। সকল দূর আর নিকট যেন একটি প্রহরের ওপর নির্ভর করে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি বুঝি শুনছিলে ওর কথা, ডাক্তার?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"ক'বার বলো।"

"সকলকেই বলে!"

"তা আর বলবেনা? সত্যি ব'লে বিশ্বাস করো বুঝি? মাস্টার তো, কত বুদ্ধি আর হবে!"

"কি বলো, সত্যি নয়? কিছুই সত্যি নয়? অবশ্য একটু কেমন-কেমন বোধ হচ্ছিল বরাবর। ভাবছিলাম মত্তাবস্থায় অসংলগ্ন আতিশয্য করে ফেলেছে। কিন্তু ওর মর্মব্যথা তো সত্য!"

"তেতো ভাবালু! মর্মব্যথা কোথায় দেখলে? সোজা একটা 'case of alcoholism'—নেশাখোরের চিরকালের রোগ ঘ্যানর-ঘ্যানর করা, তার যেন কত কষ্ট, কত ব্যথা, কতো কি। কেউ মদ খায় মামলায় হেরে গিয়ে, কারুর

স্ত্রী পরপুরুষকে চায়, কারু একমাত্র ছেলে মরে গেছে তাই—মোদ্দা—মদ খাওয়া আর বেশ্যাবাড়ী যাওয়ার জন্ম কারণ একটা তার চাই-ই। এ মদ খায় মাস্থমকে পাবে ব'লে। ঘরে তিনটে জনানা, বারো-চোদ্দটি সন্তান, বয়স তো যাট ছাপিয়ে 'বাহান্ন', নৈলে চাকরী যায়; মদের মাংসের দয়ায় শরীর আছে শক্ত তাই। পেয়েছে তোমায় বুদ্ধু, হাঁকড়েছে গল্প। আর বসে বসে নোট নিচ্ছ কেতাবে ঢোকাবে ব'লে, পাচার করবে বাংলা সাহিত্যের বাজারে।"

"তাতে অতো রাগই বা কেন তোমার? কিছু তো সত্য বটে?"

"কিছুই না।"

"কিছুই না তো কি, জলজ্যান্ত মিথ্যাবাদী একটা?"

"তাও নয়। প্রকৃত কথা এই যে, ও সত্যবাদী।"

"তবে?"

"একে বলে—hallucination, hypostatisation, self-hypnotism—রজ্জুতে সর্পভ্রম। মানসিক রোগ। যার জন্ম alchohol থেকে—Dr. Freud-এর বিশ্লেষণ থেকে সুরু করে অনেক মিঞার দরবারে এই self-hypnotism-এর কীর্তন শুনতে পাবে। এরা মিছে বলেনা। একটুও বোধ নেই যে মিথ্যাকথা বলছে। সে-বিষয়ে ওদের মন একেবারে নিষ্পাপ। সত্যের দরবারে, এদের আর যুধিষ্ঠিরের মধ্যে প্রভেদ নেই।"

আমি যে খুব একটা নতুন কথা শুনছিলাম তা নয়। কিন্তু ঠিক প্রস্তুত ছিলামনা ঐ কাহিনী শোনার পর এই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার।

ডাক্তার নিজের ঘরে ঢুকলোনা। আমার ক্যাম্পের পথে এগুতে লাগলো। "কেন, তোমরা তো স্বীকার করো বাচ্চাদের 'day dreams' আর কিশোরদের 'egocentric hallucination'—তোমরা তো মাস্টার।"

"কিন্তু তার কারণ থাকে, ডাক্তার।"

"এরই যে নেই তা বুঝলে কি করে?"

"কী কারণ?"

"আর সবের কি কারণ থাকে?"

"একটা কিছু বাস্তব থাকে—ইচ্ছা, ভয় বা আর-কিছু। সেই কাঠামো আশ্রয় করে নানা রূপের জন্ম। ওইজাতীয় বাস্তব ঘটনা ওর জীবনেও আছে?"

"শোনো। ঐ জঙ্গলে মোষে তাড়া করে ওকে একবার ফেলে দিয়েছিল। সারারাত ও পড়ে ছিল পথের ধারে। গিয়েছিল অজগর শিকার করতে। হাতের বন্দুক ফস্‌কে পড়ে গিয়ে একটা বিরাট শব্দ করে ওঠে। সেই শব্দে ঘাব্‌ড়ে মোষ করে তাড়া। অজগর আর মোষের মাঝে পড়ে শ্রীমান চোখে ধাঁধা দেখেন। সেই সময় হয়তো অনেক জ্যোতি অনেক আলো দেখে থাকবে। তার অনেক আগে ওর এক স্ত্রীকে সন্দেহের বশে ও খুন করতে যায়। কিন্তু কালক্রমে সেই স্ত্রী-ই ওর সবচেয়ে প্রিয় হয়ে ওঠে। মরে যায় বৌটা। ঘটনা দুটো যোগ করে ওর মনে একটা সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছে। ফলে এই কাহিনী। ও একেবারেই জঙ্গলে যায়না, এমন মরণভয় ওর ওই জঙ্গলে। কিন্তু বারবার বলে এই কাহিনী, ওর জঙ্গলে ঘোরার কথা।"

"আশ্চর্য তো!" আর্তনাদ করলাম আমি।

"আর তার চেয়েও আশ্চর্য তুমি। রাত আড়াইটা। মদ না খেয়েই গল্প নিয়ে মেতে আছো। যাও যাও—শোও গে। কাল কিন্তু সরকারী লোক কাজ দেখতে আসবে। বিদেশী দু'-একজন সাংবাদিক আসবে খবরাখবর সংগ্রহ করতে। তোমার অনেক কাজ। আমি আর ওপরে যাবোনা। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমায় নীচে আনাবার ব্যবস্থা আমায় করতে হবে, নইলে আবার কোন্ রাতে কার ঘরে বসে দরবার করবে, আর কী বিপদে পড়বে। তোমার তো Insomnia রোগ নেই, অথচ একি ব্যাপার বলো তো! রাতের পর রাত বিছানা ছেড়ে উঠে আসো।"

"কি জানি কেন। খাদরালার জঙ্গলের নিশ্বাসধ্বনি কানে ঢুকলেই বিছানায় শুতে পারিনা। বেরিয়ে পড়তে চায় মন। নিশি-পাওয়ার মতো বেরিয়ে পড়ি।"

"তোমার দাওয়াই castor-oil—কিন্তু এখানে দেওয়া চলেনা। পাহাড়ী জায়গা কিনা?"

হাসতে হাসতে বললাম—"আচ্ছা, চলি।"

ডাক্তার নেমে গেল।

কিন্তু ও কেন জাগে, কেন ঘুমোয়না?

*

ছেলের দল কাজে চলেছে। আজ ঘুরে ঘুরে কাজ দেখছি। ক'দিন

ধরে সক্সেনা ছোলা-গুড় বিলি করার ভার নিয়েছে। সেও ফিরছে বিলি শেষ করে।

হঠাৎ আমায় খবর দিল অন্ধ্রের কনক রাও—"মশায়, আপনাকে এখুনি দপ্তরে দরকার। দুজন ভিজিটর।"

আমি বললাম—"ভিজিটররা নিশ্চয় খুসী হবেন আমাদের অফিসে বা ক্যাম্পে না দেখে। কিন্তু তুমি কাজে নেই কেন, কনক রাও?"

আমতা আমতা করে বললে—"শরীরটা তেমন যুৎসই যাচ্ছেনা।"

"তাই নাকি? বলনি তো? আমি গিয়ে তোমার গ্যাঙে কাজ করি আজ। নৈলে একটা লোকের অভাবে ওরা দুর্বল হবে। তুমি বরং ভিজিটরদের নিয়ে সব দেখিয়ে দাও।"

কনক রাও লজ্জায় মরে গেল যেন। কিন্তু আমি শুনলাম না। বেল্‌চা নিয়ে মাটি ফেলতে লাগলাম।

এমন সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

পথের নীচেই তীব্র ঢালু, গাছে গাছে ভরা। কিন্তু তারও নীচে আবার পথ। পাহাড়ে এমনি থরে থরে সারে সারে পথ থাকেই। ছেলেরা কাটা পাথরের চাঁই আর মাটি ঐ খডেই ফেলে বটে, তা গড়াতে গড়াতে নেমেও যায়। গড়িয়ে দেবার আগে ছেলেরা খুব শব্দ করতে থাকে, নীচের পথিক হুঁসিয়ার হয়ে যায়।

অভ্যেস না থাকার জন্য একটা দলে এই চিৎকার ঘন ঘন করা হচ্ছিলনা। একটি রাখাল বালক ছাগল চরাচ্ছিল। আর্তনাদ করে হয়তো উঠেছিল, ছেলেরা শুনতেও পায়নি। একটি পাহাড়ী চাষা উঠে এসে নমস্কার করে আমায় জানালো—ছেলেটা সাংঘাতিক আহত হয়েছে এবং দুটো ছাগল মারা গেছে।

ছেলেটাকে দেখতে হাসপাতালে ছুটলাম। আধঘণ্টার মধ্যে তাকে আনা হোলো। বিশেষ চোট লাগেনি। হাঁটুটা দুমড়ে গেছে। ভালো করে বেঁধে, স্ট্রেচারে শুইয়ে ওকে গ্রামে রেখে আসা হোলো। ছাগল দুটোর দাম দিয়ে দেওয়ার কথা উঠলো। কিন্তু ওরা নিলনা। ফলে ছেলেরা খুব সাবধান হয়ে গেল এই চিৎকার করার ব্যাপারটা নিয়ে। ডাক্তারের হাসপাতাল এখন জমজমাট। রোজই দু'-চারটে জখমের কেস্ আসছে। ডাক্তার বলছে—"কাজ চলছে, কাজ!"

যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি হিমাচল-সরকারে। তাঁদেরও একটা বিপদ ঘটেছিল তাঁরা বললেন—"... জীপটা মোড় ঘুরতেই পিছলে যায় পিছনের চাকা। ইনি সেনা-বিভাগে কাজ করেন। গত যুদ্ধে ফ্রণ্টে ছিলেন। খুব চট্পটে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে জীপটাকে টেনে কাৎ করে দেন তাই রক্ষা।" বপুটির দিকে তাকিয়েই মনে হোলো—জীপ কেন, হাতি কাৎ করাও বিচিত্র নয়। হ্যাঁ, দশাসই জাঁদরেল চেহারা বটে।

কাজ দেখে খুব খুসী। একটা বিশেষ পরামর্শ দিয়ে গেলেন মাছির উৎপাত নিয়ে। এ কয়দিনে মাছির উৎপাত বাড়তে বাড়তে এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। এমনকি মাছির কামড়ে হাসপাতালে দৌড়তে হচ্ছে, অথচ সে-মাছি মৌমাছি বা বোলতা বা ভীমরুল নয়। মাছি, ঘরোয়া মাছি। আকারে বড়ো। এক-একটা মাছি আধ-ইঞ্চির হবে। পাখায় কখনো শব্দ হয়, কখনো নয়। নিজেকে দিয়েই বলি। কখন মোজার ওপর বসেছে টের পাইনি। হঠাৎ ছোট্ট একটি কামড়। ডবল মোজা উলের। তা ভেদ করে শুঁড় গিয়ে পরমানন্দে রক্ত চুষে খায়। রক্তচোষা, তাজা রক্তচোষা মাছি। তারপর সেখানটা ফুলবে, পাকবে, বিশুদ্ধ ফোড়ার আকার ধারণ করবে। এমনি মাছি লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী। আদেশ দিলাম—"দেখলেই মারো, আর উপায় নেই।" এবং দেখলাম, মারলে ওরা কেমন যেন সতর্ক হয়ে যায়। অনেকক্ষণের জন্য আর উৎপাত থাকেনা।

মিলিটারী অফিসার বললেন—"পূর্বের অভিজ্ঞতা নেই কিনা, তাই আপনাদের এই কষ্ট। যেখানে যেখানে পায়খানা তৈরী করিয়েছেন—মাটির স্তূপ রাখুন, আর একটা করে বেল্চা। কাজ সারার পর এক-বেল্চা মাটি চাপা দেবেন। মাছি ডিম পাড়ে ঐসব নোংরায়, অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। আর তার উৎপাতে ক্যাম্প ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। এসব জায়গার থেকেও মাছির উৎপাত বেশী মিড্‌ল্-ঈস্টে। সেখানে আমরা এই ব্যবস্থা করেছি।"

আর আমাদের এখানে তো ঐ কর্মটি চলছে যত্রতত্র, অবাধ। খানা-কাটা পায়খানা মাত্র তিনটি—অর্থাৎ বারোজনের ব্যবস্থা। আরো কতকগুলো পায়খানা তৈরী করানোর পর এই রীতিটি প্রবর্তিত করায় অনেক কমে গেল মাছি, কিন্তু শেষ অবধি একেবারে যায়নি।

ইতিমধ্যে ইঞ্জিনীয়ার-দল এসে গেছেন। অনেক জায়গায় এঁরা কাজ দেখে

সী হলেন। বললেন—"আরো দু'-চারদিন পরে বড়ো বড়ো শক্ত চাঁইগুলোয় াইনামাইটের কাজ আরম্ভ করানো হবে। সেজন্য অভিজ্ঞ কুলী চাই। সেটা ?.W.D. গ্যাঙ-ই করবে।"

ততক্ষণে বারোটা বেজে গেছে। ছেলেদের দল ক্যাম্পে ফিরে আসছে। এবার খাবে সবাই।

যথারীতি ডাক্তার পরিবেশনের সময় এসেছে।

ডাক্তার যে সবার সঙ্গে কথা বলতো তা নয়। বরং একটু কম কথাই বলতো। ওর মতো অনেক কথা, অনেক অভিজ্ঞতা সহজে চেপে রাখার ক্ষতা এ-জীবনে আর দেখিনি; এক মৌনী-বাবা বা তেমন-তেমন সন্ন্যাসী াড়া। বাইরে থেকে লোকটাকে দেখলে বরং একটা নেশাখোর বোদা-মার্কা মিলিটারী ডাক্তার ব'লেই বোধ হোতো। রংটা ফরসা তো বটেই, তার ওপর নেশার গুণে গাল-দুটো তামাটে লাল হয়েই থাকতো। কথা কম, চাউনি ভাসা-ভাসা, হাতা নিয়ে দাল-তরকারি দিচ্ছে। লোকে ভাবতো বোকা তো টেই, কিন্তু শয়তানি আছে। কন্‌ট্রাক্টর ঐ বাল্‌জীর সঙ্গে নিশ্চয়ই বখরায় ারবার আছে। বাল্‌জী শুনতো, হাসতো, বলতো—"আরে ছি ছি, াম রাম, বোলোনা হে বোলোনা!" তাতে চোখ মট্‌কানো বাড়তো— লতো সবাই—"বেটা ঘুঘু; ফাঁস করবেনা!"

ডাক্তার যে বুঝতোনা তা নয়। মনে মনে এ থেকে রস পেতো। এমনটা কেউ কোনোদিন বলেনি। মদ? মেয়েমানুষ?—এসব নিয়ে মাজে কটাক্ষ শুনে শুনে এখন সয়ে গেছে। কিন্তু অর্থপ্রীতির বশে ছেলেদের খাদ্য খাইয়ে দু'-পয়সা করে নেবার ইঙ্গিত কখনও কেউ করেনি। এই াঞ্জনার মধ্যে পরম কৌতুক আছে। আমি সার জেনেছি, মাস্টার, মানুষ ানুষকে বদ ভেবে যত আনন্দ পায়, সৎ ভেবে তার শতাংশও পায়না।"

"বলো কি ডাক্তার? তোমার মতো সাহিত্যরসিক প্রাণ-পিয়াসীর গলায় যে হলাহল! এ বলো কি তুমি?"

"মানিয়েছে বলো, নীলকণ্ঠকে যেমন মানিয়েছিল বিষ? মানুষ মানুষকে ালো ব'লে, সৎ ব'লে, মহৎ ব'লে জানতে পারলেই জ্ঞান যেন পান্‌সে হয়ে ায়। তারপর আর জানতে ইচ্ছে করেনা, বরং দূরে দূরে ভেগে থাকতে ইচ্ছে

যায়। সাধু-সন্নিসীর কাছে যখন লোকেদের যেতে ছাখো তার বেশীর-ভাগটাই একটা ফ্যাশন ;—ছুনিয়ার ওঁছা বস্তু-পিয়াসী রাক্ষসগুলোর একটু দর্শন নিয়ে খেল করে পঙ্‌ক্তিতে উঠে আসর জাঁকানোর চেষ্টা। কোনো শালা কি ভালো চায় না, ভালো পায় ; না, ভালো দেখে ভালো শুনে, খুশী হয় ? তার চেয়ে ঢের খুশী হয় বৌকে গয়না গড়িয়ে দিয়ে, স্যাকরার পয়সা মেরে দিতে পারলে খুশীর নেশা বড়ো নেশা। তোমার ঐ সাধু-সন্নিসী বা মহৎ ব্যক্তিদের মহত্ত্ব দেখে যে খুশী, তার চেয়ে ঢের বেশী খুশী যদি তারা ছাখে বা জানে যে ঐ মহৎ ব্যক্তিটির একটি রক্ষিতা আছে, বা তিনি গোপনে একটু কারণ করেন। তখন ঐ ভক্তই থিওরি হাঁকড়াবেন—'সব ব্যাটা ভক্তই বুজরুক্ ভণ্ড!' মানুষের পাপ, মানুষের দুর্বলতা খুঁজে পাওয়ার আনন্দ এত উগ্র যে, আমার বিশ্বাস মানবজগৎ সত্য-অনুসন্ধান ছেড়ে মিথ্যা ও পাপ খুঁজে ফিরছে ব'লেই সৃষ্টি আজও টিঁকে আছে। নিরেট সত্য নিয়ে সংসার অচল হোতো। পরনিন্দা পরকুৎসা ছাড়া ক্লাব, সোসাইটি, পার্লামেণ্ট, মঠ, হাসপাতাল, বাস, ট্রাম গঙ্গার ঘাট—ভাবতে পারো ?"

"ছাড়ো, ছাড়ো—" থামালাম আমি। "পেয়েছে তোমায় আজ মানুষে নিন্দে করার রোগে তাই যা-নয়-তাই বকে চলেছো, মন্দভাগ্য অসহা নেশাখোর। ছু'পাত্র টানো, খোঁয়াড়ি ভাঙবে, এই নির্বেদ আর অনাস্থা চলে যাবে।"

"ব্যথা লাগছে বুঝি কবি ? কেতাবে লিখতে গিয়ে লজ্জা পাবে ? আমি ডাক্তার। ঘেন্নার চরমে গিয়ে ডুব দিয়ে উঠেছি। আমায় আর কী ঘৃণিত করে দেবে ? আমি আজ বলছি মান্‌বেনা, কেতাবী মুখ্যু কিনা; তাতে করো মাস্টারী যাতে ইস্ত্রি-করা আত্মপ্রবঞ্চনা আর শঠতা শেখায়। একদিন মান্‌বে—পরনিন্দা ও পাপের বাষ্প না থাকলে সমাজ-ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে থাকতো। একটা দেশ, সমাজ বা কাল খালি শুকদেব আর সরস্বতীতে ভর্তি, কেবল নিরঙ্কুশ ভালোর রাজত্ব—এর চেয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীবনধারা আর হতে পারেনা।"

"তোমায় ছেলেরা নিন্দে করে, ভালো লাগে ?"

"কানাকে কানা বললে লাগে বেশী। যে ব্যাটা বেশী ঘুষখোর সেই বেশী সাধু সাজে। আমার সত্যিই ভালো লাগে, আমায় ওরা বেনের সঙ্গে ভাগীদার

ভাবে ব'লে, তাও আবার পাছদুয়ারী ভাগীদার, অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে বখরা মারি।"

অথচ ও নিজের হাতে দাল তরকারি দিচ্ছে। আজ দই আর বুঁদে দিয়ে রায়তা হয়েছিল। দই ফুরিয়েছে, রায়তায় টান্ ধরেছে। ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বালজীকে বললে—"কলেরা হলেই স্যালাইন্। টান্ ধরলেই জল। অভাব পূরণ করা পৃথিবীর ধর্ম।"

তৃতীয় ব্যাচে রায়তা দেখে ছেলেরা বলে—"বুঁদে খুঁজতে ডুবুরী ডাকতে হবে, ডাক্তারবাবু।"

ডাক্তার বলে—"যা-তা ডুবুরী নয়, একেবারে মুক্তাধরা ডুবুরী। যদি বা পায়, তা বুঁদে তো নয়, মুক্তা।"

বালজী আসলে ভয় খেতো ডাক্তারকে। সোজাসুজি ডাক্তার ব'লে দিতো—"বিকেলে ছানার ব্যবস্থা না করলে খাদ্যপ্রাণ থাকবে কিসে? আমি বিল্ পাস্ করবোনা।" বিকেলে ছানা আসতো; আলু দিয়ে ডালনা হোতো।

মাছ-মাংস নিষেধ। এইসময়টায় কাশ্মীরী গয়লার একটা দল এসে পড়লো। মণ-মণ দুধ তখন জলের দরে। দই, পায়েস এবং ছানার ছড়াছড়ি লেগে গেলো। 'খাদরালা হোটেলে' অর্থাৎ আমার সেই চটিতে, দুধের দাম কমে গিয়ে ঢেঁকী-শাকের ঝোলের দাম বেড়ে গেল। পাহাড়ে লোকে ঢেঁকী-শাক খায় পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। আমাদের খানাঘরেও দু'দিন ঢেঁকি-শাকের ডালনা, একদিন পদ্মমৃণালের ডালনা, একদিন ব্যাঙের-ছাতার ডালনা হয়েছিল।

*

বাইসারিয়া আজ রাতে একটা মেলা বসাবে—বিচিত্রানুষ্ঠান। গান, বাজনা, কবিতা-পাঠ, কবি-সম্মেলন এবং বক্তৃতা। দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত অধিবেশন। তারই ব্যবস্থা চলছে।

"আপনি গুরু? আপনি কিছু, গান বা কবিতা বা কিছু?"

আমি বললাম—"শুনবে কে বাইসারিয়া? আমি গান-কবিতা বাংলা ছাড়া জানিনা। বক্তৃতা আমার অরুচি। তোমরা করো, মনোযোগ দিয়ে শুনবো।"

ইতিমধ্যে ফরেস্ট-রেঞ্জার এসে গিয়েছে। আমায় কাঁধ টিপে দেখালো দূরের আকাশে।

সত্যিই তো!

দক্ষিণের আকাশ ঘন মেঘে ভর্তি অথচ বাতাস নেই। গাঢ় কুণ্ডলী পাকানো মেঘ, পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। তাকিয়ে আছি তো আছি।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একপাল পঙ্গপালের মতো কী উড়ে উড়ে আসছে। না, পঙ্গপালও নয়। গায়ে এসে ততক্ষণে পড়তে সুরু হয়ে গেছে। ছাই। টুকরো টুকরো অঙ্গার, ছাই হয়ে উড়ছে।

তবে ও মেঘ নয়। "কী ও?" আঁতকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম। "দাবানল? আগুন?"

ফরেস্ট-রেঞ্জার ছত্রসিং বললে—"হ্যাঁ, পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন। যেমন ভয়াবহ, তেমনি নিয়মিত। শত শত বৎসরের তদ্বিরে যে জঙ্গল তৈরী হোলো, প্রকৃতির একদিনের হোলিখেলায় তা শেষ হয়ে যায়। কত জনপদ, কত গ্রাম, কত পশু ধ্বংস হয়ে যায় অথচ কেউ কিছু করতে পারেনা।"

"কিছু পারেনা?"

"কিছু না। দু'চারদিন থেকে নিয়ে দু'চার মাস পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। কেউ কিছু করতে পারেনা। আগুনটা লেগেছে শেষরাত্রে। আমার কাছে লোক এসে গেছে বেলা ন'টা আন্দাজ।"

"তুমি কী করবে?"

"আমারই তো কাজ। শত শত কুলী গিয়ে আশেপাশের জঙ্গল কেটে নিশ্চিহ্ন করে ঐ আগুনকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে যাতে ও জ্বলে-জ্বলে শেষ করে দেয় নিজেকে, আর কারুকে না জ্বালায়।"

"হয় তা?"

"যখন প্রকৃতি অত্যাচার করে, মানুষ তখন সত্যিকার নিরুপায়। কিন্তু মানুষের স্বভাব নয় এই অসহায়তাকে স্বীকার করে নেওয়া।"

সত্যিই তাই! প্রকৃতি তার নির্মমতা নিয়ে যত রুদ্রমূর্তি ধারণ করে আসে, মানুষও তত সাহসে ও আশায় বুক বেঁধে তাকে বাধা জানায়। দৈত্যের মতো সংহার আসে তেড়ে, মানুষ তার দু'খানা ছোটো হাত দিয়ে তাকে ঠেলে রাখতে চায়। বাইরে থেকে যতই হাস্যকর হোক, এই প্রচণ্ড

প্রয়াসের পেছনে যে উদ্যম, দুর্দম চেষ্টা আছে, তাকেই বলেছে সমাজ, শাসন, বিজ্ঞান। গোলিয়াথ আর ডেভিডের গল্পের মতো, ভীম আর বকরাক্ষসের মতো, নৃসিংহ অবতার আর বালক প্রহ্লাদের মতো।

রেঞ্জার বলে—"আজ সকালে লোক পাঠালাম। এখন নিজে যাবো। ভাবলাম তোমায় নিয়ে যাই। যাবে?"

"কতদূর? আস্থানা ক্যাম্পে নেই। ওরা রাতে মেলা করছে। আমায় থাকতেই হবে।"

ডাক্তার এসে জুটেছে। ছত্রসিংকে বললো—"না হে, না; মাস্টার নৈলে বাচ্চাদের হাঁটি-হাঁটি পা-পা কে করাবে? সারা বিশ্বের ভারকেন্দ্র যে মাস্টারের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে।"

ছত্রসিং-এর কাছে ডাক্তারের এ আচরণ ভালো লাগেনি। কিন্তু কঠিন তার দৃষ্টি। ধরে ফেলেছে। বললে—"চটলে বুঝি। এই যে সামান্য ছত্রসিং-এর কাছে তোমায় উপহাস করছি। কিরকম ছোটোলোক তোমরা মাস্টার, একবার ভেবে ভাখো। কাল এই ছত্রসিং-এর বলা নির্জলা গাঁজাগুলো পরমানন্দে উপভোগ করছিলে ওর ঘরে বসে, সমানে সমানে; কোনও বাধা ছিলনা। আজ ছত্রসিং-এর সামনে বেহায়া মেয়েমানুষের মতো নিজের জাঁক আর মুরুব্বিয়ানা নির্বিবাদে হাঁকড়াচ্ছিলে। তখন ওকে বেশ গুণী জ্ঞানী ব'লে মনে করেছিলে। কেননা গুণী-জ্ঞানীর কাছে বড়াই জমলেই তো কামাল। বোকা মনিষ্যির কাছে হামবড়াই করেও লাভ কচু। অথচ আমি যেই রসিকতা করলাম অমনি ভাবলে—"

ওকে পুরো বলতে দিলাম না। "তুমি একটি গাড়ল-বিশেষ। আমি কিছুই বলিনি। ক্যাম্প ছেড়ে থাকার স্বাধীনতা আমার অতি অল্প তা তুমি জানো।"

"বেশ তো, যেওনা। মাথার দিব্যি দিচ্ছে কে?"

তিনজনেই চুপ রইলাম। কিন্তু সে মুহূর্তকাল। তারপরেই ছত্রসিং বললো—"বলুন, যাচ্ছেন?"

দেখি নীচে দুটো ঘোড়া।

ডাক্তার বললে—"আমি দুটো ঘোড়ার কথা ব'লেই এসেছিলাম। আমি আর সন্ধ্যায় বেরুচ্ছিনা। আমার ঘোড়াটা তুমি নিও, মাস্টার। ফেলে দিলেও চিকিৎসা করবে। ডাক্তারের ঘোড়া কিনা!"

আমি হেসে ফেলে বললাম—"তোমার উপযুক্ত সাজা হয় যদি আমি না যাই।"

"দিওনা সাজা! মরে যাবো!"

হাসতে হাসতে বললাম—"দেবোনা বুদ্ধু। তোমার কাছে হেরেই আমার লাগে ভালো। আমি সন্ধ্যার আগেই, না-হয় সঙ্গে সঙ্গে ফিরবো। ততক্ষণ…"

ডাক্তার বললে—"থাক্, বাকীটুকু না বললেও চলবে। আমি চুপচাপ থাকবো; ফিরে যতক্ষণ না আসো ততক্ষণ বোতলের ধারে-কাছেও যাবোনা।"

ছত্রসিং আর আমি বেরুলাম। জঙ্গলটার নাম নেই। তেরো মাইল দূরে। সমস্ত দুপুরটা ঘোড়ায় চড়ে কাটলো। কেউ জানলোনা আমরা কোথায় গেলাম। ডাক্তার রটিয়ে দিলো বাগী গেছি ক্যাম্পের কাজে।

পাহাড়ী পথ পুরোনো হয়না, কেননা কোনই নতুনত্ব নেই তাতে। যাতে নতুনত্ব আছে তাই পুরোনো হয়। নতুন আর পুরানো, আদি ও অন্ত, সৃষ্টি ও সংহার, বিবর্তন ও স্থাণুত্ব যেখানে এসে মিশেছে, মহাকাল সেখানে বাঁধা পড়েছে। সুন্দর সেখানে অভিনব, চমৎকার সেখানে বিস্ময়ব্যাকুল। সেই কেলু, পাইন, বরাস, চীড়, দেবদারু; সেই অজানা লতাগুল্মের নিভৃত নিরালার মাঝে মাঝে বনদেবীর আঁচলভরা সাদা, বেগনী, নীল, হলুদ ফুলের রাশ। সেই পাখীর ডাক, আলোছায়ার দোলা, হাল্কা বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা নাগকেশরের গন্ধ। সাদা সাদা ভাঁটফুলের গোছার মতো বনবাসকের বিছানা রোদের আঙিনায় পাতা; লতায় থাম বেয়ে বেয়ে উঠে গেছে বনগোলাপের বিলাস। প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়, গুহামুখে উঁকি মারে পথচারিণী পল্লীললনার উৎসারিত চাহনি, জিজ্ঞাসায় কম্পিত। পথচারী গ্রামান্তরবাসী যুবক হঠাৎ থেমে জানায় অভিবাদন, প্রত্যভিবাদনের আশা না রেখে। হঠাৎ সেটা পেয়ে আবার হঠাৎ বিস্ময়ে থমকে গিয়ে সরল হাসি হেসে ফেলে। সেই রাখাল বসে আছে পাহাড়ের উদ্ধত কোণের ধার বুকে জড়িয়ে, ওপরে নীচে লাফিয়ে লাফিয়ে চরে বেড়াচ্ছে সাদা সাদা ছাগল-ভেড়াগুলো। সবই সেই দেখা ছবি, জানা ভাষা—কিন্তু "চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে"। এই নিরন্তর গতির মধ্যে কোথায় যেন একটা জগদ্দল স্থিতি। এই চৈতন্যসমুদ্রের মাঝে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে যেন কোনো জড়বিষ্ণু শেষনাগের ছত্রচ্ছায়ায়, পায়ের ধারে শ্রী, মাথার ধারে লাবণ্য-

সুষমা। জেনেও জানিনা, বুঝেও বুঝিনা, এতো দেখেও দেখার অবধি পাইনা। "সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"—সবকিছু ঢেকেও আরও কিছু বাকী রইল। "দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ" এই যে "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র" "অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য" রূপ—একে ধারণায় আনি সাধ্য কি। হিমালয়ের গভীরে পথ চলতে চলতে বারবার গীতার অর্জুনকে মনে পড়ে। সেই বিরাট রূপের সামনে অর্জুন কেঁদে ফেলে বলেছিলেন—"না জেনে তোমায় নিয়ে খেলা করেছি, তোমায় বন্ধুভাবে উপহাস করেছি, জেনেছি কি তুমি কত বড়ো, কত বিরাট? তুমি কী? আমি কতো ছোটো। তোমায় বুকে ধরি এ স্পর্ধা কোথায় আমার? সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি!" বিরাটের সামনে না পড়লে অহং মেটেনা। যত শক্ত বাদাম তত জোর হাতুড়ি চাই। যত নিরেট অহং তত বিরাটের চাপ চাই। আমি ছোটো, কত ছোটো তা জানা যায়—অনেক অনেক বড়ো কিছু একটার সুমুখে দাঁড়ালে। আজ এই বিরাট হিমালয় তার হিংস্রতা, তার ভীষণতা, তার নির্মমতা নিয়ে, নিয়ে তার শ্যামস্নিগ্ধ শোভা-মঞ্জুল চটুলতা, তার লাবণ্যপরিমলহিল্লোলিত বসন্তশোভা, তার কুসুমকমনীয় মধ্যাহ্নছবির প্রসন্নতা, নিয়ে তার পত্রহিন্দোল সমীরণ, তার ছন্দমেদুর প্রজাপতি, তার ব্যথিতগতি প্রস্রবণ, নিয়ে তার সুর, তার গন্ধ, তার রূপ, তার ব্যঞ্জনা, তার ধ্যাননিমীলিত মহাকালের তৃতীয় নয়নের দ্যুতি—আমায় একেবারে মিলিয়ে দিয়েছে, মিশিয়ে দিয়েছে, মিটিয়ে দিয়েছে আমার অহঙ্কৃত দেহসর্বস্বতার স্তূপ। আমি ছন্নছাড়া, গৃহহারা, রীতিহীন, নীতিহীন, ধর্মহীন, আচারহীন, পথহীন, সমাজহীন একটা ভ্রাম্যমাণ সচ্চিদানন্দ বিলাস;—যার রূপ নেই, ভোগ আছে; দেহ নেই, গতি আছে; জীবন নেই, অনুভূতি আছে।

তেরো মাইল কতক্ষণে এসেছি জানিনা। চিরসাথী ছুরি নেই সঙ্গে, ঘড়ি নেই কব্জিতে। এসে পৌঁছালাম যেখানে, সেখানে শুধু কোলাহল আর কোলাহল। অন্ততঃ শ'পাঁচেক লোক—যুবা, যুবতী, বৃদ্ধ কেবল ঝপাঝপ কোপাচ্ছে আর গাছের পর গাছ কেটে কেটে দড়ি দিয়ে টেনে টেনে খড্ডে ফেলছে।

গাছ কাটা আর ফেলাও যে একটা বিশেষ রকমের শিল্প তা এখানে এসে প্রত্যক্ষ করলাম। এখান থেকে আগুনের কোনও চেহারাই চোখে পড়েনা।

অথচ এরা গাছের তলাটায় একটা বেড় দিয়ে ঝপাঝপ কাটছে। গাছের মাথায় একটা দড়ি প্রথমে বেঁধে নিয়ে অন্য গাছের মারফত সেটাকে নামিয়ে নিচ্ছে। তলাটা কাটা হলে, একসঙ্গে দশ-বিশজন মিলে টান মারছে। মড়মড় শব্দ করে গাছটা পড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দল এসে সেটাকে টেনে খড্ডের মুখে ফেলে দিচ্ছে। কতো গাছ যে কেটে ফেলেছে, ঠিকানা নেই। একটা পাহাড়ের পিঠ খালি হয়ে গেল।

কেন এই সর্বনাশ?

আগুন আসছে, এগিয়ে আসছে।

বালককালে একবার একটা গ্রামে আগুন লাগতে দেখেছিলাম। ঘটনাচক্রে গ্রামটায় হঠাৎ গিয়ে পড়ি। সমস্ত গ্রামখানা দাউ দাউ করে জ্বলছিল। নরনারী-নির্বিশেষে প্রত্যেকের চোখে মুখে সেই ত্রাস, সর্বহারা সর্বনাশের ছবি অবর্ণনীয়। সে-আতঙ্ক শুধু তাদেরই গ্রাস করেনি, তাদের দিকে যারা চায় তাদেরও গ্রাস করে; সে-আতঙ্ক সংক্রামক। সেই নিরবয়ব আর্তনাদ ও আতঙ্কের চাপে প'ড়ে মানুষ তখন কারুকে দায়ী করতে চায়। নির্মমভাবে প্রতিশোধ করতে চায় কারুর উপর। প্রতিপক্ষহীন এই আক্রমণের ফলে একটা মূক বিহ্বলতা তাদের শুধু যে বীভৎস করে তোলে তাই নয়, তাদের অন্তর থেকে শেষবিন্দু মনুষ্যত্বকে শুকিয়ে ফেলে এবং রুদ্ধ আক্রোশচালিত হয়ে তারা বীভৎস একটা কিছু করার জন্য ক্ষেপে দাঁড়ায়।... সেই ঘটনার কথা আজও মনে হলে আমার ভয় হয়। ঘটনাচক্রে আমরা কয়েকটি বালক হঠাৎ সেই বহ্নিমান গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়ায় তারা হঠাৎ আমাদের বিপক্ষেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, কারণ হঠাৎ এক বৃদ্ধা নারী চিৎকার করে ওঠে—"এরাই আগুন দিয়েছে।" মুহূর্তে কলসী হাঁড়ি ফেলে কয়েকটি নারী আমাদের দিকে তেড়ে আসে। আতঙ্কগ্রস্ত আমরাও যে কিভাবে কোন্ পথে কতক্ষণ ছুটেছিলাম জানিনা। নেহাত প্রাণের দায়ে ছুটেছিলাম, তাই বেঁচে গিয়েছিলাম।

কিন্তু কোথায় সেই আতঙ্ক! শত শত প্রাণী কাজ করছে। কাজ করার জন্য একটা কোলাহলও উঠছে। কিন্তু তাদের মুখে আছে শ্রমের চিহ্ন, একাগ্র কর্মস্পৃহার দৃঢ়তা; আতঙ্ক নেই, ভয় নেই, মানুষের দুঃখসুখের দোলার কোনও ছোঁয়া নেই। তৎপরতা, শীঘ্রতা, ক্ষিপ্রতাই যেন সমস্ত সত্তাকে অধিকার করে রেখেছে। এ যেন একমাত্র সন্তানকে বাঘে খাচ্ছে সে-ছবি নয়; এ যেন

শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য রণভূমিতে সৈনিকদের অসাধারণ উদ্যমের ছবি। এই শত্রু মানুষ নয়, প্রকৃতি; জ্ঞাত নয়, অজ্ঞাত। "তবু এরই মাঝে দিতে হবে পাড়ি; এসেছে আদেশ, বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হোলো শেষ!" সেই দুর্নিবার উদ্যম, উৎসাহ, প্রত্যাশা। কুড়ুল চলেছে ঝপাঝপ, ঝপাঝপ— অবিশ্রান্ত, শত শত হাতে।

আরও খানিক এগিয়ে যাই। এ পাহাড়ের বাঁকটা শেষ হয়ে যায়। অন্য বাঁকটায় ফিরতেই সামনে বহ্নিমান এক পর্বত চোখে পড়ে, মাঝে প্রায় এক মাইল ব্যবধান সৃষ্টি করে একটা খাদ। ও-পাহাড়ের গা-টা পুড়ছে। রোদের তীব্রতায় আগুনের ঝলক বেশী লক্ষ্য হচ্ছেনা। কাঠ-পোড়ার শব্দের সঙ্গে জল-শোষার একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ আসছে। কাঁচা বন পোড়ার একটা গন্ধ। যেহেতু দেবদারু, চীড় আর পাইনের বন, তাই জ্বলছে তাড়াতাড়ি; এ গাছগুলোর মধ্যে তেলের ভাগ থাকে কিনা। তা ছাড়া দেবদারু পোড়ার গন্ধটিও নেহাত মন্দ নয়। বাতাস সেই গন্ধে ভরা। কাঁচা পাতা জ্বলছে তাই ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসের দমকায় ভর করে নীল আকাশের মুখ একেবারে কালো করে দিচ্ছে। নীললোহিত শিব যেন জটা ঝাড়া দিচ্ছেন এই রোদে শুকিয়ে নিতে, এই আগুনে সেঁকে নিতে। গাছে গাছে ঘষতে থাকে। বিরাট বিরাট গাছ। এক-একটা ডালের ওজন কমপক্ষে দশ-বারো মণ। এইরকম দুটো ডাল যখন বাতাসে ঘষা খেতে থাকে তখন একটা বড়োরকম তাপের সংক্রমণ হয় এবং বারংবার সঞ্চারিত হয়ে সৃষ্টি করে শিখা, যার পরিণত অধ্যায় এই দাবানল। বুকের মাঝে ব্যাধির মতো বনের গোপনে তা জ্বলতে থাকে, যতক্ষণ অনেকটা ছড়িয়ে বাইরে না দেখা দেয় ততক্ষণ কেউ জানতে পারেনা।

রাতের বেলায় ক্যাম্প থেকে এই আগুন একটু-একটুও যা দেখা যাচ্ছিল তা নয়নমনোহর!!

আগুন লেগেছে কোথাও, এতে মনোহারিত্ব কোথায়? কিন্তু দাবানল যে না দেখেছে সে বুঝবেনা একটা দু'হাজার ফুট পাহাড় দাউ দাউ করে জ্বলছে এ-দৃশ্য কেমন দেখায় জনহীন অন্ধকার রাত্রে। সেই লোহিতসঙ্কাশ, সেই হিরণ্যগর্ভ জ্বলদর্চি শিখা। আগুনকে কেন কৃষ্ণবর্ত্মা বলা হয়েছে, কেন তাকে বায়ুসখা বলা হয়েছে এই আগুনকে না দেখে তা ধারণায় আনা যায়না। বাতাস যেন হুঙ্কার শব্দ ছেড়ে এই খাণ্ডবদাহনকে সার্থক করতে লেগে গেছে। তার ভেতরে

সোনার দীপ্তি, তার ভেতরে তপ্ত লৌহের লোহিত দ্যুতি; তবু তারই ভেতর থেকে পথ কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে কৃষ্ণকুণ্ডলী জটাজাল। দেখতে দেখতে চোখ যেন ক্ষুধায় পিপাসায় আতুর হয়ে যায়। মানুষগুলো এই মহাবিক্রমের পাশে খাটছে যেন মদমত্ত কৃষ্ণকায় মহিষের পাশে থেকে পিঁপড়ে চাইছে তার ডিমগুলোকে সাবধানে বাঁচিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে।

প্রকৃতির সব রহস্যের বড়ো রহস্য এই যে, ঐ সর্বনাশা মহিষ সত্ত্বেও পিঁপড়ে তার ডিম নিয়ে বাঁচে।

*

ক্যাম্পে ফিরে চা খেয়ে নিলাম।

তারপরেই বাইসারিয়ার কাছে গিয়ে একটা মোটামুটী ধারণা করে নিলাম সভার মেল-মেলাপের, কার্যধারার। তারপর করমচন্দের আফিস-ঘরে একটা কোণ নিয়ে একটু শুয়ে পড়েছি।···

কন্‌কনে বাতাসে তন্দ্রা ভেঙে দিলে। কোথা থেকে বরফগলা হাওয়া বইতে সুরু করেছে। ব্যারোমিটার ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে নামছে···সাঁইত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, বত্রিশ, ত্রিশ···আর পারা যায়না! জোর বাতাস। বরফের গুঁড়োর মতো। টুকরো বরফ এমন জোরে পড়ছে যে ঘরের মধ্যে যেন আরো শীত করতে লাগলো। বিক্রম আর গোপী নীচের জলসায় জমে গেছে। ঘণ্টাখানেক জোর করে কাজ করা গেল।

তারপরেই শুয়ে পড়ি। আজ আমি রাতে উঠবোনা। স্থির করে ফেললাম উঠবোনা। কিছুতেই না। রোজ রোজ এই ভূতে-পাওয়া রোগ কোনও কাজের কথা নয়। পাহাড়ের ওপারে দূরে দাবানলের ছটা যেন কমে আসছে। এই বরফ-ঝড়টা বোধহয় ওখানে গলে যাচ্ছে। তাতে হয়তো আগুন নিবছে। ছত্রসিং ফেরেনি। সে ঐ জায়গাতেই তাঁবুর মধ্যে আছে। আজ সারা ক্যাম্পে কেউ নেই। কেবল আমি আর অগ্নিরক্ষক তুস্‌সীরাম। সকলে নীচে জলসায় ব্যস্ত।

তুস্‌সীরাম এক ঘটি গরম জল এনে বললে—"বাবু, বিলিতী চা খাবে?"

অর্থাৎ কোকো খাওয়াতে হবে ওকে।

দুজনায় দুটি কাপ হাতে নিয়ে চুক্‌চুক্ করে খাচ্ছি।

"হ্যাঁরে তুস্‌সীরাম, খাওয়াবি বললি, কবে খাওয়াবি?"

হেসেই আকুল তুস্‌সীরাম—"কেন আমায় তুমি লজ্জা দাও বাবুজী? আমার ঘরে কী আছে যে তোমায় দিতে পারি?"

"তুই কী খাস্‌?"

"কী আর খাই! খানিকটা মক্কার আটার সঙ্গে বাজরা মেশানো, আর নুন। যদি শাক জুটে গেল বনে-বাদাড়ে তো ভালো।"

"কেন, মাংস আর ঐ ব্যাঙের ছাতা, ঢেঁকি-শাক আর গোয়ার-কি-ফলি? বেশ লাগে রে খেতে।"

"বাবুজী, তোমরা ওসব যা খেয়েছো তাতে কত মসলা ঘি দেওয়া। মাংস আমরা কোথায় পাব? যা ভেড়া ছাগল পুষি তা থেকেই দু'চারটে চলে যায় শীতের সময়ে খেতে—তখন যে বরফ। আর বিয়ে-থা নানা সামাজিক ব্যাপারে আমাদের সেলামী-ই তো মাংস। দিয়ে-থুয়ে কী-ই বা থাকে?"

"একটা বিয়েতে তোদের কী খরচা?"

"তার কি লেখাজোখা আছে?"

"তবু?"

"তবু আবার কি? খালি খাওয়াও। গয়নাগাটি দাও-না-দাও, খাবার দাও। মণ দু'তিন গম। আট-দশ সের ঘি, আর অন্ততঃ শ'খানেক টাকা। আমাদের এসব যোগাড় করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। বেশীর-ভাগই আমরা বিয়ে বাবদে ঋণগ্রস্ত। নৈলে—"

"নৈলে কী?"

"নৈলে ক্ষেত-খামার যা আছে সবার পেট ভরে। সবারই ঘরে নিদেন দু'তিনটে গরু, একজোড়া বলদ, আট-দশটা ছাগল, দশ-বারোটা ভেড়া আছে। উন যা হয়, দুধ যা হয় তাতে দিব্যি চলে যায়। সর্বনাশ করে টাকায় চার আনা সুদের ধার।"

"বলিস কি, টাকায় চার আনা সুদ?"

"হ্যাঁ, বাবু।"

"তোদের রোহ্‌ড়ু জেলা থেকে তো পদম্‌চন্দ্‌জী নির্বাচিত। চমৎকার লোক। তোদের জন্য কতো খাটেন। তাঁকে বলিসনা কেন?"

"ঐ নির্বাচনের সময়টুকু দেখা পাই। তারপরে আর কৈ! আজই নয়

নির্বাচিত হয়ে সিমলায় আছেন। নৈলে জানেন না কি? ওঁরই জানাশুনো লোক কতো আছে—সুদ দেয়ও, নেয়ও। উনি কী আর করছেন?"

"করছেন রে করছেন। এতদিনের পাপ কি একদিনে যায় রে? এই যে আমরা পথ করতে এসেছি এই তো লক্ষ্মী।"

"লক্ষ্মী না ছাই। ঘি চলে যাবে গাঁ থেকে, নকল ঘাস-বাটা ঘি আসবে; উন চলে যাবে, পাট-শনের কাপড় আসবে। আমরা মারা যাবো এতে। তাইতো রাস্তা করায় হাত দিইনি আমরা।"

আলাপটা ক্রমে জমে উঠছে। যেন রাশিয়ান কোনও প্রচারনবীশে 'Stalin Prize'-পাওয়া বইয়ের সংলাপ শুনছি। সব দেশের চাষার সমস্যা এক, সন্দেহ এক, দাবী এক, আর বোধহয় পরিত্রাণও এক।

"বোকা কোথাকার। রাস্তা না করা হলে আমি আসতাম? তোর সঙ্গে কথা বলতাম? তোর কথা নিয়ে দেশে ফিরে সবাইকে শোনাতাম? হ্যাঁরে, রাস্তা হলেই তো আমাদের মতো কত লোক বারবার আসবে; জোর করে তোদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল করে দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য তোরা নিজেরা দরদস্তুর করতে পারবি। দালালের হাতে পড়বিনা। এই কোণে বসে থেকে তোর বাপ-পিতামহ থেকে সবাই তো এই দুর্দশায় কাটিয়েছে। এ থেকে কি পরিত্রাণ পাবিনা? ঐ মহাজন, ঐ দালাল, ঐ ঋণ, ঐ রোগ, ঐ বোকামি—এসব কি করে যাবে রে? এমনি একসঙ্গে বসে কাপে করে চা কে খেয়েছে কবে রে?"

ও যেন একটু টলেছে। কিন্তু চাষা; ওদের বিশ্বাসের ভিত জমির চেয়েও শক্ত। নড়াতে গেলে বারবার চাষ দিতে হয়।

"কিন্তু তোমরা তো চলে যাবে।"

"আজকের সূর্য চলে গেছে। এখন অন্ধকার। তাই কি বরাবর অন্ধকার থাকবে?"

হাসলো চাষা তুস্‌সীরাম।

"তবেই বোঝ্‌। এই বরফের দিনে তোরা কী আশায় কাটাস্? আবার গরম আসবে। ন্যাংটা গাছগুলো নতুন পাতার সাজ প'রে দাঁড়াবে। তেমনি আমরা চলে যাবো। আবার আমাদের মতো কত লোক আসবে। আসবেই আসবে। কেবল আসতে থাকবে। কেবল জানতে থাকবে। কেবল চলতে

়কবে। ঝগড়া করবে, লড়বে আর তোদের গ্রাম আর আমার গ্রাম কাকার হয়ে যাবে। যাবেই যাবে রে, যাবেই যাবে। তুস্‌সীরাম, এই ধৃতিমাতা আমার, তোর, সবার। এই ধরিত্রির বুকে থেকে তোর আর আমার 'রকমের জীবন কেন হবে? কেন আমি বলবো রাস্তা হোক্‌, তুই বলবি রাস্তা বেনা। খাট্‌ তুস্‌সীরাম, খাট্‌, সবাইকে খাট্‌তে বল্‌। চুপ করে বসে থাকলে কছু হবেনা।"

তুস্‌সীরাম বললে—"তুমি গাঁয়ে গিয়ে বলোনা কেন এসব?"

"তুই যেতে দিচ্ছিস্‌ কই? আমি বড়ো পেটুক, জানিস্‌? আমি যখন বিয়ে করতে যাই, আমার মা আমায় আড়ালে ডেকে একটি উপদেশ দিয়েছিলেন—বলেছিলেন যেন একটু লজ্জা করে খাই। খেতে পেলে আমার আর কিছু মনে থাকেনা।"

"তোমার বিয়েতে আমায় ডাকবে বাবুজী?"

"সেকি রে? বিয়ে যে আমার হয়ে গিয়েছে।"

"না, যখন আবার হবে।"

"আবার হবে কিরে?"

"তোমার বৌ যখন তোমায় ছেড়ে দেবে, অন্য বর বিয়ে করবে, তোমার চেয়ে ছোটো।"

ভাগ্যিস্‌ শ্রীমতী সঙ্গে নেই, নৈলে তুস্‌সীরামের যা গতি হোতো তা আর 'লে কাজ নেই। ডাক্তারের কথা। এখানে এক এক জন স্ত্রীলোক বহুবার স্বামী বদলায়।

"আমরা ওসব দেশে বৌ বদলাই, বর বদলাইনা। তা ছাড়া বদল করাটাই আমরা খারাপ মনে করি। আমরা তো এসব বন্ধ করার জন্য রীতিমতো আইন করছি। ভালো হবে—নয়?"

বেচারী তুস্‌সীরাম বললে—"কি জানি কি হবে। আমার বৌ তো আমায় ছাড়তেই চায়না। শিবদত্ত চাকরি করে সিমলায়। কতো বললে—বদল করতে। রাজী-ই হোলোনা।"

"ঠিক রে, আমার বৌও তাই। আমি বদল করতে বললেও করবেনা।"

"আর তুমি? তুমি যদি বদল করতে চাও?"

"আমি পারি। কিন্তু করিনা। কেন বল্‌তো তুস্‌সীরাম?"

আহা কী সুন্দর হেসেছিল তুস্‌সীরাম! ওর রোগ আর আমার রোগ এক।

"তবেই ছাখ্‌ আমরা কতো এক! আমরা দুই ভাই। খাওয়াবিনা? তোর বৌ দেখাবিনা?"

"না না, বাবুজী, সে আমার প্রায় একমাসের খরচা হয়ে যাবে। আমি পারবোনা খাওয়াতে।"

"কেন খরচ হবে শুনি?"

"আমি বলেছিলাম বৌকে। সে বলে—চিনি আর ঘি, চা আর চাল না হলে আমি যেন তোমায় না ডাকি। সে শুনবেইনা।"

"আচ্ছা, আমি চাল চিনি আর চা দিয়ে দিচ্ছি। ঘি-টা তুই খরচ কর্‌।"

"আমি জানিনা বাবু, আমায় জিজ্ঞাসা করতে হবে বৌকে।"

"তাই করিস্‌। কিন্তু তোর বৌ যাই বলুক, আমি যাবই, খাবই।"

তুস্‌সীরাম চলে গেল। আমি নীরব আকাশের ঐ শত শত ক্লান্ত নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম ঐরকম আকাশে আকাশে ছড়িয়ে আছে তুস্‌সীরামের দল। হোক তা ক্যানাডা, হোক তা মরিশাস, হোক তা তুন্দ্রা, হোক তাস্‌মানিয়া, হোক চিলি, হোক টিউনিসিয়া—আকাশে আকাশে তারা চলে এক সৌর বিবর্তনের রীতিতে,—ক্ষেতে ক্ষেতে, খামারে খামারে, নীলনদের ধারে, আমাজনের কিনারে, হোয়াংহোর অববাহিকায় একই তুস্‌সীরাম লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি তুস্‌সীরাম হয়ে দেখা দেয়।

*

ঘুম ভাঙলো বাংলাগানের সুরে—"তোমার সুর শুনায়ে যে-ঘুম ভাঙাও সে-ঘুম আমার রমণীয়"। তখনও ভোর হয়নি। তুস্‌সীরাম চা এনে ডাকছে। চেয়ে দেখি ডাক্তার পাশটিতে বসে আমার *Huxley*-খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

"আজ এতো সকালে?"

"আগে-ভাগে জানতে আবার কোথায় পালাও। খুব ক্যাম্প করতে এসেছিলে যাহোক। কেবল হৈ-হৈ করে ঘুরে মরছো। কোথায় কোন্‌ গালগল্প আছে তার খোঁজ। আজ কী প্রোগ্রাম?"

"আজ গোপী-বিক্রমের মতো লাইনে পাথর কাটতে যাবো।"

গোপী লেপের মধ্য থেকে বললে—"ইয়া খুদা, তুনিয়ার দোস্‌রা মুট শোনালে আজ! দিন ভালো গেলে, খুশ্‌ কিস্‌মৎ।"

বিক্রম বললে—"পহেলা কি?"

"তুমি যে বারবার বলো লেপের তলায় তুমি পা ছোঁড়োনা! সেইটা।"

ডাক্তার ও আমি হেসে ফেললাম।

"মজাক নয় ডাক্তারসাব্‌—যেমন চাট লাগাচ্ছিল মনে হচ্ছিল সত্যিই আমি নবাবসাব্‌। Indian Prince-এর চামড়া—নৈলে লক্ষ গুঁতোতেও না-টস্‌কে আছি কি করে? মালিশের ব্যবস্থা করিয়ে দেবেন, ডাক্তারসাব্‌। হাড়গুলো সব ডিস্‌প্লেস্‌ড্‌ হয়ে গেছে।"

ডাক্তার কৃত্রিম পরীক্ষা করে বললে, সবই ঠিক আছে।

খানিকটা ভেবে গোপী বললে—"তাই নাকি? তবে তুটো থিওরি হতে পারে; একটা—আপনার মাথাও কোনও কারণে এখন displacement রোগে আক্রান্ত, তাই displaced জিনিসমাত্রেই আপনার কাছে properly placed।"

"কিন্তু কাল আমি drink করিনি, গোপী।"

"তাই বলুন!" ছাড়লে গোপী: "আপনি কি করে সুস্থ থাকবেন? মাছের পক্ষে জল যা, ডাক্তারের পক্ষে alchohol তাই।"

বিক্রম বললে—"দ্বিতীয় থিওরি কী, নবাবসাব্‌?"

"সেটা বিল্‌কুল বৈজ্ঞানিক মতবাদ। হাড়গুলো সারারাত একটা পুরো চক্কর নড়বড় করতে করতে এখন আবার নিজের জায়গায় পৌঁছে গেছে।"

বিক্রম বললে—"এইটাই সত্যিকথা। হাড়গুলো ফিরেছে। কেবল মগজটা যে ডিগ্‌বাজি খেয়েছে তা থেকে এখনও সামলায়নি।"

"ঠিক বলেছো। মগজ যদি ঠিকই থাকতো তো তোমায় একখানা জবর লাথি না ঝেড়ে এক-বিছানায় বাস করছি কি করে। উঃ, হাড়গুলো সব ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে।"

ডাক্তার বললে—"মাটি কাটো, ঠিক হয়ে যাবে।"

গোপী বললে—"প্রিন্সিপল-সাব্‌ও যে চুঁয়াদের মতো কথা বলেন আজ শুনলাম। জনাব কি আজ পাথরের গায়ে হাত বোলাতে যাবেন?"

আমি বললাম—"হ্যাঁ গোপী, রোজই আমি খানিকটা খাটি। কোনও দলে নেই, তাই সব দলেই কাজ করি। রোজ এক-একটা দলে। আজ আমি উৎকল-দলে কাজ করবো।"

"তার আগে আমার সঙ্গে চলো—" ব'লে ডাক্তার আমায় বার করে নিয়ে গিয়ে সোজা ওর গোশলখানায় ঢুকিয়ে দিলে।

আমি একেবারে চান সেরে বেরিয়ে চা এবং পরোটা খেতে খেতে কথা বলতে লাগলাম।

ডাক্তার হঠাৎ বললে—"তুমি জার্নালিজমে না ঢুকে মাস্টারীতে ঢুকলে কেন মাস্টার? কাল তোমার কবিতার খাতা বুদ্ধু এনেছিল; শুনলাম গল্পও লেখো। কোনটাই খারাপ নয়। কিন্তু তোমার লেখা দিয়ে রোজগার করতে তোমার বাধা ছিলনা।"

"বাংলাদেশের সাহিত্য পড়েছ হয়তো; কিন্তু সেদেশের জার্নালিজ্‌ম্ তো জানোনা। সেদেশে এখনও ডিকেন্স, থ্যাকারে, স্কট আর লিটনের রাজত্ব। ভাবছো লেখকদের কথা বলছি? আদৌ নয়। বলছি বই-বেচা বেনেদের কথা। এখনও ওরা ছত্রপতি—অর্থাৎ প্রতি ছত্র পড়ে পড়ে পয়সা গোনে। দাম বোঝে, মূল্য বুঝতে চায়না; পয়সা বোঝে, টাকা বোঝেনা। ওজন ছাখে, গুরুত্ব ছাখেনা। থ্যাকারে ইত্যাদির সময়ে ফ্লীট্-স্ট্রীটে আর গ্রাব্-স্ট্রীটে পার্থক্য ছিলনা। তারা বুঝতোনা সাহিত্য; তারা জানতো পণ্য। সাহিত্য-চিনির বলদ ছিল কলম-পেষী বোকার দল। একটু ফটো ছাপিয়ে দিলেই যারা খুশী!"

"চটলে দেখছি! উদ্দেশ্য ছিল তোমায় একটু তোয়াজ করি। একেবারে তিড়বিড়িয়ে উঠলে কেন বল তো? বেচারা বণিকরা বাণিজ্য না করে দাতা-কর্ণ হয়ে উঠবে এমনটা আশা করাও তোমাদের প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কি!"

"তাইতো বণিকদের দেশের লেখকরা সাহিত্য আর বাণিজ্যের যৌথ প্রতিষ্ঠান খুলে লক্ষ্মী-সরস্বতীকে বাঁধলো। ওদের লেখকদের গিল্ড্ আছে, লিমিটেড্ কোম্পানি আছে, বুক-সোসাইটি, বুক-ক্লাব আছে। এখন লেখকরা আর ততটা চুপ্‌সে মরেনা।"

"তবে তো পথ খোলাই। বাংলাদেশে তাই করোনা? চেষ্টা করেনি কেউ?"

"করেনি ? মাস্টারী থেকে লেখক, লেখক থেকে বণিক এমন বহু আছে। বহু আবার লিমিটেড্ কোম্পানিও করলো সদিচ্ছা পোষণ করে। যারা সাহিত্য করলো তারা লালবাতি জ্বাললো; জোচ্চোর খ্যাতি অর্জন করলো; যারা বাণিজ্য করলো তারা সাহিত্যিককে পুনরপি ডবল চোষা দিল। বাংলাদেশটা সাহিত্যের দেশ, বণিকের নয়; অন্ততঃ কলেজ-স্ট্রীটের আশেপাশে কেউ সাহিত্যসেবার জন্য দরজা খুলে বসে নেই।"

"তাতে তোমার সাহিত্য মারা যায় কেন ?"

পাহাড়ের ওপর এসে বিদেশীর কাছে বাংলাদেশের সাহিত্যিক বাজারের আলোচনা করার মতো জরানো—বোকামির আচার খেতে নারাজ। বললাম —"থাক্ ওসব কথা। আমার কাব্য তোমার ভালো লেগেছে এজন্য ধন্যবাদ। বাংলা হয়তো বলবে—'মেড়োর যাহে তৃপ্তি হোলো, মোদের তাহে হবেনা!' এর বড়ো তো কথা নেই!"

ডাক্তারের রুগী বাড়তে লাগলো। আমি পাথর কোপাই আর ভাবি—সাহিত্য—বাংলা—প্রবাসী বাঙালী—কলেজ-স্ট্রীটের যূপকাষ্ঠ—আর বাংলাভাষার নির্মম মক্ষীরানী, যার মনস্তুষ্টির জন্য শ্রমিক লেখকরা ক্লীব অধ্যবসায়ে যুগে যুগে কালের চাকে কাব্যের মধু সঞ্চিত করে রেখে গেল। এতো নরম, এতো নির্মল, এতো ছন্দময়ী ভাষা।—এর প্রেমে মজবেনা এমন বিদগ্ধ কে আছে ?

*

বুদ্ধু বলে—"দাদা, হিন্দীতে লিখুন না। এ বেটা মেড়োরা থ' হয়ে যাবে!

আমি বুদ্ধুকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনা যে, এধরনের কথা আমার রুচিকে তীব্র আঘাত করে। আমি বুদ্ধুকে বললাম—"তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেবো, বুদ্ধু, যদি তুমি প্রকাশ্যভাবে এই অপরাধের জন্য ক্ষমা না চাও। যে জাতিতে ও ভাষায় মীরাবাঈ, সুরদাস, ভূষণ, রায় পিথোরা, তুলসীদাস, হরিঔধ্, সুমিত্রানন্দন, সুভদ্রাকুমারী, বচ্চন এঁরা সব লিখে গেছেন; যে ভাষায় ও সাহিত্যে বাইসারিয়া, চতুর্বেদীর মতো ছেলেরা আজও আত্মনিবেদন করে, যে ভাষার মাধ্যমে চিরজীবন তুমি বর্ধিত—তার সম্বন্ধে এমন ঘৃণার্হ উক্তি আমি সহ্য করবনা। হিন্দী যারা পড়েনা তারাই হিন্দীর নিন্দে করে, জানো ?"

বুদ্ধু বললে—"বাঃ, দাদা ; তা ব'লে বাংলার মতো ?"

"তুমি যে সেই সাহিত্য-সভার পুরোহিতের মতো বলছো। রবীন্দ্রনাথ খুব বড়ো ঔপন্যাসিক কেননা 'দেবদাস' বা 'গৃহদাহ' একটা নভেল নাকি? শরৎচন্দ্রকে গাল না পাড়লে আর রবীন্দ্রনাথকে বড়ো বলা যায়না। আবার শরৎচন্দ্রকে বড়ো বলতে গেলেই শরৎ-ভক্ত বলবে—'রবিবাবুর সবই কেমন যেন ধোঁয়া ; শরৎবাবু আমাদের লেখক—দরদী। রবিবাবু কবিতায় বড়ো, কিন্তু…' ইত্যাদি। বুদ্ধু, বাংলাভাষা বড়ো, খুব বড়ো। তাই ব'লেই হিন্দীকে ছোটো করতে হবে ? যে প্রকৃত বড়ো সে কারুকে ছোটো করেনা।"

খাওয়া সেরে চলে গেলাম ক্যাম্পে। আজ অনেকে ক্যাম্পে বসে আছে—আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বো আর ইংরেজী অনুবাদ করে করে বোঝাবো এই আমোদে সব জুটেছে ! 'মরণ' কবিতার ছন্দ ওদের ব্যাকুল করে তুলেছে ; "কালি মধুযামিনীতে" শুনে ওরা বারবার পড়তে বলেছে ; "তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে" গানখানা শুনে ওরা স্বীকার করেছে সংস্কৃতের পর বাংলার মতো নরম ভাষা নেই। 'বলাকা'র কবিতার ছন্দকে ওরা প্রণতি জানিয়েছে, 'ক্ষণিকা'র চটুল রহস্যের মাধুরিমা ওদের লক্ষ্ণৌ-দিল্লী-শাসিত বুদ্ধির ফলকে ঝলক তুলেছে। ওরা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়ে গেছে। বলেছে —"ভক্তিরসের কথা জানিনা, কিন্তু প্রেম, শৃঙ্গার, বীররসের এমন মধুর মিলন পাইনি। বাক্ ও অর্থের এমন যোগাযোগ অপূর্ব।"

দশহাজার ফুটের মাথায় রবীন্দ্র-ভক্ত সংগ্রহ করা একটা ব্রত-বিশেষ। একটা সোমক-যজ্ঞ যেন। এই যজ্ঞ সমাধা করার পর নির্মল-শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম—রাত তখন একটা। ততক্ষণ সভা জোর চলেছিল।

ষোলো তারিখ খুব সকাল-সকাল সকলে কাজে চলে গেল। বেলা বারোটা পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কাজ চললো। খাওয়া সেরে বিশ্রাম না করেই আবার কাজ চললো। আজ সবাইকে কাজে পেয়েছে। আজ শীত কম ; ঝক্‌ঝকে রোদ। এমন দিনে কার্জ করার উৎসাহ বাড়ে। আগের দিন খান্নার কাছে শুনেছিলাম রাখাল আর নির্মল তার দলে খুব খাটছে'। একটা বিরাট পাথরের চাঙড় বেড়ে একটা পাইনের শিকড় এমন জড়িয়েছে যে, গাছটা কেটে ফেলার পর এখন পাথরটা সরাতে পারছেনা। অতবড়ো চাঙড় নাকি এযাব

কানো দলে পায়নি। একটা বড়ো জমাট পাহাড় কেটে ফেলা একধরনের পরিশ্রম। কিন্তু একটা চাঙড় সরানো বিপদ। খান্নার গ্যাঙে গেলাম।

খান্নার দলের আগের দলটায় শুক্লা দলপতি। শুক্লাদের দলে দেখি দিল্লী-পলিটেক্‌নিকের একটি ছেলে বসে ছবি আঁকছে কর্মরত সাথীদের। জল-রং দিয়ে আঁকছে হিমালয়-জঙ্গলের ধারে কর্মব্যস্ত যুবকদের ছবি। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই পাঁচ-ছ'খানা আরও কাজ দেখালো। সারা ক্যাম্পটার একখানা ছবি, একখানায় সেই খাদরালা-হোটেল, একখানায় তুষার-মণ্ডিত দিগন্তটি ধরা পড়েছে। সার্থক ছবিগুলি এঁকে এঁকে ছেলেটি সকলকে চমৎকৃত করেছে।

অভ্যাস করলে লেখা যায়, সাহিত্যিক হওয়া যায়না। তেমনি অভ্যাস করলে মেকানিক্যাল ড্রইং শিখে আর্কিটেক্ট হওয়া চলে; চিত্রশিল্পী হওয়া যায়না। শুধু দৃষ্টি আর ক্ষমতাই শিল্পী-পটুয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একটা 'inward eye'—একটা অন্তর্দৃষ্টি দরকার। *The light that never was on sea or land* —সেই অবাঙ্‌মনসগোচর লোকান্তর ভাবদৃষ্টিটি চাই। ইচ্ছে করলে যেমন দুটো চোখকে দশটা করে তোলা যায়না, যেমন হাতের আঙুল বা নাকটাকে বাড়ানো-কমানো যায়না, তেমনি এই ভাবদৃষ্টিটি না থাকলে পাওয়া যায়না। এরই নাম স্বভাব। গুরুকৃপা পেলে এই স্ব-ভাবটিকে বিশ্ব-ভাব করে তোলা যায়। যা নিজের তাকেই দশের প্রীতির সামগ্রী করা যায়। আজকের মধুর স্বপ্নটিকে চিরদিনের মধুর বিস্ময় দিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলে অজর অমর করে তোলা যায়। একদিকে যেমন 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার মুক্ত' করে রাখতে হয়, বাহিরকে অন্তরে প্রবেশ করবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে, অন্যদিকে তেমনি ইচ্ছা করে বহু গণ্যকে নগণ্য করে রাখার দায়িত্ব বহন করতে হয়। যা দেখলাম তাকে রূপ দিতে গেলে অনেকখানি যা দেখলাম-না তাকে স্বীকার করে আড়ালে রাখতে হয়। আজ প্রভাতের এই ছবিটিতে যে আনন্দ আছে তার মধ্যে রূপ আছে, রং দিয়ে ফোটানো যায়; আলো আছে, ছায়া আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে, সীমা আছে, নিকট আছে, দূর আছে, এদের রূপ তাই ধরা যায়। কিন্তু অস্বীকার করা যায় কি যে এই আনন্দের মধ্যে অরূপও আছে অনেকখানি? এই যে প্রজাপতিটি উড়ে গেল, এই যে আলোর মাঝে ধরণীর রেণুগুলি নেচে নেচে আলোয় দিয়েছে প্রাণ, ঐ যে দূরে দূরে, কাছে কাছে নানা পক্ষীর কলকাকলী, ওদেরও অর্ঘ্য আছে;—এদের জড়িয়ে মিলিয়েই তো আজ প্রভাতের এই

আনন্দ। এই নিরাকার আনন্দের রং কই? একে ছবির মাঝে ধরা যায় কোথা থেকে? বর্ণের বন্ধনে রূপের, আনন্দের প্রকাশ তাই সীমাবদ্ধ। তাই বিখ্যাত আকৃতি-শিল্পীরা বারবার একই ব্যক্তির আকৃতি চিত্রণ করার পরেও নিজের বিশিষ্টতাকে লোপ করতে পারেন না। ইপ্‌স্টীনের প্রতিমূর্তি-শিল্প কেবল কোনও ব্যক্তির প্রতিকৃতিই নয়, ইপ্‌স্টীনেরও মানসিক প্রতিকৃতি। সিম্‌সন্‌, হুইস্‌লার, রেনল্‌ড্‌স্‌—এঁরা যাঁদের ছবি এঁকেছেন তাঁরা আজ বেঁচে নেই, কিন্তু ঐ শিল্পীরাই বেঁচে আছেন। বোঝা যায় শিল্পীর নিজের মানসলোকে যে কার্লাইল, যে সারা সিডন্‌স্‌, যে বার্নার্ড শ' প্রতিভাত—সেইসব কার্লাইল্‌, সিডন্‌স্‌, শ'-ই তেলরঙে জীবন্ত হোলো। এ কার্লাইল্‌ 'এডিনবরা রিভিয়ু'-র কার্লাইল কিনা তাতে যায়-আসেনা। বড়ো কথা যে, তা শিল্পীর ছবি।

আজকের এই প্রভাত তোমার আমার চোখে তার রমণীয়ত্ব নিয়ে ধরা না-ও দিতে পারে। কিন্তু পাইনের তলায় বসে এই ছেলেটি তাকে ধরে রাখলো। ওর আনন্দ সবার আনন্দ হয়ে রইল। শিল্পের গোড়ার কথা এইখানে। বস্তু ছেড়ে ভাবমূর্তিকে বিকশিত করার দুর্দম পিপাসা থেকেই 'Impressionist Art'-এর জন্ম। আজকের শিল্পী তাই রূপের ছবি আঁকার চেয়ে রসের ছবি আঁকতে ব্যগ্র। রবীন্দ্রনাথের ছবি এই রূপাতীত ভাবময় লোকের প্রতিচ্ছায়া।

আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো—"ভালো লাগছে আপনার?"

আমি মুগ্ধ বিস্ময় ঢেলে বলি—"ছবির চেয়েও তোমায় বেশী; তোমার আকুলতা স্পষ্ট, তোমার রেখাপাত সবল, তোমার দৃষ্টি খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঝলকদার, সোজা।"

"বসুন, আপনার ছবি আঁকি।"

হেসে এগিয়ে গেলাম।

খাদের সেই চাঁই পাথর ওরা হাতুড়ি পিটে পিটে খান্‌খান্‌ করেছে। বিরাট বিরাট হাতুড়ি। কিন্তু আরেকটা চাঙড় দেখা দিয়েছে। পাইনের গুঁড়ির ওপর দিয়ে চালিয়ে চালিয়ে সেটা খাদের মধ্যে ফেলতে-ফেলতেই দুপুর কাবার।

রাখাল আর নির্মল বললে—"আজ আপনার কোমরে ব্যথা হবে।"

আমি বললাম—"বেশ, আজ বিকেলে বাজেশালে যাবো। একদিন গিয়ে ফিরে এসেছি। আজ একেবারে তলার ঐ একটুখানি কুঁড়ে অবধি যাবো।

তুলসীরামের আস্তানা বার করবো। আজ ও ছুটিতে আছে। ওকে ঠিক বাড়ী পাবো। তুলসীরাম ব্যাটা মহা কঞ্জুষ! ওর ঘাড় ভেঙে কিছু খেয়ে আসতে হবেই।"

নির্মল আর রাখাল বললে—"আপনি যাবেন যান্। আজ আমরা আবার কাজে আসবো। খান্নাকে কথা দিয়েছি।"

*

দুপুরে আজ ডাক্তার ছানার ডালনা খাওয়ালে, বালজীর ঘাড় ভেঙে। ছেলেরা মহা খুশী।

আমার নামে চার-পাঁচখানা চিঠি। রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছি। পড়া শেষ করেছি। হঠাৎ চেয়ে দেখি নীচের পথে সত্যেন্দ্র সিন্‌হা এবং সতীশ সিন্‌হা। ওরা কোথায় চলেছে? সত্যেন্দ্র সিন্‌হার ওপর কড়া হুকুম ছিল—আমায় না ব'লে ও খাদরালার পাহাড় ছাড়বেনা। অথচ ও গাঁয়ের পথে চললো কোথায়?

গোপী আর বিক্রম এসে গিয়েছে ততক্ষণ।

"ডাক্তারকেও সঙ্গে নিন্‌না।"

আমি বললাম—"ডাক্তার হাঁটতে পারবেনা। ঘোড়া ছাড়া চলতে ওর কষ্ট হবে। তা ছাড়া দেখে এলাম হাসপাতাল-ভর্তি রুগী। ওর যাওয়া হবেনা।"

বিক্রম বললে—"চমৎকার লোক আমাদের ডাক্তারসাহেব।"

গোপী বললে—"তার কারণ, লোক্‌টা শুধু যে মদ খায় তাই নয়, মদ খাওয়াতে জানে।"

আমায় লক্ষ্য করে বিক্রম বললো—"কিন্তু অত চেয়ে-চেয়ে দেখছেন কী?"

গোপী হাসতে লাগলো। "সিন্‌হা পালিয়েছে তাই তো! ওরা যাবেই। পাহাড়ের জলের ধারার মতো ওরা দুর্বার বেগে বয়ে যাবে ওদের নির্দিষ্ট সমতলে। আপনি রোধ করবেন?"

"রোধ করতে চাইনা আমি, গোপী, রোধ করার কথা নয়। এখানে আমরা এসেছি; আমাদের বিশেষ একটা দায়িত্ব রয়েছে। সে-দায়িত্বের সঙ্গে শৃঙ্খলার যোগাযোগ নিবিড়। মনে করো, নয়া-দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে লনে বসে সেই সন্ধ্যা। কত আশা ভরসা নিয়ে নেহেরু আমাদের পাঠালেন। তারপরে

এখানে এসে যে-স্মৃতি রেখে যাবো তা এরা পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে গান গেয়ে শোনাবে। জান তো, পালে-পার্বণে, মেলায় ওরা গান গায়—"

"হ্যাঁ, সেদিন আপনি গ্যাঙের কাজের মাঝে হঠাৎ শাবল ছেড়ে দিয়ে একটা পাহাড়ী ছেলেকে ধরে গান শুনছিলেন। ছেলেটার সঙ্গে একটা বিরাট কুকুর ছিলো। আচ্ছা, ঐ দেশী পালতু কুকুরগুলোর গলায় একটা কাঁটাওলা ইঞ্চি-ছয়েক টিনের পাতের গলাবন্ধ থাকে কেন?"

আমরা এখন পাহাড় ধরে নামছি। সিন্‌হাদের সঙ্গে চলতে হবে।

"হোলো তবে বাজেশাল যাওয়া—" বললে গোপী।

"হবে, হবে। আজ বাজেশাল যাবোই।···কুকুরের গলাবন্ধ কেন থাকে জানোনা? ঐ কুকুরগুলোই এদের ভেড়া-ছাগলের তত্ত্বাবধায়ক। রাতে নেকড়ে এসে হঠাৎ যখন আক্রমণ করে তখন ওদের ঘাড়ে কামড়াবার চেষ্টা করে। তখন ঐ লোহার বর্মই কুকুরগুলোকে বাঁচায়।"

"কী গান গাইছিলো?" বিক্রম জিজ্ঞাসা করে।

গলায় ঝোলানো থলেটার মধ্য থেকে ছোট্ট খাতাখানা বার করে গান শোনালাম—

" 'কেলুর গাছে নতুন পাতা
তলায় তলায় ঘাস;
তেমাথা পাহাড়টার মাথায় মহাদেবের জটা;
গঙ্গামাঈ বেরুবে জটা থেকে,
গঙ্গামাঈ বেরুবে, গঙ্গামাঈ।
বলো সবে হর হর!
গঙ্গামাঈর জয়-জয়কার!
পাহাড়ী পান্থশালায়
রস বিলোচ্ছে খুব।
শহর থেকে কালো-জুতোপরা বাবু এসেছে।
সিপাহী এসেছে জর্মানির লড়াই জিতে।
খাকী গরম কোট আর
মাথা-ঢাকা তেরচা টুপী,
উঁচু উঁচু জুতো।
গায়ের গন্ধে তামাকের নেশা
বিলিতী সিগারেট থেকে ধোঁয়া বেরোয়।

ওরা রস খাচ্ছে আর নাচছে,
ব্যাগীর মেয়েরা সাবধান।
জর্মানি জেতা সিপাহী এসেছে
ধরলে ছাড়বেনা।
নতুন নতুন নাচ শেখাবে,
আর শীতের দিনে বাচ্চা হবে।
তার বাপের নাম তোমরা দিও।
শিবের মাথার জটা থেকে গঙ্গামাঈর ধারা,
কোথা থেকে নেমে যাচ্ছে কে জানে।
তিনমাথা ঐ পাহাড়টার পথ কোথায় কে জানে।
কেন্দুর বনে নতুন পাতা
ঘাসের বিছানার নীচে কতো পোকা
ওরা সব বিলিতী পোকা
জর্মানির পোকা ; লড়াই জিতে এসেছে
হর হর গঙ্গামাঈ, গঙ্গামাঈর জয়।'

আর একটা শোনো।—

'তশীলদারের নাতির বিয়ে
গমের ক্ষেতে পোকা লেগেছে ;
ভুট্টার থলি ইঁদুরে খেয়েছে ;
গাইয়ের বাঁটে ঘা হয়েছে ;
গম দেবে কে, ঘি দেবে কে ?
শহর থেকে নাচউলী এসেছে ;
গ্যাসের বাতির ধমকে সব আঁধার পালিয়েছে।
গ্যাসের গন্ধে মেয়েরা সব ঘেমে উঠেছে।
আঁধার পালিয়েছে আর পোকার ভীড় হয়েছে।
বেণী দুলিয়ে ওড়না উড়িয়ে মেয়েরা নাচছে,
পোকারা সব পুড়ছে।
তশীলদারের নাতির বিয়ে
শহর থেকে বিলিতী বাজনা এসেছে
ট্যাম-ট্যাম-ট্যাম বাজনা এসেছে।
গম দেবেনা, ঘি দেবেনা,
তাই তোমার ক্ষেতের মাপ কমে গেছে
তোমার গাই বাছুর চুরি গিয়েছে।

এখন তোমরা বিয়েতে পেট ভরে খাও,
শীতের দিনে লাল পাতা শুকনো খাবে,
বাজরা আর ভুট্টা দিয়ে ;
তখন মনে কোরো,
তশীলদারের নাতির বিয়ে—
কাঁচি-সিগারেট আর কেরোসিনের গ্যাস।
নীচে থেকে গাই-বলদের শুকনো নিশ্বাস ;
শুনতে যেন গ্যাসের হিস্‌হিস্ শব্দ।' "

"আপনি এসব সংগ্রহ করেছেন ? অনুবাদ করলেন কি করে ?"

"পুরো পারিনি। ও ওর ভাষায় বলছিলো। হিন্দী কোনোমতে ব'লে যাচ্ছিলো। আমি পাদপূরণ করে লিখে গেছি। এমনি করে একদিন ওরা গাইবে—'শহর থেকে ছেলের দল পথ করতে এসেছে। গাঁয়ের মেয়ে সাবধান।' —কী সাংঘাতিক পুরস্কার পাবো এই পরিশ্রমের !"

সিন্‌হারা আমাদের দেখতে পেয়েছে। নমস্কার করলো।

"আপনারা কোথায় চলেছেন ?"

হেসে বললাম—"একা একা বেড়াতে বেরুলেন। ভাবলাম আমরাও যাই আপনাদের সঙ্গে। কোথায় যাচ্ছেন ?"

"নীচের গাঁ-টায়।"

"আমাদের বাদ দিয়ে একা-একা গাঁয়ের আনন্দ পেতে চললেন ?"

"ভাবলাম আপনার কত কাজ।"

ও-কথা আর আলোচনা করলাম না। নেমে যাচ্ছিলাম দ্রুত। পাহাড়ী বর্ষার জল যে পথ রচনা করে নেমে যায় তার ওপর ছোটো-বড়ো নানা আকারের গোল গোল পাথর ছড়ানো। একটু অসাবধান হলেই পা হড়কাবে, মচকাবে। লাফিয়ে লাফিয়ে নামছি। মাঝরাস্তায় একটা ছোট্ট ঘর, একটা ঝরনা। আঁজলা ভরে ভরে জল খেলাম। এদিকটায় জঙ্গল নেই। মাঝে মাঝে গাছ আছে বটে। অন্যত্র হলে জঙ্গল বলা চলে। খাদরালার প্রচ্ছদপটে মোটেই জঙ্গল নয়। নীচেই ক্ষেত আরম্ভ। কেয়ারি-করা ক্ষেত ; ক্ষেতের পর ক্ষেত। ক্রমাগত নেমে গেছে। মাঝে কয়েকখানা বাড়ী পেলাম। সেই কাঠের বাড়ীর ওপর শ্লেট-পাথরের টালি। ভেতরে বিশেষ লোকজন নেই। বারান্দায় শিশুর দল খেলা থামিয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে আছে।

মাথায় টুপী, গায়ে উনের জামা। তলায় কিছু নেই। খুব ফরসা রং, কিন্তু ধুলো, মাটি, নোংরায় আচ্ছন্ন, ক্লিন্ন। মাছি-ঢাকা বর্ফি-সন্দেশের মতো মিষ্টতা, শুভ্রতা আর নোংরামির আধার। পথ বলতে কিছু নেই। সেই জল বয়ে যাবার ঢাল্‌টা। নর্দমাও তাই, পথও তাই। গোবর, নোংরা, খড় স্তূপ হয়ে আছে পথে। পা দিলে বসে যায়। গন্ধে প্রাণ অস্থির। গরু ছাগল সব চরতে গেছে। পুরুষ-মেয়েরা গেছে কাঠ কুড়ুতে, দূর গাঁয়ে কাজ করতে। শূন্য পড়ে আছে বাড়ী ক'খানা। এগিয়ে চলতে লাগলাম।

ইচ্ছে করেই সিন্‌হাকে নিয়ে একটা পাশে চলছিলাম, আর-সবার থেকে পৃথক হয়ে।

"আপনি কথা দিয়েছিলেন না-ব'লে গাঁয়ের দিকে যাবেন না।"

"আমি বলেছিলাম ঠিক, পরে ভেবে দেখলাম আমি স্কুলের ছাত্র নই যে পদে পদে গুরুমশায়ের কথা শুনবো।"

"ক্যাম্পের শান্তিভঙ্গকারী বটে, তাই নির্দেশ মানতে হবে বৈকি!"

"আপনি তো নন্‌-ই, আপনাদের ঐ আস্থানারও সাধ্য নেই আমায় শাসন করে। আমি ঢের-ঢের ক্যাম্প দেখেছি। নিজেই সুলতানপুরে ক্যাম্প করেছি। এ কী ক্যাম্প? এ তো তফ্‌রীর ব্যবস্থা।"

মেজাজ ঠিক রাখা দায় হয়ে উঠছিল। আমি বললাম—"আপনি কোথায় কোন্‌ ক্যাম্প করেছেন খোঁজ রাখিনা। কিভাবে সে-ক্যাম্প চলতো জানিনা। এ ক্যাম্পের নিয়ম ভাঙার অধিকার কারুর নেই। আপনার কথার খেলাপ করে আপনি অন্যায় করেছেন।"

"আমি স্বীকার করিনা।"

"যায়-আসেনা কিছু। অন্যায়ের প্রতিকার শাস্তি নয়। যে অন্যায় করে তাকে জানিয়ে দেওয়া যে প্রতিবাদকে সে রোধ করতে পারেনি। যত জোরেই আপনি অস্বীকার করবেন, সত্যকার অন্যায়বোধ তত নিবিড় হয়ে আপনার প্রাণে বিঁধবে। এই নীতি।"

"রাখুন আপনার নীতি। আমি গ্রাহ্য করিনা আপনার নীতিকে।"

"আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে, গ্রামের ভেতরে গিয়ে ভদ্রভাবে আচরণ করবেন।"

ও তা পারেনি। প্রথম বাড়ীটা থেকেই যে বেরুলো, সে একটি মেয়ে।

"তোর নাম কী রে?"

সপ্রশ্ন সভীত চাহনি। উত্তর দেয়না।

"উত্তর দে-না। ভয় পাবার কী আছে। আমাদের দেশে কি মেয়ে নেই? তোদের গাঁয়ে এসেছি—বসতে বল্, খেতে দে, খাতির কর্; তা নয়, হাঁ করে চেয়ে রইলি।"

অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে জমা হয়েছিলো।

আমি একটা ছেলের মাথাটা নেড়ে, পকেট থেকে একটা টফী বার করে দিলাম।

প্রথমটায় খেতে চাইলঁনা। তারপর খেয়ে আবার চাইতেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এক এক করে এ-বাড়ী, ও-বাড়ীর সব ছেলে-মেয়ে উঁকি মারছে। খড় আর গমের তুষের গন্ধ। এর মধ্যে কি-একটা গাছের ছাল দিয়ে ঠোঁট রং করার কথা শুনে গোপী তাই করতে গেছে, ঠোঁটের জ্বালায় অস্থির। আখরোট-গাছের ছাল। বেচারী গোপী!

সিন্‌হার চোখে কী যেন আছে। মেয়েরা পালায়। "আরে, কথাই বল্‌না। তোর নাম টীকা। এসব নাম কেন? আমাদের দেশের নাম কতো সুন্দর—জান্‌কী, শকুন্তলা, যমুনা, গঙ্গা, কুসুম। তোদের সব যত বিদ্‌ঘুটে নাম। মনও তাই বিদ্‌ঘুটে। হাসিতে যেন মাশুল লাগে।"

আমি বললাম—"আচ্ছা সিন্‌হা, কথাটাও কি ভদ্রভাবে কইতে জানোনা?"

"আরে, এরা হোলো ফাল্‌তু মেয়ে। এক-একজনার তিনটে-চারটে স্বামী। এদের সঙ্গে আবার ভদ্র কথা!"

ওর অসভ্যতা দেখে বিক্রম হেসে ফেললে।

সেই হাসিকে সমর্থন ভেবে ও আমায় দলে ক্ষীণ ভেবে পরিহাস করে বললে—"আচ্ছা মাস্টারের পাল্লায় পড়া গেছে তো!"

আমি জোর গলায় এক ধমক দিয়ে বললাম—"সাবধান, সিন্‌হা। বড্ড বেশীদূর এগুচ্ছো। এই মুহূর্তে এখানেই তুমি বসে পড়ো। যতক্ষণ না আমি আমার কাজ সারি, নড়বেনা।"

"আমি শুনবনা।"

"তুমি শুনবে। বোসো, সিন্‌হা। নৈলে তোমায় সবার সামনে আমি মার লাগাবো। বোসো।"

একটু থমকে গেল। "আপনি মার লাগাবেন কোন্ অধিকারে ?"

"যে অধিকারে বাগান থেকে ষাঁড় তাড়াই। বোসো।"

"কিন্তু মিস্টার—"

"তুমি বসোনি এখনও, সিন্‌হা। বোসো। আমি বলছি—বোসো।"

বিক্রম এসে সিন্‌হার হাত ধরে টানলো। "বসুন-না, সিন্‌হাজী।"

এতক্ষণে সিন্‌হার সব শক্তি লোপ পেয়েছে। ও আখরোট-গাছের তলায় বসে পড়েছে।

আমি সতীশ সিন্‌হাকে বললাম—"তুমি থাকবে। যেন ও এ-জায়গা না ছাড়ে। সাহস করবেনা। কিন্তু যদি করে, আমায় ডাকবে।"

*

"তুস্‌সীরামের বাড়ী কোন্‌টা ?"

মেয়েটি গোয়াল থেকে গরু বার করে বিচালি মেখে দিচ্ছিলো।

"এই পাশের বাড়ী।"

"পাশের বাড়ীতে তো একটি বৌ বসে আছে।"

"তুস্‌সীরামের বৌ। তুস্‌সীরাম তো বাড়ী নেই।"

বৌকে লক্ষ্য করেই বললাম—"কোথায় তুস্‌সীরাম ? আমায় নেমন্তন্ন করেছে খাবো ব'লে। খাওয়াও। এই নাও ঘি, চিনি, চা আর নুন। নাও, আটা মাখো।"

পাশের বাড়ীতে একটি পুরুষ। সে আর তার সতীন (?) বসে বসে একটা বিরাট বনবিড়ালের চামড়া পরিষ্কার করছে। তাদের স্ত্রী যাঁতায় গম পিষছে। বারান্দায় ছেলেটা অপকর্ম করছে। খানিকটা গমের ভুষি দিয়ে রগ্‌ড়ে ছেলেটার শৌচকর্ম করে দিল। তারপর আবার খানিকটা ভুষি ঢেকে বিষ্ঠাটুকু পা দিয়ে রগ্‌ড়ে বারান্দার নীচে ফেলে দিতেই গৃহপালিত মুরগী এবং কুকুর তৎক্ষণাৎ সবটা পরিষ্কার করে দিল।

নোংরামির চরম।

"এর মধ্যে খাবেন আপনি !" বিভ্রান্ত গোপী জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ, খাবো। তুস্‌সীরামের বাড়ী আমায় খেতে হবে।"

বিরাট একটা বোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে তুস্‌সীরাম হাজির। পিছনে পিছনে ছেলে দত্তু। বয়স বারো হবে। তার মাথায়ও একটা বোঝা।

আমায় দেখে তুস্‌সীরাম অস্থির।

বোঝাটা কোনওমতে ফেলে দিয়ে বললে—"সেকি, তুমি কেন? চলে যাও, চলে যাও। আমার না আছে বসতে দেবার জায়গা, না আছে খেতে দেবার বাসন। না না, যাও তুমি। খেতে পারবোনা দিতে।"

বলছে বটে। তবু মুখে হাসিটি লেগে আছে যার অভাবে সমস্ত চীনবাসীর মুখের চেহারা একধরনেরই বোধ হয়।

তুস্‌সীরাম ওপরে বারান্দা থেকে কথা বলছে। সে বসে পড়েছে। তার বৌ তাকে তার হুঁকোটা এগিয়ে দিয়েছে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে তুস্‌সীরাম হুঁকো টানছে। নির্লিপ্তকণ্ঠে বলছে—"না না বাপু, কিছু হবেনা। আমি খাওয়াতে পারবোনা। তুমি চলে যাও।"

ওর বৌ এসে কী যেন বললো।

"তা হোক্‌। চা চিনি দিলেই খেতে দিতে পারবোনা। না না বাবু, তোমরা আমায় বিরক্ত কোরোনা। আমি বাপু খেতে-টেতে দিতে পারবোনা।"

ওর বৌ বা যত হাসে, আমরাও তত হাসি। ওর কিন্তু মুখে সেই চিরকিশোর হাসিটি লেগে। মাঝে মাঝে চোখে আর গালের পুরু ভাঁজে রং লাগছিল। যাকে বলে 'সরমে মরে যাওয়া, মরমে মরে যাওয়া'। কী গভীর লজ্জা! দরিদ্র সে, নগণ্য! এদের খেতে দেবে কি করে। এ প্রস্তাবই ওর কাছে পরম লজ্জার বস্তু। সেই লজ্জার হাত থেকে ওকে নিষ্কৃতি দাও হে দয়াময়! ওর বৌ ততটা ঘাবড়ায়নি। বেচারী উনুনে কাঠ ফেলে দিয়ে জল চড়ালো।

আমরা সামনের উঠানটুকুতে বসে গালগল্প করছি আর এদের জীবন-যাত্রা দেখছি। খুব কম কথা বলে এরা। পল্লী তাই শান্ত। হয়তো প্রাকৃতিক পরিবেশের দান। গম্ভীর, বিরাট পাহাড়ের সমাহিত কোলে এরা অরণ্যচারী। শব্দ করলে এই মহামৌনের বিঘ্ন ঘটবে। তাই স্তব্ধতা এদের প্রিয়, এদের অভ্যাস।

সামনে জটলা করছে ছেলের দল, মেয়ের দল। সেই জামা আর টুপী, বাকী উলঙ্গ। এতো স্বাস্থ্য, এতো বর্ণ যে সহরের পথে এদের উপযুক্ত সাজসজ্জায় ছেড়ে দিলে Tennyson-এর *Beggar Maid* জীবন্ত হয়ে ওঠে। সার্থক ও

অসার্থক জীবনের মাঝে অন্তরায় কি কয়েক গজ কাপড় আর কয়েক তোলা ধাতু? এদের শিক্ষা দিলে এরাই কি ভারতের অহঙ্কার, দেশের দর্প হয়ে উঠবেনা?

"তোকে যেন কোথায় দেখেছি রে, চেনা মুখ!"

ছোট্ট মেয়েটা ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে মুখ লুকোলো পাশের ছেলেটার কাঁধে।

গোপী বললে—"তুই তো কল্হন্ না? আরে, খাদরালার গায়ের জঙ্গলে রোজ দুপুরে ছাগল ভেড়া নিয়ে বসে থাকে।"

বিক্রম বললে—"আজকাল তো পড়ে। পড়িস্না?"

দুটো ছেলে বললে—"আমরাও তো পড়ি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ; তোরাও যাস্ বটে। কতদূর পড়েছিস্?"

তুস্‌সীরাম ফোড়ন কাটে ওপর থেকে: "পড়ে তো ভারী উপকার হবে! গাদা গাদা কাঠ কুড়ুতে হবে শীতের জন্য। আসবে কোত্থেকে শুনি? লেখাপড়া শিখে বাবুদের কাজ করতে যাবি তোরা তো, ক্ষেত-খামার করবে কে? এসব বাজে ভণ্ডামি।"

চামড়া-ছাড়ানোয় ব্যস্ত দুই স্বামী আর তাদের স্ত্রী হেসে ফেললো।

আমি বললাম বাচ্চাদের লক্ষ্য করে—"যাস্না তোরা পড়তে। কি হবে প'ড়ে?"

"না" "না" শব্দ চারিদিকে হইল অমনি। "আমরা পড়তে যাবো, যাবোই যাবো।"…"আমি অনেক পড়েছি"…"না, ও সবচেয়ে বেশী পড়েছে।…"

অদ্ভুত শক্তি মেয়েটার। নাম 'কেলু'। বয়স বছর নয় হবে। দেখতে দেখতে বর্ণপরিচয় থেকে নামতা সংযুক্তবর্ণ তো শিখেইছে, তরতর করে কবিতা ব'লে যাচ্ছে। প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে তাকিয়ে রইলো।

গোপী ওকে কোলে টেনে নিয়ে বললো—"পড়বে তুমি কেলু; নিশ্চয় পড়বে। এখান থেকে ভোট নিয়ে সিমলার দরবারে গিয়ে বক্তৃতা দেবে, তোমাদের দেশের কষ্ট দূর করবে।"

ওসব কেলু বোঝেনা, বোঝেনি। কিন্তু বিক্রমকে একটা বইয়ের লিস্ট দিলো ওকে পাঠিয়ে দিতে। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'জওহরলালজীর আত্মচরিত', 'রবিন হুড', 'আরব্য উপন্যাস', আরও চার-পাঁচখানা বই—নাম মনে নেই।

জানিনা বিক্রম পাঠিয়েছিল কিনা।

কিন্তু আমার থলে থেকে টফীগুলো তখন বিলুচ্ছে সিন্‌হা।

গরম গরম চা এসে গেল, আর পরেঠা। সঙ্গে চিনি। বাসী মাংস দিতে চাইলো, নিলাম না।

কিন্তু তুস্‌সীরাম লজ্জায় ঘেন্নায় মরে রইলো। একবারও নামলোনা। পুরুষ তো। ওর বাড়ী এসে আমাদেরই খাবার আমরা খেয়ে গেলাম, অপমান ওকে বড়োই বিঁধেছিলো।

চলে আসার আগে তুস্‌সীরামের বৌকে একটা পরম মূল্যবান জিনিস দিয়ে এলাম। দু'পাউণ্ড ভালো সৌখীন উন। আগে থেকে আনিয়ে রেখেছিলাম। ওকে দেবো ব'লেই। "একটা জামা তোমার, একটা তুস্‌সীরামের। আর এই একটা নতুন টুপী।" খাদরালা-হোটেলের দোকান থেকে নগদ সাতটাকায় কেনা। তুস্‌সীরামের বৌ আনন্দে উনগুলো বুকে চেপে ধরে কাঁদতে বসে গেলো।

এই অবসরে আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম। পাহাড়ে আসন্ন সন্ধ্যা। চারিধার গম্ভীর স্তব্ধ। পাখীদের কলরব চরমে উঠেছে। স্তব্ধতার মহামৌন ভেদ করে সেই কাকলীতে যদি কান দেওয়া যায়। নয়তো পাতার গোমরানির সঙ্গে মিশে যায় সেই কাকলী। তবু একটা সমগ্র স্তব্ধতাকে ছোঁয়া যায় এই কোলাহলকে অতিক্রম করে। ওপরে উঠতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠি। ওদিকে গোধূলি অবসান। গাভীদল ফিরছে গ্রামে। একটিই পথ; তাও উপল-কণ্টকিত। বারবার গাভী-স্রোতকে পাশ দিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। বেশ বুঝছি, আসার পথে যে-পথে এসেছি এটা তার চেয়েও খাড়াই পথ। অন্য পথ। ঘুরছিও খুব। আমি ক্ষণে ক্ষণে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছি। ক'দিন বিনা বিশ্রামে ও অনবরত পরিশ্রমে দেহ দুর্বল। এখানে এসে আমি রোগাই হয়ে গেছি। তার ওপর এই খাড়াই। পারছিনা। ওরা তো বারবার এগিয়ে যাচ্ছে। যৌবন ওদের। আমি ঐ পূর্ণ-যৌবনের অধিকারী নই। বেগে চলতে পারিনা।

অন্ধকার হয়ে আসে। পাহাড়ে যখন নামে, অন্ধকার নামে ঝুপ্ করে তিনধারে খাড়া পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল। দু'ধারে গভীর কালো জঙ্গল, একটা ধারে হাল্‌কা বন। সূর্য নেমে গেছে খাদরালা-পাহাড়ের ওপারে। তাই এপারটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। আষাঢ়ী কৃষ্ণা নবমী। চাঁদ উঠবে

অনেক দেরীতে। অন্ধকারের সঙ্গে বনপথে কারবার যেন আমার বিধিলিপি। এ পাহাড়টার গায়ে আবার একটা ভীষণ কাঁটা-জঙ্গল। ওরা আমার শ্লথ গতির সম্মান রেখে অনেকবারই দাঁড়িয়ে থেমে চলছিল। কিন্তু কখন ওরা যে ওদের স্বধর্মবেগে চলে গেছে—আমি পড়েছি পিছিয়ে আমি জানিনা।

অন্ধকার। চেঁচিয়ে ডাকি—"বিক্রম,—গোপী ?"—ওপর থেকে উত্তর ভেসে আসে—"আসুন।" এদিক থেকে উত্তর এলো 'আসুন', ওদিক থেকে উত্তর এলো 'আসুন'। একটা ধার থেকে আসেনা। মনে মনে শঙ্কা হোলো আমরা সবাই-বা নিজের নিজের পথে চলে গেছি। পথ সঙ্কীর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, অন্ধকার। যদি ভুল হয়ে যায়, পা পথে না প'ড়ে কোথায় যে গিয়ে পড়বো জানা নেই। মনে হোলো আমার দায়িত্বের কথা। যদি এদের মধ্যে কেউ অসাবধানতা বশতঃ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে, তখন কোন্ মুখে ফিরবো? অন্ধকার গভীরতর। চারিধারের বনানী স্তব্ধ। বাতাসের শব্দ শোনা যায়। পাইনের-ছুঁচগুলির মধ্য দিয়ে করুণ বিলাপ তুলে, নিপীড়িত চিত্তদাহ তুলে—বয়ে যাচ্ছে পর্বত হতে পর্বতান্তরে, দূর হতে দূরে। চারিধারের উত্তুঙ্গ পর্বত-শিখররাজির মধ্যস্থলে এই বিরাট ভাণ্ডটির জঠরে কেবল বন আর বন। ভাণ্ডের তলায় গোটাকয় কুটীর। আর এর গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নামহীন, রাজ্যহীন ক'টি মানবক—যারা যে-কোনো মুহূর্তে চিরদিনের মতো হারিয়ে যেতে পারে এই বনদৈত্যের পাকস্থলীতে।

এখানে দাঁড়িয়ে মনে করতে কেমন লাগে এখন চৌরঙ্গীর মাথায় লাল বিজলীতে জ্বলছে-নিভছে 'Player's Cigarettes', মেট্রোর তলায় আলোয় আলো, ভিক্টোরিয়া-টার্মিনাসে বুক্-স্টলে রাশি রাশি বইয়ের ভীড়, ম্যান্হাটানের রাজপথে বিরাট বিরাট বাস্‌গুলো ভূতে-পাওয়া নাতবৌয়ের মতো ছুটোছুটি করছে; এখানে বসে কেমন লাগে ভাবতে এইসময়টায় তাজ-হোটেলে কতো ভীড়, এলীটের সীটে বসে দম্পতী দেখছে 'রিয়ুনিয়ন্ ইন্ ভিয়েনা'। 'Army and Navy'-তে ঢুকে কাপ্তেন অরোরার কিছুতেই টাই পছন্দ হোচ্ছেনা; কক্‌টেলটা সুস্বাদু হয়নি ব'লে শ্রীমান্ পুষ্পবেকর বোঝাচ্ছেন মিসেস্ জুৎসীকে—মিস্ গ্রোভার হ'লে কক্‌টেলটায় ক'ফোঁটা ভারমুথ বেশী দিতেন।

সেই জীবন এই পরিবেশে এই মুহূর্তে কতো ব্যর্থ, বিস্বাদ, এনাক্রনিস্টিক্। এখানে রেডিও, মবিল-অয়েলের লাল ঘোড়া, 'লণ্ডন টাইম্‌স্' আর মাও-সী-তুঙ্

কেনোটারই প্রয়োজনীয়তা নেই। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে এ-চিন্তায় কেউ বিনিদ্র রজনী যাপন করেনা; দু'শো বছর পরে একটা ধূমকেতু ক'টা ক'মিনিটে দেখা দেবে একথা নিয়ে মাতব্বরি কেউ দেখায়না; ক্রমবিবর্ধমান মনুষ্যসংখ্যার সঙ্গে শস্য-উৎপাদন তাল না রাখতে পারায় উৎকণ্ঠায় শ্বাসরোধ হচ্ছেনা একটুও; কাশ্মীরের উপর জাফরুল্লা নতুন কোন্ বক্তৃতা-বম্ হাঁকড়ালেন এ-ভাবনা নেই কারো। এখানে জীবনছন্দ কি বাঁধা পড়েছে ঐ তুষারধবল গিরিচূড়ার মতো একবারই, আর তা বদলাবেও একবারই? এখানে জীবনধারা কি পার্বত্য নির্ঝরিণীর মতোই ঝিরিঝিরি বইবে তলা থেকে চুইয়ে, জলপ্রপাত রচনা করবেনা? এখানে জীবনগীতি কি পাইনের ছন্দে চিরকালই একই গান গাইবে বিরহশ্বাসভরা সুরে, আর কিছু নয়? এদেশে আবর্তন, বিবর্তন, কোনো-কিছুই স্পর্শ করবেনা? চিরন্তনের দেশে, মহামৌনের দেশে এদের জীবন আর আমাদের জীবনের মাঝে এক অনন্ত জিজ্ঞাসা।

আর পারিনা যেন চলতে। বসার জায়গাও নেই। শোবার তো নেই-ই। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। হাতে লাঠি নেই যে ভর দেবো। বসার স্থান নেই বসবো। দাঁড়াবার সময় নেই দাঁড়াবো। সে এক চরম মুহূর্ত। ডাক দিয়েও আর সাড়া পাইনা কারো। নীরন্ধ্র অন্ধকার। সেই যেন "রজনী যামিনী তমী"। চোখ ফেটে জল এসে গেল এমনই প্রাণান্তকর যন্ত্রণা দেহে মনে। হায় হায়, বসতে জায়গা নেই এ কোথায় এলাম!

ডাকলাম। প্রাণপণ চিৎকার করে ডাকলাম। সাড়া এলো বিক্রমের: "উঠে আসুন, পথ পেয়ে গেছি। আমরা অপেক্ষা করছি।"

সত্যিই ওরা পথ পেয়েছে তখন। আমি পৌঁছুতেই ওরা এগুতে লাগলো। আমি একটা চওড়া পাথর পেয়ে সোজা শুয়ে পড়লাম, নৈলে মরে যাবো।

গোপী বললে—"শুয়ে পড়লেন স্যর?"

"না-শুয়ে পারবোনা, গোপী। মরে যাবো।" এইটুকু ব'লেই একেবারে অতলে তলিয়ে গেলাম। গায়ের ঘাম শুকুতে লাগলো। কলিজার মেল-ট্রেনটা ডিস্ট্যাণ্ট-সিগ্ন্যাল পেরিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি এসে গেছে টের পেলাম।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানিনা। কানে ভেসে আসছে কথা। আমি তখনও শুয়ে। এ কার কণ্ঠস্বর? গোপী ও বিক্রমের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমি পরিচিত।

সুরেশ আর সুরেন্দ্র সিন্‌হার ইংরাজী বলার দৌড়ও আমার অজানা নয়। এ কে ইংরাজী বলে? কে এ?

অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায়না। আমার চোখ আকাশের পানে। চিত হয়ে শুয়ে আছি পাথরের চাতালে। এদিক ওদিক নড়বারও ইচ্ছা নেই। তারই মধ্যে কানে ভেসে আসছে চমৎকার মার্জিতরুচিসম্পন্ন, পরিচ্ছন্ন ইংরাজী ভাষায় একেবারে ইংরাজী ধ্বনি উচ্চারণ। সবটা ধরতে পারছিনা। কিন্তু একটা আলোচনা চলছে।

শুনছি: "হ্যাঁ, এখানেই আছেন। বড্ড পরিশ্রান্ত তাই শুয়ে পড়েছেন।"

"এটা বড়ো ঘোরা পথ। আহা-হা কত কষ্ট পেয়েছেন।"

"আমার প্রশ্নের উত্তর আপনি দেননি।" গোপীর গলা।

"আপনারাও তো আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি।"

"কী খান্ তবে, এমনি থাকার মানে কী?"

"সেসব হবে। দেখি আপনাদের বন্ধু কোথায়..."

ওরা এগিয়ে আসছে। জানছি তবু নড়ছিনা; নড়তে ইচ্ছা নেই। দাঁড়ালো চারজন নয়, পাঁচজন। পঞ্চম ব্যক্তি মুণ্ডিতমস্তক, দিগম্বর। চম্‌কে উঠে বসলাম।

দিগম্বর মূর্তি বললেন— "না না, শুয়ে থাকুন। আপনি বড়ো পরিশ্রান্ত। আমি বসছি পাশে।" কী নির্মল ইংরাজী ভাষা! কী কোমল কণ্ঠস্বর!

ওঁর ভাষা আর স্বরে আমি একেবারে আবিষ্ট হয়ে গেলাম যেন। আমি বললাম—"ওঁ ব্রহ্মণে নমো নমো ব্রহ্মচারিণে নমো দিগম্বরায় পরমকৈবল্যস্বরূপায় নমঃ।"

দিগম্বর মূর্তি উত্তর দিলেন—"ওঁ নমো ব্রাহ্মণায়, নমো গৃহিণে গৃহপতয়ে, নমো সাগ্নিকায় যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ।"

উঠে বসতে হোলো।

ওরা চারজন তটস্থ হয়ে বসলো।

মন ব'লে উঠলো: 'এতদিনে পেলি খাদরালা-জঙ্গলের অন্তস্তল, নাগিনী দেরালার মাথার মণিখণ্ডটি।'

"আপনি ব্রহ্মচারী? ইংরাজী শিখলেন কোথা হতে? কৌতূহল অসামান্য। নয় অল্প। শালীনতা করি এমন ধৈর্য নেই। অসহিষ্ণু চিত্তকে ক্ষমা করে

কৌতূহল চরিতার্থ করতে আপত্তি না থাকলে, আমার ভিক্ষা, আমায় আপনি কিছু বলুন।"

"আপনি যা জিজ্ঞাসা করবেন সবই বলবো। আপনার কথা লোকমুখে শুনে অবধি আমি চাইছিলাম আপনাকে দেখি।"

"তাই বুঝি পথ হারালাম ?" বলে সুরেন্দ্র সিন্‌হা।

ব্রহ্মচারী বলেন হেসে—"বিচিত্র কি! এমনও হয়। মন যদি ডাকে, আসবার কথা যাঁর তিনি আসেন। মনের এ ক্ষমতা গ্রাহ্য।"

"আমার বড়োই জানতে বাসনা আপনি এতো সুন্দর ইংরাজী শিখলেন কোত্থেকে। আপনার বয়স তো কোনোমতেই বাইশের বেশী নয়। এর মধ্যে আপনার বৈরাগ্য হোলো কবে, কিভাবে হোলো; কোন্ অসাধ্য-সাধনের আশায় এই অরণ্যবাস আপনার ?"

"বুঝেছি আমার পূর্বাশ্রম জানতে চান। বেশ, বলবো। আমি গুরুহীন সন্ন্যাসী। আমার বলতে বাধা নেই। পরিব্রাজক আমি, কেবল এখানে বছর তিনেক হতে স্থাণু হয়ে গেছি। মনে মনে ঠিক করেছি আমার গুরু-সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত স্থানত্যাগ করবোনা। পরম রমণীয় এই খাদরালা। নিকটেই একটি গুহার মধ্যে থাকি। লোকচক্ষুর অগোচরে। দিবারাত্র কেউই কখনও বিরক্ত করেনা। সাধনের পক্ষে অপূর্ব স্থান।...

"আমি বাল্যকালে শুনেছি আমার পিতা সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। আমার মা তপস্যা করে পিতাকে ফিরিয়ে আনেন। বাড়ীর ঠিকানা বলবোনা, তবে রামপুর-বুশায়রে। সেখানে আমার জন্মের পর আমার বাবা আমায় দেবতাকে দিয়ে দেন। মাতৃস্তন্যপানের বয়সের পর আমায় এক পাদরীসাহে নিয়ে যান। কিন্তু মা বাবা উভয়েই আমাকে দেখে যেতেন। পাহাড়ে কোলে এমনি করে আমার আটবৎসর কেটে যায়। তারপর লক্ষ্ণৌতে গি পড়াশুনা করি এবং ক্রীশ্চান কলেজে পাঠ সমাপন করি। এইসময়ে মহাত্ম যীশুর জীবনী আমায় অভিভূত করে ফেলে। সেণ্ট্ সাইমন্ এবং সেণ্ট্ পলে কথায় আমার বাসনা হয় অমনি করেই আমি হরি পাবো, আমার আত্মদর্শ হবে। কিন্তু আমার মা আমায় ছাড়তে পারেন না। প্রায়ই এসে দেখ করেন লক্ষ্ণৌতে।

"আমার মাথা-খারাপ হয়েছে এই ধারণায় পাদরী আমায় আম

পিতামাতার কাছে পাঠাবার অল্প পরেই মারা যান। তখন আমার মনে তীব্র বৈরাগ্য হয় এবং আমি একদিন উন্মাদের মতো গৃহত্যাগ করি। কিন্তু মাস পাঁচেক পরে আমায় আবার মার কাছে ফিরতে হয়। মাতাপুত্রে বহু অশ্রু বর্ষণ করি ; বহু রজনী প্রভাত হয়ে গেছে মাতাপুত্রের অশ্রুস্নাত মুহূর্তগুলিকে অতিক্রম করে। পিতা সর্বদা নির্বিকার। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁর স্থিরা ভক্তি, অচলা নিষ্ঠা। উৎসর্গীকৃত পুত্রের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব তিনি করেননি। কাজেই তাঁর সেই দৃঢ়চিত্ততা আমায় শক্তি যোগাতো। এবার যখন গৃহত্যাগ করি তখন মাকে ব'লে আসি—'আর ফিরবোনা'—এবং মার অনুমতি পাই। মা ব'লে দেন—'হরিমন্ত্র তোমার মন্ত্র।' সেই হরিনাম জপি।"

"খান্ কী ? থাকেন কোথায় ?"

"থাকি গুহায়। একটু ধুনী আছে। শীতে কষ্ট নেই। উলঙ্গ হয়েছি কেন জানিনা। তবে মনে হয়, হতে পারলে এমন আরাম কিছুতেই নেই। প্রকৃতির মধ্যে যে কতো বিচিত্র বর্ণ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ আছে তা প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে না গেলে বোঝা যায়না। দেহ-মন এতো পরিষ্কার আর কিছুতে থাকেনা। লজ্জা ? এখন লজ্জা করে কাপড় পরতে। কাপড়ের মতো এমন একটা মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষ কি করে নিজেকে সভ্য বলেছে ভাবতেও আমার এখন হাসি পায়। নির্লজ্জ ছাড়া, কাপড় দিয়ে দেবদেহ আবৃত রাখার মতো সঙ্কীর্ণতাকে কেউ প্রশ্রয় দিতে পারেনা। বড়ো আরাম।"

এমন নিবিড় বিশ্বাস ও আস্থার সঙ্গে বক্তব্য বলছিলেন সন্ন্যাসী যে, অবিশ্বাস বা তর্কের অবকাশ ছিলনা। এই পরিবেশে সে-তর্কের কথা মনে আসেওনা।

"শীতগ্রীষ্মে বস্ত্র অপ্রয়োজনীয় উপসর্গ। অগ্নি, সূর্য, বায়ু, বরুণ ও পর্জন্য—এরা মানবের শীতোষ্ণজাত দুঃখ হতে পরিত্রাণ দেবার পক্ষে যথেষ্ট ব'লেই এরা যোগীর ইষ্ট, বেদে এদের স্তবস্তুতি আছে। খাই কী ? এইটাই আমার বিস্ময়। আমি গুহা থেকে বাহির হইনা। অথচ খাদ্য এসেই যায় গুহায়। কেউ-না-কেউ কিছু-না-কিছু দিয়ে যায়। ছোলা-ভাজা, মোমফালী, দুধ, যবের ছাতু কিছু-না-কিছু। বরফের দিনেও তাই। আমি অভুক্ত থেকেছি বটে, কিন্তু বুভুক্ষিত থাকিনি কখনও। আমার ধারণা যে, আমরা প্রয়োজনের

অতিরিক্ত খাই। অপরিমিত ভোজনই আমাদের দেহ-মনের দারিদ্র্যের কারণ।"

আমার মনে পড়ে গেল বেদান্তদর্শনের সূত্র—"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ" —একাগ্রতা-সাধনের স্থান-নির্ণয়-সংক্রান্ত কথা। শ্বেতাশ্বেতরের কথাটি না ব'লে পারিনি—"সমে শুচৌ শর্করবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ মনোনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করেন এবার—"আপনি যোগশাস্ত্রের কথা জানেন কী সূত্রে?"

"জিজ্ঞাসার তাড়নায়। অবিশ্বাসী অপ্রত্যয়ী গৃহীর মন। সুবিধাবাদ-পরিচালিত ভক্তিশ্রদ্ধার আড়ম্বর। তলে তলে আবার জিজ্ঞাসা থাকে। তাই মাঝে মাঝে শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। কিন্তু এতো কষ্ট কেন সহ্য করেন? কী পেলে আপনি তৃপ্ত হন?"

"আত্মজ্ঞান! অজপা সিদ্ধি!"

"অজপা? অজপার উৎপত্তি জানেন? জানেন—অজপা জপ না ক'রে জীব তার জীবনধারণ করতে পারেনা?"

সন্ন্যাসী গভীর আগ্রহে বললেন—"বলুন!"

আমি বলি—

" 'একবিংশতিসহস্রষট্‌শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহ প্রাণী শান্ত্রানন্দময়ীং পরাং॥
বিনা জপ্যেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী॥'

সাধ্য কি অজপা বাদ দিই? নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে জপ। একেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ সহকারে প্রাণায়াম-যোগে আয়ত্ত করার মধ্যেই ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু আমার প্রশ্ন তা নয়। আপনার মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটিয়ে সহস্রারে নিয়ে যাবার সার্থকতা কী? এর মধ্যে যে আনন্দ তা আপনার তত্ত্বানন্দ, না জিম্‌ন্যাস্টিক্, না আরও কিছু? এ আনন্দের রূপ কী, প্রয়োগ কী, অনুকল্প কী, উত্তরসাধনা কী?"

সন্ন্যাসী একটু বিভ্রান্ত যেন। জিজ্ঞাসা করেন—"এ প্রশ্ন তো করিনি নিজেকে কখনও। আমার অন্তরের তাগিদে আমি বেরিয়ে পড়েছি। শান্তি

পেয়েছি সেই অশান্ত জীবনকে ত্যাগ করে এসে। কিন্তু এরপরে কী, তা তো ভাবিনি। আপনার কথা আর একটু বলুন বুঝিয়ে। 'তত্ত্বমসি' এই মন্ত্রের সাধনই কি সর্বানন্দময় নয়?"

"'হ্যাঁ' কি 'না' বলার সাধ্য আমার নেই। কারণ আমার জীবনযাত্রা, অনুকল্প, আয়োজন, উত্তরসাধনা সবই তামসিক। 'অন্ধং তমং প্রবিশন্তি যোঽবিদ্যামুপাসতে'—এই অবিদ্যার অহংকারে আপ্লুত চিত্ত নিয়ে আমি কি করে বলবো অজপা হংস-মন্ত্র বা বিপরীত অজপা সোঽহং-মন্ত্র না তত্ত্বমসি-মন্ত্র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ? সে তো জানিনা। তবে শাস্ত্রপাঠে যা মস্তিষ্কে সঞ্চয় করেছি তা উদ্গার করতে পারি। যোগ এবং জ্ঞান দুটোই উপায়। 'দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব। যোগো বৃত্তিনিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণং।' —যোগবাশিষ্ঠের উক্তি। এ ছাড়াও অন্যত্র দেখি—আছে—'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতে হিতে রতাঃ'। অমন যে পতঞ্জল, যিনি ঈশ্বরপ্রণিধান যোগকে ভক্তির উপরে স্থান দিলেন, যিনি বললেন—'ক্লেশকর্মবিপাকা শয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ-ঈশ্বরঃ'—তিনিও বলেছেন শুনুন—'মৈত্রীকরুণা মুদিতা পেক্ষাণাম্ সুখদুঃখ-পুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্'। অর্থাৎ বোঝা যায় জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মূল কথা 'তত্ত্বমসি' 'তোমায়' নিয়ে না, 'সবা'কে নিয়ে। তুমিই 'সে', সেই 'তুমি' থেকে 'সবাই তুমি' এবং 'তুমি সবাই' কিনা। ক্যাথলিকের মা-মেরীর জন্য কাঁদতে চাও, ভাসতে চাও, ভাসাতে চাও,—না স্টোইকের কৌপীন ধারণ করে সাহারা-প্রান্তরে জীবন বিসর্জন করতে চাও? শ্রীচৈতন্য 'জীব' 'জীব' করে পাগল হলেন, সেই ভক্তিঘন মূর্তি চাও, না ভগবান কপিলের মতো সগর-বংশ-ধ্বংস-করা একক সিদ্ধি চাও? গীতায় স্পষ্ট বলা আছে 'সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বং চ ময়ি পশ্যতি',—বলা আছে—'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।' *Love thy neighbour as thyself*—এই মন্ত্রও একই ধ্বনিদ্যোতক। আমি তাই জানতে চাই—পথ না জেনে আপনি এই অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন কেন? যুবা সন্ন্যাসী গুহায় জীবন-সাধনা করে যদি চিদানন্দ লাভও করেন, কী লাভ জাগতিক জীবের, যাদের মধ্যে আনন্দময়ের বিকাশ? যাদের বাদ দিয়ে আনন্দময়ও আনন্দিত নন্। আপনি Christian Church-এ পুষ্ট, আপনার রক্ত বৈষ্ণব-রসধারায় স্নিগ্ধ, আপনার মন ও চিন্তা প্রেমে আর্দ্র, আপনি এসে পড়েছেন এই

নিরক্ষর, নির্জীব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে। আপনি যদি গুহায় বসে 'তত্ত্বমসি' না করে এদের সঙ্গে কাজ করেন, এদের মধ্যে ভগবৎ-করুণারস-প্রবাহ এনে দেন, সন্ন্যাসীঠাকুর, আমি ধ্রুব জানি আপনি দেখবেন তত্ত্বমসি আপনার হৃদয়-কন্দরে এসে আঘাত করে বলবে 'দরজা খোল্'।"

সন্ন্যাসী যেন স্থাণু। আমার চারজন সঙ্গী নির্বাক।

কেবল সেই বশাতীত গোপী তার চপল কণ্ঠে আর্তনাদ করলো—"পাক্কা চুরাঁদ্—প্রিন্সিপল্-সাব্। সারাজীবন কি কেবল ছাপানো পাতা জাবর কেটেছেন ?"

সন্ন্যাসী বলেন—"ঈশ্বর আপনাকে পথ ভুলিয়ে এখানে আমার কাছে এনে দিয়েছেন। আপনি এত দয়া করলেন যখন, একবার আমার গুহায় চলুন। আরো কয়েকটা কথা আমি বলবো। চলুন। আমি আপনাদের তাঁবু অবধি দিয়ে আসবো, এবং প্রতিজ্ঞা করছি রোজ যাবো।"

আমি সন্ন্যাসীর পায়ে হাত দিয়ে বলতে বাধ্য হলাম—"আপনি সর্বত্যাগী। আমি মহাভোগী। আমায় আপনি অপরাধী করবেন না। আমি বিদ্যার জাঁক করতে চাইনি। আমার কেমন রাগ হয়ে যায় তরুণ সন্ন্যাসী দেখলে; আমার পরম সন্দেহ জাগে হঠাৎ একটা ত্যাগের প্রকট উদাহরণ দেখলে। জগতে সৎ মহৎ এতো কম যে, চোখেই পড়েনা। তার মধ্যেও হঠাৎ যদি সেসব চোখেও পড়ে যায়, সেটা বাজিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়। আমার গলার কোহিনূরকেও লোকে কাঁচ ব'লেই তৃপ্তি পায়। আর এই সন্দেহ করাকেই বলা হয় আধুনিক জ্ঞান, যার উন্মেষ জিজ্ঞাসায়। আমি গুহায় গিয়ে যদি আপনার আনন্দের কারণ হই, অবশ্যই যাবো।"

গুহামুখ অপ্রশস্ত ও সঙ্কীর্ণ। অন্ধকার পথে বুকে হেঁটে ঢুকতে হয়। ভিতরে বেশী জায়গা নেই। বসলে মাথা ঠেকেনা, দাঁড়ালে ঠেকে। ইংরাজী L-এর মতো গুহা—সমস্ত ক্ষেত্রফল হবে ১২০ বর্গফুট, এবং ৩৬০ ঘনফুট। সঙ্গে একটুকরো মোম কি চর্বি। সেটাই একটা হাড়ের পাত্রে রেখে ভিতরের চুল্লীতে ফুঁ দিয়ে একটা সলিতা জ্বালিয়ে রাখলেন। এককোণে রাখা কয়েকখানা খাতা ও বই। তা থেকে বার করলেন একখানা খাতা।

"আমার ডায়েরি। মাঝে মাঝে অভিজ্ঞতা লিখি। অন্য অভিজ্ঞতা নয়, চিত্তের অভিজ্ঞতা। ভিতরে যে যুদ্ধ চলছে তারই ইতিহাস। মাঝে মাঝে

তীব্র একটা অনুভূতি হয় ; তখনই লিখি। কোথাও হিন্দী, কোথাও ইংরাজী, কোথাও গদ্য কোথাও পদ্য। আপনি পড়ুন কিছুটা। আমার যন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝতে পারবেন।"

আমার কাছে সে-লেখা আজ নেই। কিন্তু তার খানকয় পাতা এখানে তুলে দিতে পারলে দেখাতে পারতাম যে একটা চিত্ত অব্যক্ত যন্ত্রণায় কেমন মাথা কুটে মরছে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারাপ্রাচীরে। বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে না অনুধাবন করলে তাকে বাতুলের প্রলাপ ব'লে মনে করা নেহাত পাপ হবেনা।

কিন্তু কী সরল হাতের লেখা এবং কী সরল ভাষা! নিজের জন্য কিছু পর্দা নেই। ওঁর দেহে যেমন বালাই নেই, ওঁর মনে নেই, লেখায় নেই। আমি পড়ে যাই। উনি ততক্ষণ কী বিলোন সঙ্গের সঙ্গীদের। এবং নিতান্ত ঘরোয়া গল্প জমান।

হঠাৎ আমার হাত থেকে খাতাখানা সরিয়ে নিয়ে বলেন—"আমি এসে এদের গ্রামে গিয়ে প্রথম প্রথম অনেক অনুনয় বিনয় করে ওদের বোঝাতে চাই জীবনে পরিস্কৃতির সার্থকতা। বোঝাই বিদ্যার সারবত্তা। মেয়েরা ও শিশুরা উন্মাদের মতো আমার পাশে দাঁড়ালো। কিন্তু পুরুষরা আমায় প্রহার করলো, আমায় বিষ খাইয়ে নির্জীব করে রাখলো ;—বললো আমি দুষ্ট, বদ। পরে বুঝলাম আমার দিগম্বর মূর্তি ওদের রোষের কারণ। কাজের মুখ চেয়ে আমি বস্ত্রের অসভ্যতাও বহন করলাম আমার কটীর চারপাশে। কিন্তু তখনও ওরা আমায় মানেনা। গ্রামে ঢোকা বন্ধ করে দিলে। এখন অবশ্য ওরা আমায় মানে। তাই একটা বিদ্যালয় করেছে। আমি অনেক চেষ্টা করে বিদ্যালয়ের জন্য একখানা ঘর করিয়েছি। কিন্তু এখন এমন একটা বিপদ ঘটেছে যে, আপনার সাহায্য আমার চাই। সেটা পরে বলছি। এ ছাড়া অন্য বিপদ ওদের নোংরামি—চেষ্টা সত্ত্বেও ছাড়াতে পারছিনা। এর কী উপায় করি বলুন তো?"

"নোংরামির উপায় নিজহাতে পরিষ্কার করা। সন্ন্যাসী, নিজের মাথায় বোঝা নিন্, হলাহল নিজে পান করুন। তারপর সত্যাগ্রহ করুন—অনশন করুন। এখন আপনার এ অঞ্চলে যা প্রতিপত্তি—আপনি তো অসাধ্য সাধন করতে পারেন, আপনি তো বিদ্রোহ-বহ্নি, কামজয়ী শুকদেব আপনি, আপনি কিনা পারেন? কিন্তু আপনার বিদ্যালয়ের বিপদ কী বলুন তো?"

"যে সত্যাগ্রহের কথা বললেন, তেমনি সত্যাগ্রহ করেই এক চাষার কাছ

থেকে খানিকটা জমি আদায় করি। একটা পাহাড়ের শিখর। আশেপাশের চার-পাঁচখানা গ্রাম থেকেই সমান দূরে আছে শিখরটা। তাই যদিও কোনও বিশেষ গ্রামান্তবর্তী হোলোনা, বিদ্যালয়টি স্থাপিত হোলো একটা মনোরম ও উপযুক্ত স্থানে। আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলাম। ওরা পালা করে মাসে এক সপ্তাহ কাজ করলো বিনা পারিশ্রমিকে। কাঠ ও পাথর নিজেরা দিলো। আমিই শিক্ষকতা করতে লাগলাম। তিন-চারটি শিক্ষক তৈরী করলাম। এখন সেই বিদ্যালয় যায়-যায়।"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি—"কেন?"

"গ্রামান্তরের অন্য বিদ্যালয়কে শিক্ষা-বিভাগ অনুমোদন করেছে এবং সরকারী সাহায্য দিচ্ছে। কিন্তু প্রতিশ্রুত-সাহায্য এখানে দিচ্ছেনা, এমনকি বিদ্যালয়টি অনুমোদিতই করছেনা। যদি করতো, আমি কয়েকটি ভালো ছাত্র-ছাত্রী দিতে পারতাম।"

"এর কারণ কী?"

"সেটিই তো মজার এবং তাতেই আপনি সাহায্য করতে পারবেন। গত নির্বাচনের সময় এই গ্রামখানা পুরাপুরিই শ্রীমতী রাজকুমারীকে ভোট দেয়নি। তাই বর্তমান প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী গ্রামবাসীদের বোধকরি একটু শিক্ষা দিতে চান। গ্রামবাসীরা তাই বলে। আমি এসব বুঝিনা। তবে শুনেছি শিক্ষামন্ত্রী আপনাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করেন এবং আপনার সঙ্গে আলাপ আছে। যদি আপনি আমার কথা তাঁকে ব'লে দেন এবং বিদ্যালয়টিকে একটু সাহায্যের কথা বলেন, আমার পরিশ্রম সার্থক হয়।"

"শিক্ষামন্ত্রীর কৃপাকটাক্ষ ব্যতিরেকেই আপনার শ্রম সার্থক হবে, সন্ন্যাসীঠাকুর। আপনি ওখানে আপনার মতো বিদ্যালয় রচনা করুন। বিদ্যালয়ের পেছনে সদাব্রত-গুরুর একনিষ্ঠা থাকলে সেটাই তার ঐশ্বর্য হয়ে ওঠে। সরকারী সাহায্যের সাথে সাথে সরকারী রক্তচক্ষু ও শ্যেনদৃষ্টি এসে হাজির হবে। আনন্দ তখন পর্যবসিত হবে sport-এ, বিদ্যা দাঁড়াবে আকস্মিকতারূপে। তবুও আমি চেষ্টা করবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। রাত্রি অধিক—আমরা চলি। আবার দেখা হবে। নারায়ণায় নমঃ!"

সন্ন্যাসী প্রতিনমস্কার করলেন—"নারায়ণায়ঃ নমঃ!" আমাদের হাতে এক এক মুঠো মোমফালী।

"কোথায় পেলেন ?"

"একটা লোক এক ঝুড়ি রেখে গিয়েছিল। কাল নিয়ে যাবে। তা থেকেই দিলাম।"

আমি বলি—"দাম রেখে যাই। সে তো বণিক।"

"আমি বলি কি, ভিক্ষুকের কাছে এসে আপনারাও তার কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে যান। এতে তার ভালোই হবে।"

সন্ন্যাসী শুনলেন না, আমাদের ওপর অবধি দিয়ে গেলেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন—"আপনি আমার শিক্ষক। আপনাকে প্রণাম।"

আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম—"আমায় অপরাধী করবেন না। আমি প্রগল্ভ তাই অত বলি। কিন্তু গুরু আপনার হয়ে গেছে, আপনি জানেন না। আপনি দীক্ষিত।"

সন্ন্যাসী চম্‌কে বলেন—"সেকি! কে ?"

"আপনি আমায় বলেছেন, আপনার মা আপনাকে হরিমন্ত্র দিয়েছেন। মন্ত্র দিলে, অন্য কেউ গুরু হয়না, সন্ন্যাসী। আপনি দীক্ষিত।"

বিহ্বল হয়ে সন্ন্যাসী "মা" "মা" বলতে বলতে নীচের অন্ধকারে মিশে গেলেন।

*

অল্পক্ষণেই এসে পড়লাম যেখানটায় পকৌড়ার দোকান হয়েছিল। গ্যাস লছে ডাইনিং-ঘরে—শাঁ-শাঁ শব্দ। ছেলেরা খাওয়া-দাওয়া করছে। রাত্রে আজ বিরাট আয়োজন—গানের আসর বসেছে।

সন্ন্যাসী-সংক্রান্ত সেই কথোপকথনে গোপী-বিক্রম অ্যাণ্ড কোং বিস্ময়ের শিখরচূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। ওরা বিছানায় শুয়েও এই কথাই আলোচনা করছিল।

বিক্রম বললো—"যোগে আপনি বিশ্বাস করেন ?"

গোপী বললো—"তুমি তো করোনা দেখতে পাচ্ছি।"

"কি করে বুঝলে করিনা ?"

"চোখের পাতা-দুটো যোগ করো তো দেখি! জ্বালাতন! একে ঐ ভীমরুলের চাক, তায় খোঁচা! এখ্‌নি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত বয়েৎ ছেড়ে ঘরটাকে কেবারে নৈমিষারণ্য করে ছাড়বেন। সর্বনেশে লোক উটি। ঘাঁটিওনা বিক্রম, ঘুমুতে দাও।"

সকালে তুস্‌সীরাম বড়োই লজ্জিত।

চা খেয়ে চট্‌পট্‌ সব সেরে চলে গেছি কাজ তদারক করতে। ছোলা ফুরিয়েছে, সক্সেনা আগে জানায়নি। ভাজা ছোলা ডবল দামে কিনে দিতে বললাম।

সেই সূত্রে গেলাম খাদরালা-হোটেলে। দেখা হোলো ভদ্র একটি লোকের সাথে। ভদ্রলোক ওঁর গাঁ থেকে নির্বাচিত সদস্য হিমাচল-রাজ্যপরিষদের। ফলের ব্যবসায়ে সমৃদ্ধ। তবু তো পাহাড়ী। কতই বিনয়, কতই আন্তরিক ব্যবহার। মনটা খুশীতে ভরে উঠলো।

সেই খুশীতে ভর দিয়ে খানিকক্ষণ লেখা সেরে নিলাম। বাধা দিল এসে ডাক্তার।

"আজ এতো সকালেই মাল টেনেছো যে?"

ডাক্তার বললে—"কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করার কারণ। জিজ্ঞাসা করতে এলাম তুমি কি রাতে চক্রে বসবে, একটা যোগিনীর অর্ডার দিয়ে রাখি। তোমার সেই ভৈরব তো হাজির।"

"কে? সন্ন্যাসী?" সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। "কতক্ষণ এসেছেন? কোথায়?"

"আমার ঘরে নয়। সুপবিত্র স্থানে। তোমার তাঁবুতে। তার সঙ্গে এতক্ষণ তোমার কথা চলছিল। বেড়ে ফাঁসিয়েছো ছোকরাকে।"

"ডাক্তার, মদ খেলে তুমি ছোটোলোক হয়ে যাও।"

"অর্থাৎ না-খেলে ভদ্রলোক থাকি! তা তুমি জানো কি করে? তোমার ত্রিসীমানার মধ্যে তো ভদ্রতার আঁচও নেই।"

"কেন বলো তো?"

"সোজা কথা সইতে পারোনা। নিজের কথা জাহির করতে রুচি; বুজরুকি, ভণ্ডামি; তার ওপর মাস্টারী। কোন্‌টায় মানুষকে ভদ্র করে বলতে পারো?"

"এক কাপ চা দে ডাক্তারকে।" হুকুম দিলাম।

ডাক্তার বললে—"শুধু চা নয়। ভালো করে অম্‌লেট করে দে। বড়ো খিদে পেয়েছে, ভাই।"

"হঠাৎ কি দুর্ভিক্ষে পড়লে ?"

"আদৌ না। কাল সেই মেয়েটা এসেছিল হঠাৎ। মন-কেমন করছিলো তার। তোমায় তো পাবার জো ছিলনা। বিকেলেই তাকে প্রায় জোর করে পাঠিয়ে দিলাম। আমার খাবারগুলো খেয়ে গেলো (জানতাম ডাক্তার জোর করে খাইয়েছে তাকে), আমি খালি বোতল চুষেই কাটালাম রাত।"

"ডাক্তার, এতো মদ খাও—ক্ষতি করেনা ?"

"এতো ফাজলামি করো, ক্ষতি করোনা দশের ? নিজের ক্ষতি করে মাতাল ; তাবৎ দুনিয়ার ক্ষতি করে শিক্ষকরা। মদে যতো-না ভণ্ডামি শেখায়, তোমাদের ডিগ্রীওলাগুলো তার চেয়ে ঢের বেশী ভণ্ডামি শেখায়। বনের পশু মদ খায়না ওরা সভ্য, আর ঐ পাহাড়ীগুলো লেখাপড়া জানেনা ওরা সভ্য। সভ্যতার রাজত্বই এই খাদরালা।"

"তুমি তো Oscar Wilde-পন্থী নকল কথার আতসবাজি নিয়ে আছো। সন্ন্যাসী মরে যে। চলো।"

"আমায় এখনও এটা শেষ করতে হবে, তুমি এগোও।" ডাক্তারের পকেটে 'Hayward'।

আমি হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ুলাম। পেছনে দেখলামনা চেয়ে। পরে অবশ্য নিজে গিয়েই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

সন্ন্যাসী তাঁর বিদ্যালয়ের আর্জি এনেছেন। দেখে গেলেন নিজের চোখে, আমাদের ছেলেরা ক্লাস করে বাচ্চাদের পড়াচ্ছে। সন্ন্যাসীকে দেখে বাচ্চারা বড়ো খুশী। আমায় গোপনে ডেকে বললেন—"আপনি আমার ডায়েরি পড়ে কিছু বুঝেছেন কি ?"

"হ্যাঁ, আমার সন্দেহ হয়, সোজা পথে না এলে আপনার মাথা-খারাপ হতে পারে। এমন হয় দেখা গেছে।"

"আমারও তা মনে হয় এক এক বার। আমি কী করি বলুন তো।"

হঠাৎ ডাক্তারের চোখ-দুটো মনে পড়ে গেল। সেই সকৌতুক নির্মম উক্তি বন্ধুতার মধুরসে মাখা—'ভণ্ডামি করার অসভ্যতা শিক্ষকদের একচেটিয়া'। বললাম—"সন্ন্যাসী আপনি, আপনাকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই। তবে আমি বলবো আপনি 'মায়া' আর 'প্রকৃতি'র প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নিয়ে

কোনও গুরুর কাছে যান এবং মায়ের দেওয়া হরিমন্ত্রে আস্থা রাখুন, আমার মতো অর্বাচীনের উপদেশ আহরণ করতে হবেনা।"

*

রাত্রে গান-বাজনার জলসা। বুদ্ধুর ক'খানা গান আছে। মাউথ-অর্গ্যান যে-ছেলেটি বাজায় তার নাম বসন্তকুমার ভর্মা। এ ছাড়া পল্ গাইবে, শুক্লা, সক্সেনা অনেকেই। সেই ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত বাইসারিয়া।

আমরা সাহিত্যের আড্ডায় চললাম।

বুদ্ধু ভালো গান গায়। গান গাওয়া হোলে, ও আর রাখাল খানিকটা হুটোপাটি লাগালো।

রাখাল বললো—"যাঃ, গান বাছতে জানিস্‌না, গাইতে যাস্ কেন ?"

বুদ্ধু বললো—"বলোনা বাবা আর একখানা শুনবে !"

"আমি তোমায় ফরমাস দিয়ে গান শুনবো ? ওঃ, কী আব্‌দার রে! ফরমাস-টরমাস করবোনা। তবে হ্যাঁ যদি গাইতে 'দিনশেষের রাঙা মুকুল'— বলতাম সিলেকৃশনের টেস্ট আছে।"

বুদ্ধু বললো—"না সাধলে আমি গাইবোনা।"

"বাঁচাবি তাহলে বাঁচাবি। দিনরাত্তির যা গাঁক্-গাঁক্ চেঁচাচ্ছিস্—দেশ ছেড়ে গাধারা চলে গেছে।"

"হায়-হায় তোর কী শোক উপস্থিত! দেশে গিয়ে কাকে নিয়ে ঘর করবি রে রাখাল!"

তেড়ে গেল রাখালকে ধরতে।

রাখাল খানিকটা দৌড়ে ঘাসে গড়িয়ে কাৎরাতে লাগলো—"দেখুন দাদা, দেখুন, আবার কাতুকুতু আরম্ভ করবে !"

দিলীপ গল্প পড়লো একটা। কাঁচা হাতের লেখার মধ্যে যে রং আর রস থাকে সবটাই আছে। নতুন আনকোরা ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট-বক্সের চাকচিক্য আর পারিপাট্য দেখলেই শিক্ষানবীশ এঞ্জিনীয়ারকে মনে করিয়ে দেয়। নতুন তুলি আর ভরা রঙের ডিবে দেখলেই মনে হয় আর্টিস্টের বাকী অনেক পথ অতিক্রম করার। অথচ এরাই একদিন বড়ো হয়ে ওঠে। আর যখন বড়ো হয় তখন রং রস আর উপ্‌চে পড়েনা। কষিত যৌবন শ্রী বিলিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত মাতৃত্বের সম্পূর্ণতা লাভ করেনা। লেখক যখন সত্যকার সৃষ্টি-আনন্দে

ভরপুর তখন তেজস্বী চরিত্র আর সবল দৃষ্টিভঙ্গী প্রধান হয়ে ওঠে; রং রস ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে। বর্ষণক্লান্ত মেঘের পশমে নীল দিগন্ত রং পায় সব জায়গায় থেকে থেকে, রয়ে রয়ে। নববরষার শ্যামগম্ভীর বর্ণ তখন আর থাকেনা।

দুটো গল্প হোলো; আর তারপর চললো আবাব গান, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্য আলোচনা।

ফেরার পথে ঐ ঘোড়া-বাঁধা জায়গাটার ধারে কয়েকটা লোক ভীড় করেছে। সবাই ঐ পথ-করা গ্যাঙের কুলী।

একটা পাঁঠা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে। একজনার হাতে একটা ভোজালি, বড়ো, প্রায় দেড় ফুট ফলা হবে। সোজা হাতের এক চোপে দাঁড়ানো-পাঁঠাটার গলাটা খসিয়ে ফেলতেই তাড়াতাড়ি একটা বড়ো বাটি নিয়ে রক্তটা ধরে ফেললে একজন লোক।

বাটিতে ধরা রক্তে গরম জল ঢেলে রক্তটাকে জমাবে। তারপর ছানার মতো করে কেটে, ঝাল দিয়ে রান্না করবে! ব্লাড-পুডিং।

বিকেলে সাহিত্য আর গানের আসর ছেড়ে এই দৃশ্য মোটেই ভালো লাগেনি। আজ ওরা বড়ো খুশী। মদ আর মাংস নিয়ে ওদের নৃত্যগীত চলবে সারারাত। ওদের আনন্দের পথ এইধার দিয়েই খোলা। আমাদের বলবার কিছু নেই। তবু কেন যেন ভালো লাগেনা।

*

ভোরের আকাশের গায়ে উত্তরদিকের শিখরগুলি যেন কমলা-রঙের সঙ্গে সোনা মেখেছে। গাঢ় একটা দ্যুতির স্পর্শ কোথাও কোথাও; কোথাও কোথাও মেঘের আড়ালে জমাট অন্ধকারের বাষ্প। ওধারটায় তো গাছপালা নেই। চাইলেই শান্তি, সন্ন্যাসের শান্তি, নিরাবরণতার শান্তি। আলোর রং নেই—যে বলে, সে আলোকে চেনেনি। রঙের মধ্য দিয়েই আলোকের স্বরূপ। সে-রং আবার ধরা পড়ে বনের সবুজে; মাতাল নীলে, পর্বতের ধূম্রাভ নীল-কালোর ধূপছায়ায়।

নেমে গেলাম ঐ হোটেল-ঘরে। ওরা তখনও উনুন জ্বালেনি।

বাইরে বড়ো বড়ো খচ্চরগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, মুখে বাঁধা থলে থেকে ছোলা খাচ্ছে। আমার পানে বড়ো বড়ো চোখ তুলে চাইলো। কান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

চেষ্টা করলো কোনো শব্দ দিয়ে চিনে রাখতে। পটাপট্ লেজ আছড়ে আর পেছনের পা ঠুকে ডাঁশ তাড়াতে লাগলো; আর নরম নাক দিয়ে ঘোঁর্র্-ঘোঁর্র্ শব্দ করে আহ্লাদ জানাতে লাগলো। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম এদের আর বাচ্চা হবেনা। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম।

ঠিক পাশেই পাইনের সারের তলায় পাহাড়ী দলটা রাস্তা বার করেছে কেটে। অনেকটা পাইন ওরা কেটে নামিয়ে দিয়েছে। তার গা থেকে লাল-লাল গঁদ বেরিয়েছে। সুন্দর তার গন্ধ। সেই গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে।

হোটেল থেকে ঝরঝরে মুখে বেরিয়ে এলো—তাকে চিনি। মাঙ্গারাম। আমায় ঘোড়ায় চড়িয়েছিলো প্রথম।

"তুই বুঝি রাতে এখানে ছিলি?"

"আমার গাঁয়ের ছেলে পিরথী তোমাদের পথ-তৈরীর কাজে এসেছে। আমি নীচে ঘোড়া বেঁধে রাতে ওর কাছে শুয়েছিলাম। তোমায় দেখে বেরিয়ে এলাম। ঘোড়ায় চড়বে? চলোনা বেরিয়ে পড়ি ঘোড়া নিয়ে। ভোরবেলায় রামপুরের পথে নামা যাবে।"

সেই শ্রীনাক বলেছিলেন—'দেখে এসো, দেখার মতো জায়গা রামপুর-বুশায়র'। সেই রামপুর। সে যে অনেক দূর—অনেক দূর। যেখানেই যাবার কথা মনে হলে মনে হয় অনেকদূর সেটাই তো রমণীয় হয়ে ওঠে। কোপেন্হাগেন? সে তো চেনা জায়গা। বন্দরটায় গেলেই অ্যাণ্ডারসনের স্মৃতিতে রচনা করা সেই মারমেড্টাকে দেখতে পাবো। বার্লিন, বার্ন, পীসা, কেপ্টাউন, লণ্ডন—স্টক্হলম্—লেনিনগ্রাদ—সবই তো হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। রোমাঞ্চ জাগেনা যেন। এদের বড়ো বেশী জানি। রোমাঞ্চ জাগেনা যদি শুনি ইনি রীতা হেওয়ার্থ, ইনি গ্রেটা গার্বো, ইনি এলিজাবেথ বার্গনর বা ইনি লুই রেনর। এদের মধ্যে রোমাঞ্চ নেই। কিন্তু যখন শুনি তুন্দ্রার সীল শিকার করা মা ইনি, ইনি অকলামাকানের পারে তাস্কন্দের অধিবাসিনী, উটের দুধের পনীর করতে জানেন, যখন শুনি এণ্ডিসের দক্ষিণ উপত্যকায় এই তরুণী এখনও বুনো ঘোড়ার দল বাগিয়ে এনে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেয়, লামার পশম পাকিয়ে দামী রাগ্ বোনে তখন যেন মনে হয় কানে শুনতে পাচ্ছি কোরাল-দ্বীপের নারিকেল-বনের গান, শাখালীনের উত্তরে সমুদ্রগর্জনের আর্তনাদ, দক্ষিণ মেরুতে পেলিকানের

ক্রন্দনরোল, মরূদ্যানের বুকে খেজুরপত্রের কাকলী। যেখানে যেতে পারিনা, যার স্বপ্ন মনের পাখাকে চঞ্চল করে তোলে সেই জায়গাই তো দূর। রামপুর-বুশায়র কাছে ; হোক কাছে ; সে অনেক দূর, অনেক দূর। ঘোড়া ছুটিয়ে, বন চিরে, গিরি অতিক্রম করে নদীর ধারে রামপুর-বুশায়র—মেলার জন্য প্রসিদ্ধ, প্রজার জন্য প্রসিদ্ধ, পশমের জন্য প্রসিদ্ধ, রাজার জন্য প্রসিদ্ধ—সেই রামপুর-বুশায়র ; তিব্বতের লামা যেখানে এসে 'হুম্ হুম্' গান গায় চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে, কাশ্মীরী পাঠানদের কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে যায় কুমায়ুনের পশমওলার কাছে। যেখানে কাংড়ার চাষী ফলের গল্প জোড়ে নেপালী চামড়াওলার কাছে, হরিদ্বারের সাধু চেয়ে নেয় কাঁচি-সিগারেটের আধখানা বাক্স পাঞ্জাবী সার্কাস-দলের চিড়িয়াখানার বাবুটির কাছ থেকে। সেই রামপুর-বুশায়র।

"যাবে বাবু? বেড়ে পথ। আমি ঘোড়া দিই।"

"আর তুই?"

"আমি খচ্চর নিয়ে যাবো। বড়ো একটা খচ্চর।"

"চা খাইনি যে!"

"চলোনা—ভালো চা দেবো।"

মাঙ্গারামও ভালবাসে। পথে পথে এই অকারণ ভালবাসার ভাণ্ডারী হলাম। শিক্ষা, বিদ্যা, সকল গর্ব, সকল অহংকারকে পদদলিত করে মানুষ যখন এগিয়ে আসে তখনই যেন অভিষেক হয়ে যায় মনের সিংহাসনে বসে আছেন যিনি তাঁর। ছেঁড়া নোংরা ওদের পোশাক, দাঁতগুলো ময়লায় হলুদে, চুলগুলো রুক্ষ, গায়ে দুর্গন্ধ, সারা কাপড়ে-চোপড়ে পিশু—কী নোংরার স্তূপ! কিন্তু ওরই মধ্যে লুকোনো আছে প্রেম, শ্রদ্ধা, পুলক ; আত্মায় করে নেবার আরতি। এই ভালবাসা পেলাম পুরুষের কাছে, নারীর কাছে, বর্ষীয়সীর কাছে, তরুণীর কাছে। পথের মাঝে এর মূল্য অক্ষয়, এর সঞ্চয় মণিকোঠায় তোলা থাকে।

মাঙ্গারাম আমার জন্য কেঁদেছিলো। মাঙ্গারাম আমার ঘোড়া-চড়া দেখে হেসেছিল, খাদরালার মাথায় ঘোড়া-সুদ্ধু ওঠা দেখে চমকে গিয়েছিলো। তবু আজ ওকে পেয়েছে পথের নেশা, ধুলাবালির আহ্বান ; পাইনের গান শুনেছে ও আজ।

খানিকটা গিয়েই ও সেই কাশ্মীরী মোষগুলার আড্ডাটায় হাজির করলো। বললে—"খাও দুধ পেট ভরে, বাঁটের তাজা দুধ।"

আর যে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানে হিন্দুস্তানে বিরোধ—যার সমস্যায় আজ কিং জেম্‌স্ প্যালেসে, হোয়াইট-হাউসে আর ক্রেম্‌লিনে ঘুম নেই, U.N.O.-তে সভ্যেরা বিব্রত, সেই কাশ্মীরী মেষপালক ঘটি ভরে দুধ নিয়ে এই হিন্দুস্থানীকে খাইয়ে তৃপ্ত। সে-খুশীর মাপ করা যায় এমন থার্মোমিটার নেই।

খোঁচানো অভ্যাস। জিজ্ঞাসা করলাম—"হ্যাঁরে, বখ্‌শী গোলাম আহমেদ ভালো, না, রাজাই ভালো ছিলো?"

একগাল দাড়ি। মাথায় কষে বাঁধা লম্বা লেজ-ঝোলানো পাগড়ি। হাসির ফোয়ারা ঝরে ওর রেখাসঙ্কুল আঁখিকোণে। "ভালো? এই মোষ আর লাঠি। যতদিন এ-দুটো আছে, বাবুজী—আমার বখ্‌শীও নেই, রাজাও নেই। শ্যাখোনা আমাদের হিন্দুস্থানে ঢোকার পথ নাকি বন্ধ। কে শুনছে? কেন বন্ধ হবে শুনি? মোষগুলো খাবে কী শুনি? এদেশের ভায়েরা আমার কী ক্ষতি করেছে শুনি? যাই বলো বাবু, নীচের লোকগুলা বড়ো পাজী। অবশ্য তুমি ছাড়া।" ব'লেই নিজের ডিপ্লোমাসিতে নিজে হাসে।

"আচ্ছা, কেউ কেউ বলছেন তোরা পাকিস্তানে যাবি। এইতো পাঠানরা এসেছিলো তোদের আজাদী দিতে···"

দুধ দুইছিলো। বালতিটা ঠক্ করে রেখে ও বলে—"তোবা তোবা। এই সকালে খোদাতালার নাম নাও, বাবুজী। সেই ডাকাতির কথা বলছো তা হোলো আজাদী। বজ্জাত পাঠান-ডাকাতরা বরাবর আমাদের জ্বালাতন করে। আমরা ঠেঙিয়ে ঠিক করে দিই। এবার নীচে থেকে উর্দি প'রে সব ফৌজ এসে কি-যে বেইজ্জত-বেরহমের কাজ করে গেছে শুনলে গোরের ভেতরে দাদা পরদাদা সব নড়েচড়ে উঠবে। পাকিস্তানেও আজাদী নেই, হিন্দুস্তানেও নেই, আজাদী এই দিলের মধ্যে, রাখতে হবে লাঠির চোটে। দুধ খাও, তাকত হবে, লাঠি ধরতে পারবে।"

"তোমার রোজগার কতো?"

"কি জানি, হিসেব নেই। মোষগুলোকে যতই যত্ন করি ততই ভালো লাগে। আমরাও ওদের খেতে দিই, ওরাও আমাদের খেতে দেয়। ব্যস্ আর টাকা দিয়ে কী করবো?"

"এই কষ্টের জীবন ভালো লাগে ?"

"কষ্ট কাকে বলো, সুখ কাকে বলো ? আমি বলি এতো সুখের জীবন ছেড়ে কোথায় যাবো !"

হেসে বললাম—"বিলিতী গোশালা, গোয়ালঘর, গোয়ালা দেখনি তাই বলছো।"

ও তেমনি হেসে বললে—"একবার এক বাবু কাশ্মীরে আমায় ছবি দেখিয়েছিল আটিলা না কোন্ দেশের—"

"হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া—"

"ইয়া বড়া বড়া গরু, ইয়া বড়া বড়া মোষ—, সুন্দর ইমারতের মধ্যে গরু ভেড়া। হ্যাঁ বাবু, ওদের দেশে বরফের পাহাড়ের গায়ে এমন সব জঙ্গলেও কি ওরা গরুকে ইমারতে রাখে ?"

"হ্যাঁ, রাখে।"

"ইমারতেই ঘাস হয় ?"

"তা হবে কেন ? ওরা ঘাস এনে খাওয়ায়।"

"ওরা মোষ-গরুর মতো নিজেদের ভাবেনা, নিজেদের মতো মোষ-গরুকে ভাবে। তাই মোষ-গরুকে বাবু করছে। যদি মোষগুলোকে আমি জিজ্ঞাসা করি—'ওরে, তোরা বাঁধানো বাড়ী বসে বেড়ে-দেওয়া ভোজ খাবি, না, নিজেরা বনে বনে দেখেশুনে খাবি'—ওরা অমনি ছুটে আসে বনে। ওদের সুখ আমরাই বুঝি। আমরাও যে জানোয়ার, বাবু; ওদের মতো বাবু হলে আমরাও ইমারতে মোষ ঢোকাবো।" ব'লেই নিজের রসিকতায় নিজে হো-হো করে হাসতে লাগলো।

এদের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান, কম্যুনিজ্ম্, ক্যাপিটাল্বাদ সবই বৃথা। গৌরীশঙ্করের শিখরের মতো ওদের আস্থার বরফ গলেনা। যাবার বেলায় আবার বললে—"সত্যি বাবু, আমাদের পাকিস্তানের কাছে বেচে দেবে ? আমরা আর এদেশে আসতে পাবোনা ? মোষগুলো রামপুর-বুশায়রের পথ চেনে। খাদরালার ঘাস খেতে বড্ড ভালবাসে। ওদের কী হবে বাবু ?"

এর উত্তর যোগায়নি মুখে সেদিন। ও ব্যাকুল ওর মোষ এই বনের ঘাস ভালবাসে এই ভাবনায়। পদ্মার ইলিশ, বুড়ীগঙ্গার কোরাল, ঢাকার বাজারের শরপুঁটি আর কই, বরিশালের মুসুরির ডাল যারা ভালবাসতো—আজ

কোল্‌কাতায় দিল্লীতে বসে তারা শোক করছে। আর এই কাশ্মীরী অমীরখান্‌ আজ শোক করছে খাদরালার ঘাস না পেলে তার মোষের কী হবে।

ঘোড়া নিয়ে নামতে নামতে এই কথাই ভাবছি। একটা জায়গায় থমকে দাঁড়ালাম। পাহাড়টা বেঁকে গেছে। নীচের দিকে দেখতে পাচ্ছি নদীটা একটা রূপার চাদরের মতো বিছানো, ফিতার মতো লম্বা, এঁকে-বেঁকে চলে যাচ্ছে। গায়ে গায়ে ছোটো ছোটো ছবির মতো বাড়ী। চৌকো-চৌকো ফলের বাগানের শ্যামল আস্তরণ। রোদ পড়ে জলটা চক্‌চক্‌ করছে, গাছপাতা ঝল্‌মল্‌ করছে। দূরত্ব ঐ ছবিটার ওপার যেন জাপানী ওয়াশ্‌ দিয়ে রমণীয় করে তুলেছে। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি।

মাঙ্গারাম বললে—"ওই রামপুর। যাবে?"

আমি বললাম—"অনেকদূর রে। ক্যাম্পে ব'লে আসিনি। ঠিক সময়ে ফিরতে হবে।"

ঘোড়া থেকে নেমে জায়গাটায় বসলাম। একটা নতুন শব্দ কানে এলো। খুব মিষ্টি শব্দ। বাঁশীর শব্দ মনে হয়। মাঙ্গারাম ঘোড়া আর খচ্চর দুটোকে নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে চলে গেছে। ঘাস খাচ্ছে ঘোড়া-খচ্চর। আমি যেন আর কান পেতে ঐ গান শুনতে পারিনা। এক-পা দু'-পা করে পাহাড় বেয়ে ওপরদিকে উঠতে লাগলাম।

পাহাড়টায় কচি কচি কেলুগাছ চারা ফেলেছে। ঘাস নেই কিন্তু জঙ্গলের নানান্‌ পাতায় ভর্তি। শক্ত শক্ত ফার্ন দিয়ে ঢাকা যেন সর্বাঙ্গ। আঁকড়ে-আঁচড়ে উঠতে লাগলাম। এমনি করে কতবার বিপদের মধ্যে পড়েছি, পথ হারিয়েছি, সবই সত্য; তার চেয়েও সত্য যে আমি সব হারানোর মধ্যে আবার পথ খুঁজে পেয়েছি। এটাই বড়ো কথা। সেই কথাই সাহস যোগায়। আমি এগিয়ে চলি।

ওপরটায় আসতেই দেখি গভীর অরণ্য, দুর্ভেদ্য। সেই বাঁশী, সঙ্গে আবার চামড়ার বাজনা একটা কিছু। ঘন পাতার মধ্য দিয়ে দেখা যায়না। জঙ্গলটা এত গভীর, এতো অন্ধকার আর নিঃসঙ্গতাও এমন রিক্ত যে সাহস হয়না। অনেক ঘুরে বহুকষ্টে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলাম। বাঁশীর শব্দ বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে। আমি যে দিবাকরের তেজদীপ্তলোকের অধিবাসী আমি যে সভ্যদেশের রাজধানীতে বসে আপনার 'আমি'-বাদে আপনি প্রমত্ত

আমি যে রূঢ়, স্থূল, আরণ্য, বর্বর, আদিম কোনো কিছুই চাইনা ভালবাসিনা, এখানে এসে সব যেন ভুলে যাই। পায়ের তলায় পচা পাতা দলিত হচ্ছে। তা থেকে আর্দ্রতা জুতোর তলায় পুঞ্জীভূত। গায়ের জার্কিনটা গাছের ডাল লেগে লেগে ক্ষত-বিক্ষত। হাত ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে। আমার বিহ্বলতা, আবার অসহায়তায় আমি নিজেই আঁতকে উঠি। মনে হয় দু'হাতে গলা টিপে ধরি নিজের, কেন দিনের পর দিন এই নেশায় বিহ্বল হয়ে দৌড়ই ?—*alone and palely loitering*—কীট্স্‌-এর *La Belle Dame* কাহিনী নয়। প্রকৃতির প্রেমে মত্ত যার চিত্ত, প্রকৃতি তাকে টেনে নিয়ে যায় সমাজ হতে, বন্ধন হতে, আশা, ভরসা, ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন—সব কিছু থেকে। তার শান্তি নেই, পূর্ণতা নেই, প্রাপ্তি নেই, স্থিতি নেই। সে নিয়ত অস্থির, দুর্নিবার। *Thee hath in thrall !* তবু চলেছি। বাঁশী বাজছে। চারিধার নিস্তব্ধ। মাথার ওপরে মাঝে মাঝে পাখী ডাকছে। তারপরেই এমন স্তব্ধতা যেন প্রজাপতির পাখার ধ্বনি শোনা যায় ; আর শোনা যায় সেই বাঁশী।

*One exquisite trill*
*About the sombre woodland seems to cling*
*Dying in music, else the air is still,*
*So still that one might hear the bat's small wing*
*Wander and wheel above the pines ...*

কিন্তু আর এগুনো যায়না। দূরে দেখতে পাই বিরাট পাইনের নীচে খানিকটা খোলা জায়গায় জনকয় বসে আছে। কাঠের একটা বড়ো হাঁড়ি-মতো। তার মধ্যে লম্বা একটা কাঠেরই মন্থনদণ্ড। দড়ি দিয়ে টানছে আর গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছে, যে গানের ভাষা নেই ; একফালি রোদের তলায় একজন বাঁশী বাজাচ্ছে। আরও কিছুটা দূরে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে, বুকের ওপর গোল একটা চা'লুনি আকারের চামড়ার বাদ্য নিয়ে একজন বাজাচ্ছে। বাজনদার দুজন ছেলে। মাথায় টুপী দেখলে কাশ্মীরী এবং মুসলমান বোঝা যায়। গায়ে লম্বা পাঞ্জাবির ওপর আরশীর টুক্‌রোর কাজ-করা কামর-কোট হাতা কাটা। কাঁধের ওপর হল্‌দে আর সবুজ সুতোর কাজ। কিন্তু মেয়ে ক'টাই দেখবার মতো—দূর থেকে বিদেশীর দৃষ্টি যে তাদের দেখছে তা তারা জানেনা—

*Lily like white as snow,*
*She hardly knew*
*She was a woman, so*
*Sweetly she grew.*

* * *

*Peace, peace, she cannot hear,*
*Lyre or sonnet,*
*All my life's buried here,*
*Heap earth upon it.*

লালচে চুল স্তবকে স্তবকে কাঁধে পড়েছে—পড়েছে "উরুতটে স্তনাগ্রচূড়ায়"। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে টানছে দড়ি, তাতেই চুলগুলো নাচন লাগিয়েছে টিফিনের ঘণ্টার বাচ্চা ছেলের মতো। গায়ের কারসাজী পোশাকের গায়ে ছোটো ছোটো ঘটী আর কাঁচের টুকরো দোলানো। মাথায় চুলের সঙ্গে বিনুনী করে বাঁধা ছোটো ছোটো চুম্‌কির থোলো কপালে ঝুলছে। পরনে পরতের ঢেউ-তোলা পা-জামা। গায়ের পাঞ্জাবির বুকটা খোলা।

"তাই যা দেখছি তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখছিনা তারি ভীড়।"

কাঁধে হাত রেখে মাঙ্গারাম আমায় ইশারা করে সরিয়ে নিয়ে গেলো। বেশ খানিকটা যাবার পর চোখ কপালে তুলে চেয়ে বললে—"সর্বনাশ! খুন করে ফেলতো যে। ওরা কাশ্মীরী বুনো-বেদের দল। উঁচু পাহাড় ছাড়া নীচে নামেনা কখনও। মানুষকে এড়িয়ে চলে ওদের মেয়েরা। যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পেতো তুমি আড়ি-পেতে ওদের অমনি করে দেখছো—ছুরি দিয়ে শেষ করে দিতো।"

হস্টেলে থাকার সময় কাউলের মুখে এই বেদে-দের কথা শুনেছি। আসল আর্যরস এই বেদে-দের গায়ে। কাউলের থিওরি যে, এরাই অদিতি-শাবন না হলেও নিশ্চয়ই দিবৌকসদের সংজ্ঞায় পড়ে। অসুরীয়দের নির্যাতনে এক আদিম যুগে এরা কিন্নরদের মতো গিরিকন্দরে বাস আরম্ভ করেছে এবং এখনও তা ত্যাগ করেনি। প্রমাণস্বরূপ কাউল বলেছে ওরা এখনও অগ্নিকে পরম দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, ভাষায় প্রচুর বৈদিক শব্দ ব্যবহার করে, মাংস সাধারণতঃ পুড়িয়ে খায়, গরু মোষ ছাগল ভেড়া পালন করে এবং সাকার দেবতা মানেনা।

ঃ কালিদাস নাগের একটা লেখাতেও পরে বেদে সম্বন্ধে এমন উক্তি :পয়েছিলাম।

"এরা হিংস্র কেন তবে?"

কাউল বলেছিল—"যুগের পর যুগ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে লড়াই করে রক্ষণশীল হবার ফলেই এই হিংস্রতার জন্ম।"

কিন্তু—'কি দেখিনু কি শুনিনু বলি কেমনে কারে!'

লাও-সী বলেছেন—"The further one travels—the less one knows."

মাঙ্গারাম আর আমি ঘোড়ায় চড়ে ফিরছি। চোখের ওপর রামপুর-বুশায়রের বিস্তীর্ণ সমতল মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে Oscar Wilde-এর *Magdalene Walks*-এর—

*And all the woods are alive with murmur and sound of spring*
*And the rose-bud breaks into pink on the climbing briar,*
*And the crocus bed is a quivering moon of fire*
*Girdled round with the belt of an amethyst ring*
*And the plain to the pine is whispering some tale of love*
*Till it mottles with laughter and tosses its mantle of green.*

চিন্তাস্রোত বাধা পেলো মাথার ওপরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে। ওপরের ং দিয়ে কে যেন চলেছে। পথটা এসে মিশবে এই পথে—আরও খানিকটা উঠে বে।

হঠাৎ চিৎকার করে ডাক এলো—"হো সফেদঘোড়া কা আসওয়ার!"

খুশী হয়ে গেলাম।

"রুগী দেখতে?"

"না গো না, কেবলই কি রুগী দেখি? দু'-একটা ভোগীও দেখতে যাই, তই না কেন হিংসে করো।"

"তোমায় ভালবাসি হিংসে দিয়ে।"

"আমার নিঠুর দরদী! সেই তো ভালবাসা। সই-পাতানো 'চোখের ালি' দিয়ে। তুমিও কি রুগী দেখতে?"

মাঙ্গারাম বেগতিক দেখে খচ্চর ছুটিয়ে চলে গেলো।

ডাক্তার হেসে বললে—"সহুরে বাবুদের সঙ্গে কারবার করে মাঙ্গারাম

সভ্যতার নিপুণ ফিকিরগুলো অ্যায়সা আয়ত্ত করেছে যে, তেমন-তেমন চোখে পড়লে ওকে রাজনৈতিক দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কোথায় গিয়েছিলে? সকালেই তোমায় ডাকতে গিয়েছিলাম। আস্থানা তোমার রিপোর্ট পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। গোপী আর বিক্রম বললে—'ভোররাত থেকে উধাও।' আমি ভাবলাম আবার কাকে চরিত্রহানি থেকে বাঁচাতে দৌড়ুলে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, হারাবার মতো বক্রী চরিত্র যে-ক'জনার আছে সকলেই তোমার tax থেকে বাঁচাবার জন্যে চরিত্রের পুঁজি সব suppress করেছে। Tax তুলে নিলে ওরা চরিত্র ছাড়বে বাজারে। এতে চরিত্রের কালোবাজার যে ফেঁপে ফেঁপে লাল হয়ে উঠলো, বন্ধু।"

"ডাক্তার, আমায় নিয়ে শ্লেষ করো অযথা। বক্রী চরিত্রের পুঁজিপতিদের অগ্রগণ্য তুমি। তোমাকেই তো ধরে রাখতে পারিনি।"

"মানে? তোমার ভয়ে বোতল অবধি থেমে আছি এই পিপের রাজ্যে এসে। মেয়ে আনি ছেলের সাজে। পাইপে টানছি বিড়ির পাতা। আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?"

"কাশ্মীরী বেদে দেখেছো ডাক্তার?"

হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে ডাক্তার বললে—"মানে? তুমি দেখেছো, এবং দেখে অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছো? অনেক আজগুবি কথা শুনি তোমার মুখে, এটাও বিশ্বাস করতে বলো?"

"আমি দেখি আর না-দেখি, তুমি দেখেছো কিনা জবাব দাওনা।"

"না, দেখিনি; দেখতে যেন হয়ওনা। একবার মাত্র এক বুড়ী বেদেনী এসেছিলো ঘায়ের ওষুধ চাইতে। সাধারণতঃ ওদের কোনও সভ্য রোগ নেই যক্ষ্মা বা এমনি জ্বরজারিও নেই। অদ্ভুত স্বাস্থ্য। আমি বুঝলাম এ ঘা ঘা-ও ঘা নয়। বললাম ঘা-টা দেখবো। বুড়ীর কাঁধের ওপর দিয়ে মেলানো একখানা হাড়ের বাঁটওলা ছুরি। 'আমার বেটার বৌ-এর ঘা। তোমায় দেখাব দূর কথা যদি ছেলে টের পায় যে আমি একথা তোমায় বলেছি, তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি।' ওষুধ দিইনি। ক'দিন পরে একটা মৃতদেহ পুলিস আনলো বছর পঁচিশের যুবতী। সর্বাঙ্গে সিফিলিস্ ঘা। বুকে আমূল গাঁথা একখানা ছুরি বনের পথে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। ছুরিখানা আমার দেখা। বুঝছো নিজেদের রক্তপ্রবাহ পবিত্র রাখার জন্য কত সহজে এরা কত কঠিন কাজ করে।

"কিন্তু আজ আমি অপূর্ব দৃশ্য দেখে এসেছি।"

সব শুনে ডাক্তার বললে—"আমি আস্থানাকে বলবো সিন্‌হার চেয়েও বিলাসী তুমি, সিন্‌হার চেয়েও কামোন্মাদ। তোমায় যদি বেঁধে রাখতে না পারে, তোমায় যেন সিমলায় পাঠিয়ে দেয়। মাস্টার, মদ-মেয়েমানুষের নেশার চেয়েও ভয়ঙ্কর নেশা তোমার।"

সত্যিই ডাক্তার ভয় পেয়েছিলো। নৈলে আস্থানা আমায় বলতোনা: "এমন জায়গায় না-জেনে যেখানে-সেখানে গিয়ে বিপদ ডেকে আনা ভালো নয়।"

এমনকি বিকেলে সেই কাশ্মীরী গোয়ালা করীমখান্ এসে চোখ কপালে তুলে বললে—"অমন কাজ দোস্‌রা বার আর করবেন না, বাবুজী। ওরা হুরীর জাত। ওদের পাখা আছে। রাতে ওরা মানুষের ঘাড় চুষে রক্ত খায়। ওদের পুরুষগুলো রাতে সব ভেড়া হয়ে যায়। ওদের দেখে এসেছেন—রাতে এসে আপনাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেবে। কারুকে না খেয়ে ওরা ছাড়বেনা। একটু দাঁড়ান, আমি ঝেড়ে দিই আপনাকে।"

"তুমি জানলে কোত্থেকে করীমখান্?"

"কেন? মাঙ্গারাম জানে আমি হুরীর গুণী। ওদের ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র জানি। ইয়া বিস্‌মিল্লা—মাঙ্গারামের মতো কট্টর দোস্ত থাকতেও জেনেশুনে আপনাকে বিপদে ফেলে রাখবে? আমায় খবর দিতেই আমি ছুটে এসেছি।"

হাসি পেলো এই সরলতায়। ঝাড়লো তো ছাই। পথের ধুলো দিয়ে প্রায় স্নান করিয়ে দিলে। আমি বললাম—"আর আমায় কিছু করবেনা তো হুরী?"

"আপনাকে বেঁধে দিলাম। কিন্তু ওরা রাতে টের পাবেই। অন্যের চোখ গায়ে পড়লে রাতে ওদের ফোস্কা হয়। তা থেকে ওরা জানতে পারে। সে-ফোস্কা রক্ত দিয়ে না-ধোয়া পর্যন্ত সারেনা। মানুষটাকে মেরে তার রক্ত চাই।"

"বলো কি! আমায় মেরে ফেলবে, রক্ত নেবে?"

"আমি না বেঁধে দিলে নির্ঘাৎ নিতো।"

"তবে ফোস্কার জ্বলুনি? তার কি হবে?"

"ও নেবে রক্ত কোথাও থেকে, তোমার মনে যার কথা এখন বেশী তার খুব বিপদ।"

"তবে একটা ওষুধ দাও যাতে আমি সবার কথা ভুলে যাই।"

গম্ভীর হয়ে করীমখান্ বললে—"সে-মন্ত্র ব'লে দিয়েছি। তোমার আত্মীয়-পরিজন কারুর ক্ষতি হবেনা। কিন্তু কী যে হবে! ইয়া আল্ল রহমতুল্লা—মুশকিল্ আশান্!"

করীমখানের মতো সরলতা, মাঙ্গারামের মতো সহজ প্রীতি এই বনের আঁচলে ঢাকা ছিল কোন্ জন্মের পুণ্যফলে?

*

স্নান সেরে খেতে যাবো। ডাক্তার ডাকলো—"তোমার খাবার আমার ঘরে।"

"বলেছি তো তোমার ঘরে বসে privileged food খাবোনা।"

"বেশ, কোথায় খাবে বলো।"

করমচন্দ বাইরে রোদে সতরঞ্চির ওপর বসে। সেই বিচ্ছু চাকর ক্ষেমচন্দ তার খাবার জায়গা করে দিচ্ছে। বারোবার ডাকলে একবার সাড়া তিন সাড়ায় এক তাড়া, আঠারো তাড়ায় এক গ্লাস জল—এই রেটে জায়গা কর চলছিল। ওরই মধ্যে ডাক্তার আর আমি বসতেই ক্ষেমচন্দ্র একেবারে "অভী সাব্, দীজিয়ে সাব্" ব'লে কাজে লেগে গেলো। করমচন্দ বলতে লাগলো—"দেখুন তাবৎ গুণীজন, মহামতি আস্থানার দপ্তরের কুল্লে-ধন চাপরাসীর স্ত্রৈয়ানাপনা দেখুন। আচ্ছা, চলো বেটা সাতনম্বর যন্তর-মন্তরে একেবারে সর্ষে ছিটিয়ে ভূত ভাগাবো তোমার।" বিকট একটা শব্দ এলো সবাই একটু চম্‌কে উঠলাম। করমচন্দ হাসতে লাগলো। "ওই শব্দটি বেট ক্ষেমচন্দের নাসিকা-রূপী কর্নেট-সঞ্জাত।"

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বললে—"বটে! বটে! ওরে ক্ষেমচন্দ—শোন্ শোন্—"

ক্ষেমচন্দ এলো।

"করতো শব্দটা ফের।"

প্রভুর পরশ পেয়ে আহ্লাদে কুকুর চার পা তুলে পিঠের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে যেমন আদিখ্যেতা দেখায় তেমনি গড়াগড়ি খেলো ক্ষেমচন্দ।

"যা ব্যাটা, রুটি আন্"—বললে করমচন্দ। আবার সেই শব্দ করে ও ছুটে আনতে গেল রুটি।

আর যেন খাওয়া যায়না এ-খাদ্য। ডাক্তার বললে—"দৈ আছে আজ। ভাবনা কি—রাজভোগ।"

কাগজ-মোড়া চারটি বড়ো বড়ো চপ্ বেরুলো ডাক্তারের পকেট থেকে।

করমচন্দ চিৎকার করে উঠলো—"তোবা তোবা!"

ডাক্তার আশ্বাসবাণী দিল—"জাত যাবেনা, করমচন্দ। বৈদিক মাংস। বন্য-বরাহ। সকালে রুগী দেখতে গিয়েছিলাম, দিয়ে দিলো। দুটো দিচ্ছিল। তারপর ভাবলাম একটি বৈদিক ব্রাহ্মণ আরও আছে।" ব'লেই আমার পাতে। খুব নরম ও সুস্বাদু মাংস। বোধকরি সব মাংসের মধ্যেই বন্যবরাহ সুকোমল ও সুস্বাদু।

হঠাৎ শুনি বিক্রম আর গোপী চলে যাবে। গোপীর এক মাসী, যিনি মা-মরা গোপীকে মা হয়েই মানুষ করেছেন, তাঁর একমাত্র ছেলেটি মারা গেছে। তাঁর মাথা-খারাপের মতো হয়েছে।

আর, বিক্রমের পরীক্ষার ফল বার হয়নি, তার খাতায় কী সব গণ্ডগোল হয়েছে; সে-সম্বন্ধে তার বাবা পত্রপাঠ University-র Registrar-এর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

ওরা চলে যাবার পর ওপরের তাঁবুতে আমার একা থাকার কোনো মানে হয়না। আমি নীচে হল্‌ঘরে আফিসের করমচন্দজী, বুদ্ধু, ভবানন্দ, রাখাল আর ক্ষেমচন্দের দলে ঢুকে গেলাম।

শেষমুহূর্তে গোপী ভেঙে পড়লো। "অনেক গুণ্ডামি করেছি মাস্টারসাব্, আমায় ক্ষমা করবেন। ছাত্রের স্থানে থেকেও এতো স্বাধীনতা পেয়েছি, এতো বন্ধুত্ব পেয়েছি, খেলার সাথীর মতো থেকেও এতো জেনেছি শিখেছি যে, জীবনে খাদরালা ভুললেও আপনাকে ভুলবনা। আমায় বলুন আপনি ক্ষমা করলেন।"

"কেন গোপী? কী তোমার অপরাধ?"

"তা তো জানিনা। তবু মনে হয় আপনার সান্নিধ্যের অনেক সুযোগ নিয়েছি। আমি খাদরালা থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছি—শিক্ষক ও শিষ্য যদি একসঙ্গে থাকে তবেই শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হয়। পশ্চিমী প্রথায় স্কুল-কলেজের শিক্ষা একেবারেই fake, ফাঁকিবাজি।"

বিক্রম বললো—"আরেকটা শিক্ষা পেলাম। পড়াশুনা করার সত্যিকার ইচ্ছা যার আছে সে পাস করার পরেই পড়তে পায়। তার আগে কেবল সাঁতারই কাটে—ডাঙাও পায়না, তলাও ছোঁয়না।"

কাজেই উনিশ তারিখ সকালটা আমার খুব মনোরম সকাল ছিলনা। বারোটা অবধি কাজ ঠিকই চললো। একটায় ওরা চলে গেল। যাবার আগে গোপী বললো—"একটা অনুরোধ করবো, রাখবেন বলুন?"

"অনুরোধ রাখায় সর্বদাই প্রীতি। বলো কী?"

"মৃত্যু এলেও জীবন চলবে। বিবাহ আমার হবেই। ভাই মরে গেলো; এখন আরও তাড়াতাড়িই হবে হয়তো। এই বিয়েতে আপনি যাবেন। আমার স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে আপনাকে আশীর্বাদ করতে হবে।"

বাঙালীর রক্ত গায়ে। চোখে জল ঝট্‌পট্ এসে পড়ে। আমি গোপীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম—"পাক্কা চুরাঁদিয়া তুমি! একথা দেওয়া যায়না। আমি কাজের দাস।"

বিক্রম—যা য়ুপীর লোকেরা করেনা—পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো।

*

এখন নীচের ঘর। কাজ দ্রুত শেষ হচ্ছে। ডিনামাইটের দল এসে চাঙড় ওড়াতে লেগে গিয়েছে। এ কাজ বড়ো ভয়ানক। পাথরের মধ্যে ছেঁদা করে ডিনামাইট ভ'রে পলিতা-সংযোগে আগুন দিয়ে এসে পালিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। দশ মিনিটের মধ্যে বিরাট শব্দ করে পাহাড় ফেটে ধ্বস্ নামে। তখন সেই ধ্বস্ পরিষ্কার করে পথ সোজা আর চওড়া করতে হয়। অনেকগুলো ডিনামাইট-গ্যাং একসঙ্গে কাজে হাত দিলো। তিনদিনের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে।

বিকেলে চায়ের সময় তখন। আজ বাল্‌জী এক বাক্স পীচ আর চেরী আনিয়েছে। এদিকে গরম-গরম পকোড়া ভেজেছে। ছেলেরা ঝপাঝপ্ কিছু খরচ করে ফেললো।

"বারে বাঃ, চুরি করে খাওয়া চুমোর মতো টস্‌টসে চেরী কোথায় পেলে ধরা-পড়ে-যাওয়া-আদম-মেজাজী মাস্টার?"

"বহু আলঙ্কারিক ত্রুটি তোমার বাক্যে।"

"দুর্বাক্য হিসাবে খাঁটী।"

"কুবাক্যও বটে রে পাপিষ্ঠ।"

"হায়, আমার নিতান্ত ভয়, এ-পাপে হয়তো স্বর্গে গিয়ে আমায় পচতে হবে। তা থেকে আর আমার রেহাই নেই।"

"তোমার স্বর্গ? কী পুণ্যে?"

"তোমার মতো নিষ্কাম, নির্লোভ, নিরহঙ্কার পণ্ডিতের বাক্য-মন্দাকিনী-পূত হবার পর আর কি নরকে আমায় কেউ স্থান দেবে?"

"না দিলো, স্বর্গে তোমার ভয় কি? মদ পাবে তো, আর স্বর্গেও 'বাগী' আছে।"

"ভুলছো কেন? স্বর্গে যে তোমার আসন বাঁধা। আর তুমি যেখানে, সেখানে মদ হয়ে যাবে গঙ্গাজলের মতো বিধবার পানীয়। 'বাগী' হয়ে যাবে নৈমিষারণ্যের মতো নেহাত হাই-তোলা নির্জনতা। নরকে নিগ্রহ আমার সইবে, কিন্তু স্বর্গে তোমার বক্তৃতা আমার সইবেনা। তোমার যা পুণ্যফল তাতে ব্রহ্মাই হয়তো তোমায় তাঁর তিনটে মাথা কিছুদিন ধার দিয়ে দেবেন। বুড়োকে কম বকতে হয়নি তো ঐ চার মুখে। তা ছাড়া শোবার কষ্ট। ক'দিন তবু মাথায় বালিশ দিয়ে ঘুমুতে পারবে। তোমার যদি চারটে মুখ হয়; ওঃ বাপ্, তার চেয়ে কুম্ভীপাক তো নেহাত air-conditioned 'Metro'-র দুপুরবেলা হে!"

"আজ তো খোশ-মেজাজে আছো দেখছি। চেরীগুলোর চেহারা দেখেই নেশা লাগলো বুঝি?"

"যে চেরী খেলে পেটে যায় তা চেরী নয়, মাস্টার; আসল চেরী চুষলে রস ওঠে গিয়ে মাথায়। এ শাস্তর পড়তে চাও, বাগী ঘুরে এসো।"

"তুমি একাই বাগীর আরক। যেতে হবেনা কোথাও।"

"শালগ্রামে বিষ্ণুদর্শন চাড্ডিখানি কথা নয় হে ফাজিল! তেমন ভক্তি আছে?"

দু'-হাত তুলে বললাম—"অচলা। এ মহিমা দেখিনি, দেখবোনা।"

ডাক্তার বললে—"আমেন, শুভমস্তু।"

নির্মল এসে বললে—"চলুন, দাদা।"

ডাক্তার হাসি মটুকে বললে—"*Come thou sweet maid,*···তোমাদের শেলী না ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ,—যাচ্ছ বুঝি গল্প মারতে?"

নির্মল বললে—"আপনি হয়তো জানেন না, ভট্টচায্যিমশায় কত সুন্দর গল্প লেখেন।"

"ভাগ্যিস্ জানিনা। নৈলে তোমাদের মতো ধরে ধরে শোনাতো।"

নির্মল অপ্রস্তুত হয়ে বললো—"শোনালেই বা। এমন কী আর কাজে আপনি ব্যস্ত?"

"ওহে বালক, শুনে রাখো। শোনা ও শেখা খুব বড়ো কথা নয়। ভারি কঠিন কাজ না-শুনে, না-শিখে থাকা। এ সাধনা না করলে এর কঠিনতা বোঝা যায়না। কিছু শুনিনা, কিছু করিনা,—কেবল সুরা আর সাকি নিয়ে আছি, এ কে পারে?"

"সাকি আবার কেন?"

"বাদ দিই কি করে?"

"মানে?"

"মানে তো জানিনা। আমায় দেখিয়ে বললো, মূর্তিমান মানে ওইতো সামনে বসে। লাল পেন্সিলে ঢ্যারা কাটো আর মানে বোঝো। আমি শুধু ব'লেই যাই—মানে করার ধার ধারিনা।"

ডাক্তারকে আমার ভালো লাগে এই অপূর্ব পরিহাস-প্রোজ্জ্বল প্রজল্পিতগুলির দীপ্তির জন্য। ডাক্তার যদি মদ না খেতো কতবড়ো ক্ষতি হোতো আমার, আমি বুঝি। মদ-খেকো গুণীদের সংস্পর্শে যাঁরা আসেননি তাঁরা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু মদ যদি ডাক্তারের মতো মানুষের মনের দোরে হানা দিতে সক্ষম হয়, মদ দেবো ডাক্তারকে।

নির্মল সেই কথাই বলতে লাগলো—"এতো ভালো লাগে ওকে? অখাদ্য সীনিক্!"

"জ্ঞানীমাত্রেই সীনিক্। বেশী জানাশুনা থাকলেই একটা নির্বেদ আসে। নির্বেদের একটা রূপ সীনিসিজম্। জগতের মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে শূন্য অঙ্ক যারা পায় তারাই দশগুণে চলে যায় চট্‌পট্। এক-কড়ি দু'কড়ি গুণে গুণে কড়ির পাহাড় করে তোলা জ্ঞান নয়। প্রকৃত জ্ঞান বলে—'আমি জানিনা'—**Knowledge is acquired through subtractions from it : to add to what is known is to increase the burden.**"

দিলীপ বললে—"ফ্যাসাদ তো ঐখানেই। শিখি কি না-শিখি। To learn or not to learn—"

হেসে বলি—"আমার বক্তব্য তোমাদের বোঝাতে গেলে সাহিত্য হবেনা। ডাক্তারের সীনিসিজ্‌মের কথা হচ্ছিল। তাই বলতে চাই, অনেক জানার ফলে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' মহাবাক্যের অর্থ উপলব্ধি হয়। তখন চলে জ্ঞান-বর্জনের পালা। বোধনের পর বিসর্জনের পালা। It is much more difficult to unlearn than to learn, এ কথা learn করার পর বোঝা যায়। সেই কথাই ডাক্তার বলছিলো। তাই ওর জ্ঞানবুদ্ধির তারিফ করি।"

বুদ্ধু টিপ্পনী কাটলো—"আপনি ওকে বাড়িয়ে তুলেছেন বেশী।"

ভবানন্দেরও সেই মত।

আমি তখন লাচার হয়ে বললাম—"তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী তোমরা বাড়িয়েছো আমায়। আমি ভেবে পাইনা ডাক্তারের মতো লোককে কাছে পেয়ে আমায় তোমরা আঁকড়ালে কেন। তবে একটা কথা ঠিক, ডাক্তার বসে বসে সুশীল বালকের মতো গল্প শুনতোনা।"

নির্মল বললো—"তার কারণ ও সুশীলও নয়, বালকও নয়। Frustrated epicure in darkness!"

দিলীপ জুড়ে দিলো—"Having burnt all his candles at both ends."

আমি মৃদু হাসি আর বলি—"লোকটা অনুপস্থিত তাই ব'লে যাচ্ছো। থাকলে কত উপভোগ করতো!"

ভবানন্দ বলে—"বলেন কি! এসব কথা সে উপভোগ করতো?"

"ওই তো মাতাল-জ্ঞানী আর জ্ঞানী-মাতালের গুণ! ডাক্তারের ভালো লাগে নিজের গালাগাল শুনতে। আমি ব'লে দেখেছি। গালাগাল সব সময়ে অপমানকর নয়, বিশেষ করে জ্ঞানীর কাছে।"

রাখাল বললো—"আজ আর পড়া হবেনা?"

অনেকক্ষণ সাহিত্যচর্চা হোলো। আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছিলো। হঠাৎ কোথা থেকে রাজ্যের রং এসে লেগেছে বরফের চূড়ায়। তারই প্রভায় গিয়েও যায়না রং আকাশের গাল থেকে। গাছগুলো হাল্‌কা বাতাসের নাড়া পেয়ে যেন গান গেয়ে উঠেছে।

রাখাল বললে—"ভারি মজা তো! বেশ সন্ধ্যা হয়ে এসেছিলো হঠাৎ কেমন সব আলোয় আলো হয়ে গেল।"

দিলীপ বললে—"সমস্ত শৈলচূড়ায় রঙের বাহার দেখুন। লাল, সোনা আর বেগ্নী! কতো বিভ্রম। চমক্দার, অপূর্ব ;—মহাকবি এখানে এলে এ গান গাইতেন। এ রূপের বর্ণনা গল্পে নেই।"

সত্যিই হঠাৎ খাদরালা যেন স্বর্গরাজ্য হয়ে গেল। আমি বললাম—" 'বহুযুগের ওপার হতে' এক মহাকবি এর কথা বলে গেছেন, দিলীপ। শুনবে?

'যত্রাপ্সরো বিভ্রমমণ্ডনানাং সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি
বলাহকচ্ছেদ বিভক্তরাগামকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্।'

শৈলচূড়ায় রং লেগেছে হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা
সেই আলোতে গেরুয়া-মাখা রাঙা মেঘের খেলা
অকাল সন্ধ্যা আকাশ ছেয়ে
অপ্সরী কোন্ দেখলে চেয়ে
সন্ধ্যা বসন রূপ প্রসাধন আগেই নিচ্ছে সেরে
অকাল সন্ধ্যা মায়ার কাছে জিতলো তারা হেরে।

...চলো একটা জায়গায় চলি, এসময়ে ভালো লাগবে।"

মিনিট দশের মধ্যে, খাদরালার পাহাড়ের পেছন দিয়ে সরু পথটা পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেখানটায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, যে পথের শেষ-প্রান্তে সেই বাহ্লি গ্রাম, সেই ঘনান্ধকার পথ ধরলাম। উদ্দেশ্য এই প্রায়ান্ধকার প্রদোষছায়ায় সেই বনস্থলীর শোভাটি কেমন দেখি। ওরা তো জানতোনা পথের ভয়াবহতা। ওরা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

গভীর বনের মধ্যে দিয়ে পচা-পাতা-ঢাকা সরু পায়ে-হাঁটা দাগ ফিতের মতো পাহাড়ে গায়ে গায়ে নেমে গেছে। সেই শ্যামল বনভূমি, যা আমায় চমকিত করেছিল। এখন তা নিবিড় ভয়াবহ।

"এ কোথায় আনলেন?" বুদ্ধু বলে।

রাখাল বলে—"বেশীদূর যাবোনা।"

এমন সময়ে হঠাৎ ঘোর অন্ধকার হয়ে এলো আকাশ এবং দেখতে-না-দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। এর আগে যে-ক'দিন বৃষ্টি হয়েছে, এ বৃষ্টির তুলনায় সে কিছু নয়। পাইন ভেদ করে জল তো পড়তে লাগলোই,

পাহাড়ের গা বেয়ে প্রবল বেগে জল পাতা, ময়লা মাটী সব এসে গায়ে শুধু জড়িয়ে ধরলো তাই নয়, পদক্ষেপকে বিপন্ন করে তুললো। আর যেন চলা যায়না। কী যে করা যায়!

"ফেরো, ফেরো, ফেরো! ছোটো ওপরপানে।"

"সাবধান, সাবধান! তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পা হোড়কোনা!"

"আরে আরে, এ কী গাছ! বাঃ, কী সুন্দর পাতা!"

"দেখুন দেখুন, কী চমৎকার নীল রঙের ফুল!"

ওরা খালি "এটা নেবো", "ওটা নেবো" ব'লে হাত বাড়ায়। আমি বলি "থামো, থামো"—একেবারে সব ল্যাপা-পোঁছা অন্ধকার হয়ে যাবার আগে সেই গুহাটার মুখে আসতে হবে, যেখানে সেই মা-হারা মেয়েটাকে দেখেছিলাম। আবরণ আছে, আগুন আছে।

পেয়ে গেলাম গুহাটা। ওরা দেখতে পায়নি। আমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে লাগলাম।

কী লজ্জার কথা!

তুত্তা আর তার স্বামী। ওরা এই বর্ষায় আলিঙ্গন-বদ্ধ। অতর্কিত আক্রমণে সন্ত্রস্ত। আমি গুহার মুখে এসে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালাম। দলটা তখনও উঠছে।

যেন কিছু হয়নি, এমনি ভান করে বলতে লাগলাম—"এসো, সাবধানে উঠে এসো।" না ফিরেই বললাম—"তুত্তা, জ্বাল্ তো আগুনটা জোরে। বড্ড ভিজে গেছি!"

জানলাম তুত্তা আর তার স্বামী পিরথী আজ এখানেই রাত কাটাবে। বেশ জীবন ওদের। স্বামী সিমলায় কাজ করে। হঠাৎ ক'দিন খাদরালার জঙ্গলে ডিনামাইটের গ্যাঙে এসেছে। ওদিকে ক্যাম্পে মেয়ে থাকবেনা। এদিকে এইসময়টায় ওরা একা থাকতে চায়না। "কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনী-জনে কিং পুনর্দূর সংস্থে?" মনে হোলো কালিদাসের কিন্নর-মিথুনের কথা। এরাই সেই কিন্নর-জাতি।

নির্মল আর দিলীপ ওদের দেখে সচকিত।

"স্যার, এদের শান্ত বিশ্রামে বাধা দিলাম। আশ্রমপীড়া হোলো।"

তুত্তা ধরা পড়ে গেছে। তুত্তা যে আমায় জানতো। তাই ওর লজ্জা।

কিন্তু পিরৃথীর তা নয়। সহজভাবেই আগুনে কাঠ ফেলে ও সাদরে জানালো—"আসুন—বসুন ; এঃ, বড্ড ভিজে গেছেন তো সবাই। পাহাড়ী বর্ষা এই-রকমই।"

তুক্তার দিকে দিলীপ বার বার চাইছে।

বুদ্ধু বললো—"দুটিতে মিলে দিব্যি বাসা বাঁধছিলো। আমরা এসে উৎপাত লাগালাম।"

রাখাল বললে—"দাদা, চলুন। লাগুক বৃষ্টি। একটু নয় ভিজবো।"

"রাতেও এখানে থাকবে ওরা ?" দিলীপ স্বপ্নালু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে। ও অনেক কিছু ভাবছে এর মধ্যেই। "রাতে অন্ধকার হবেনা ?"

"রজনী আঁধার গুহার ভিতরে কালো
সেথায় কে বলো জ্বালাইয়া দিবে আলো—
বনিতা দোসর যুবা বনেচর সুখে
ঢলিয়া পড়েছে গিরিললনার বুকে ;
বন-বিটপীর কতো ওষধির ভাস
উজ্জ্বল করে গুহামুখ বারোমাস
সেই আলোতেই বাসর তাদের আলা
তৈলবিহীন সুরত-প্রদীপ-জ্বালা ॥"

"আপনার কবিতা ?" নির্মল জিজ্ঞাসা করে।

হাসলাম।

"এখুনি রচনা করলেন ?" রাখাল বলে।

"না, কালিদাসের কথা :

'বনেচরাণাং বনিতা সখানাং দরীগৃহোত্সঙ্গ নিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়োং রজন্যামতৈলপূরা সুরতপ্রদীপাঃ ॥' "

আমি তুক্তাকে বললাম—"টুপী-সেলায়ের কাজ করছিস্ বুঝি গুহায় বসে ? হ্যাঁরে তুক্তা ?"

তুক্তা তো লজ্জায় অন্ধকারে মিশে গিয়ে হাসতে লাগলো। শান্ত মিষ্টি হাসি। সে-হাসি সর্বাঙ্গ দিয়ে, অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায়।

পিরৃথীকে দেখে বললাম—"তুমি তো জাননা ভাই, ঐ তুক্তা আমার বোন্। আমি একদিন সিগারেটের অভাবে মরছিলাম। কত আদর করে কত কষ্ট

করে আমায় ও সিগারেট যোগাড় করে দিয়েছে, চা খাইয়েছে। তোমার কথা ওর কাছেই প্রথম শুনি ; তারপর শুনি মাঙ্গারামের কাছে। মাঙ্গারামের সঙ্গেই তো শোও রাতে, না এমনিধারাই কাটে গুহার গুহায় ?"

পিরৃথী বললো—"তোমার কথা মাঙ্গারামের কাছে কতো শুনেছি। তোমার পাগলামি আর ঘোড়ায় চড়ার গল্প। আজই গুহায় এসে আট্‌কা পড়েছিলাম। বৃষ্টি দেখে অবশ্য ভেবেছিলাম যে আজ রাতটা এখানেই কাটাবো।"

আমি বললাম—"তাই কাটাও, আমরা যাচ্ছি।"

"কিন্তু তুত্তাকে যে ফিরতেই হবে। নৈলে ঐ হোটেলওয়ালা বড়ো খোঁজ লাগাবে। ও তো ব'লে আসেনি। মাঙ্গারামও ভাববে অবশ্য—কিন্তু ততটা নয়।"

ওরা তখন নামতে স্বরু করেছে। আমি বললাম কৌতুকভরে—"চল্ তুত্তা, তোকে তাহলে নিয়েই যাই।..."

গুহার ভেতরটা থম্‌থমে।

তারপরেই আমি হো-হো করে হেসে ফেললাম। বললাম পিরৃথীকে—"থাক্ ও। তুমিও থাকো। আমি গিয়ে ব'লে দেবো। আজ এই গুহাতেই রাত কাটিয়ে দাও তোমরা।"

সামান্য একটু লঘু পরিহাসের মধ্য দিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় সেই বিদায় নিয়েছিলাম ওদের কাছ থেকে। আজ মনে হয় বিধাতাপুরুষের অসীম আশীর্বাদ ছিল তাই সেদিন অমন রঙীন মনে খুশীতে উছ্‌লে ওদের ঐভাবে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে এসেছিলাম। আজও চোখে জল ভরে আসে সেদিনকার আলিঙ্গনবদ্ধ তুত্তা আর পিরৃথীর চেহারা মনে করতে। আসার সময় গুহামুখে ওদের সেই সবেদন চাহনির কথা ভাবতে।

সেদিন কি আমি জানতাম তুত্তাকে কোন্ স্বর্গের সম্রাজ্ঞী করে দিয়ে এলাম ঐ একটি রাত্রির জন্য ? তুত্তা কি জানতো একুশ তারিখ সন্ধ্যায় তার পিরৃথী তার বুক থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যাবে ? তাই পরের দিনের ঘটনায় চলে আসি। কিন্তু তা যে আসা যায়না। রাতের কয়েকটা ঘণ্টার ঘটনা বলার আছে, বলার আছে তার পরের দিনের একটা কোলাহলমুখর পরিচ্ছেদ। বলার আছে কয়েকটা ভূতের গল্প, এবং সেই ভূতের গল্পকে আশ্রয় করে এক বিচিত্র

ঘটনা। অল্পের মধ্যে সে-কথাগুলোও এখানেই সেরে যেতে হবে। তারপর তুত্তা আর পিরথীর সেই হৃদয়ভাঙা কাহিনী।

যখন ক্যাম্পে ফিরেছি তখন রাত নেমেছে। বর্ষা কমলেও একেবারে ছাড়েনি। ভিজে ঢোল। জামা-কাপড় বদলাচ্ছি সবাই। ক্ষেমচন্দ যতো হাসে আমাদের অবস্থা দেখে, করমচন্দ তত বকাঝকা করে। "ছোঁড়াদের সাথে থেকে থেকে আপনাকেও ভূতে পেয়েছে। কি করতে এই দুর্ভোগ বলুন তো!"

নির্মল বললে—"দাদা, এসময় চা দরকার।"

বুদ্ধু বললে—"আর কিছু পকৌড়া। কিন্তু কাকেই বা বলবো; দাদা যা

সবাই একচোট হাসা গেলো।

ক্ষেমচন্দ হঠাৎ একটা শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অল্প পরে উঠে এলো ক্যাম্পের নীচে নতুন যে-লোকটা শেড্ করে জিলিপি আর পকৌড়ার দোকান করেছে।

এসেই সেলাম।

আমি বলি—"কি রে!"

লোকটা জবাব দেয়—"ক্ষেমচন্দ বললে আপনি ডাকছেন।"

আবার একটা শব্দ তুলে ক্ষেমচন্দ চম্পট।

"দাদা, আজ কিছু খসলো আপনার।"

এবং গরম গরম পেঁয়াজের পকৌড়ার অর্ডার নিয়েই লোকটা চলে গেল।

দোরের কাছে দাঁড়িয়ে তুস্সীরাম।

"তোর কি খবর? ওপরে জলের ওখানে নেই তুই? আগুনের খবরদারি করছিস্না? এখানে কেন?"

"তোমার খবর জানতে। বর্ষা তো খুব জোর গেল!"

"হ্যাঁ, তা কি?"

"তোমার দুই ভাইও তো চলে গেছে।"

"কে? গোপী বিক্রম? ভাই-ই বটে! তা ওরা চলে গেছে তো কি? বল্না কী বলবি?"

লজ্জার মাথা খেয়ে অবশেষে তুস্সীরাম বললে—"চা খাবেনা? করে দিই? ভিজে গেছো যে!"

ওপথ থেকে তুস্‌সীরাম আমায় দেখেছে। বার বার চা খাই, ও তা জানে। এখন আমার চায়ের দরকার মনে ভেবে এই জলে নেমে এসেছে।

"চা খাবো তো, এরা করে দেবে। তুই কেন ভিজতে ভিজতে এলি বল্ তো। একটা জানোয়ার তুই। নে, গরম জল আন্।"

হাসতে হাসতে চা করতে লেগে গেল।

হঠাৎ ডাক্তার এসে ডেকে নিয়ে গেল।

"গুরুতর ব্যাপার!"

ঘরে বসে আস্থানা এবং বাল্‌জী।

বৃষ্টিতে পথ বন্ধ। সব্‌জি আসেনি। খচ্চর এসে পৌঁছায়নি। আজ রাত কোনওমতে খালি ছানা আর আলু দিয়ে চলে যাবে। আটাও আছে। কাল আটা অল্প এবং দাল। কিছুই নেই। খাদ্যসঙ্কট।

এখানে এতোগুলো প্রাণী নির্ভর করে আছে খচ্চরবাহিত খাদ্য-সরবরাহের ওপর। গ্রামে গ্রামে গম আটা পাওয়া যায়, কিন্তু বিক্রী করেনা কেউ। তা ছাড়া বাল্‌জী কনট্রাক্ট্ নিয়েছে। ওর দায়। সব্‌জি একেবারে দুর্লভ।

আমি ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে পারছিলাম না; সেটা ডাক্তার বুঝেছিলো।

আস্থানা বলে—"উপায় কী!"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—"শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করুন। আজ আলু-ছানার ডাল্‌না এবং রুটির মতো জঘন্য খাবার খেয়েই কাটানো যাক্।"

ডাক্তার নাড়ীর খবর রাখে। বললে—"চিনি নেই, মাস্টার?"

আমি বললাম—"তোমার বোতল দিয়ে তোমারই মাথা পাঠাবো ফের একথা যদি মুখে আনো।"

বাল্‌জী আর আস্থানা হেসে ফেললে। বাল্‌জী বললে—"সত্যি এমন চা-প্রিয় লোক খুব কম দেখেছি।"

মোটের ওপর বাল্‌জীকে আমরা কথা দিলাম যে, ছেলেদের মধ্যে কোনও 'প্যানিক্' হতে দেবোনা। কাল যদি খচ্চর না পৌঁছায় তখন ব্যবস্থা করা যাবে।

তাই করতে হয়েছিল। খচ্চর পৌঁছায়নি।

ডাক্তার বলে—"ভূতের কথা শুনেছো ?"

"কিরকম ?"

"কেন, করমচন্দজী বলেননি ?"

"না তো !"

'ঐ ডাক্‌বাংলোয়, যেখানে রাতে শোবে, সেখানে ভূত আছে একটা। রাতে এসে দোরে ধাক্কা দেয়।"

হাসতে লাগলাম।

ডাক্তার ম্যম্-এর বই হাতে করে বললে—"ম্যম্ ছুঁয়ে বলছি ব্যাপারটা বেশ মজার। রাতে লক্ষ্য করে দেখো।"

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। ঐ অন্ধকারে পিছলপথে খাদরালা-হোটেলে যেতে হবে। সঙ্গে চললো রাখাল আর নির্মল।

"তোমরা কেন কষ্ট করবে ?"

"চলুন না, হোটেলে যাচ্ছেন; কিছু একটা হবেই।"

লাফিয়ে ওঠে বুদ্ধু—"আম্মো— !"

হোটেলে এসে অতিপরিচিত গন্ধে বাঙালী শ্রীমান্‌রা একেবারে 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' মুদ্রায় ঘিরে বসলো হোটেলের রসুইকর-প্রোপ্রাইটারকে।

"কী মাছ বাওয়া ?"

"মাছ এনে আমাদের ফাঁকি দিচ্ছো ? পরজন্মে স্বর্গে গিয়ে কলেরায় ভুগবে যে বাওয়া !"

"একেবারে পৈতে-ছেঁড়া মজুন্দার আমরা। বঞ্চিত কোরোনা।"

"কিন্তু জ্যেয়্‌দা নেই যে বাবু !"

বুদ্ধু চেঁচিয়ে বাংলায় বললে—"সুমুন্দি তুমি তো আছো। কাটবো, চাপাবো, ভাজবো, খাবো।"

কিন্তু লোকটা গিরিমচ্ছি ভাজা দিলে প্রত্যেককে চারখানা করে। আর বললে—"দু'দিন আগে আনা মাছ আছে—লম্বা 'ভাম' মাছ ( আমরা বাণ মাছ বলি ) যদি খান্ তো···"

"দু'দিনের মাছ ? তাজা আছে ?"

সেই লম্বা টেবিলের কাছে গেলাম। কোণের দিকে খুঁটির দিকে ঝোলানো আছে—বোধ হোলো অতি নোংরা কালো একটা চট্। তা থেকে বিশ্রী একটা

গন্ধ বেরুচ্ছে। যেই কোণ ঘেঁষে বসতে গেছি অমনি 'ভন্‌ন্‌' শব্দ করে চট্‌খানা উড়ে গেল! ঝুলে রইলো একটা পাঁঠার আধখানা!

সর্বনাশ! ওই মাংসের তালটার গায়ে রাশি রাশি মাছি বসে কালোয় কালো করে রেখেছিলো! সেই মাছির কাছারিকেই চট্ ব'লে ভুল করছিলাম। বিস্মিত হলাম এই নারকীয় নোংরামি চাক্ষুষ করে।

মাছি! এতো মাছি বসেছিলো? "কবেকার মাংস?"

"তাজা; এইতো পাঁচদিন হোলো মারা হয়েছে বক্‌রাটা। আর তিন-চারদিনেই শেষ হয়ে যাবে। ক'টাই বা লোক আসছে খেতে। দেবো আপনাদের দু'-টুকরো পুড়িয়ে?"

"না বাপু, মাছ-ই ভালো!"

"আর এই জিনিসটা!"

একটা ডালায় কুণ্ডলীপাকানো গোল সর্পাকৃতি কিছু। কেরোসিন-ল্যাম্পের আলোয় স্পষ্ট ধরা পড়েনা জিনিসটা কী।

"কী ও?" এখন স্বরে আতঙ্ক এসে গেছে। এরা কী-না খায়!

ও বোধহয় সেই আতঙ্ক ধরে ফেলেছে। রহস্য করে বললো—"পাহাড়ী মাছ তো খাচ্ছো; এ পাহাড়ী সাপ। সাপ-ভাজা খাও। ভালো।"

ধরা পড়ে গেছি। সত্যই সাপ মনে করে সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছি। চীনে সাপ খায় জানতাম। অখাদ্য তো নয়; হয়তো এরাও খায়।

তারপরেই যা বোঝালো তাতে স্পষ্ট হোলো যে, একটা লম্বা সসেজ করে রেখেছে পাঁঠাটার অন্ত্রনালী দিয়ে। যখন যেমন যতটা ইচ্ছে—কাটছে, ভাজছে, খাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে।

"দেবো? খুব ভালো। খাও—"

শীতের দেশে পচেনা সহজে, তাই এরা এতো সহজে রেখে রেখে খেতে পারে। আমাদের সংস্কার—বাসী মাংস শুনলেই গা ঘিনিয়ে ওঠে। তবু বললাম—"কি রাখাল, চলবে নাকি?"

ওরা খেলো সসেজ। ভালোই বললো। আমি কেবল মাছ-ভাজা খেয়েই ফিরলাম। রাতে খেতে হবে যে।

রাতের খাওয়া মিটে গেল আগে-ভাগেই। তারপর চললো গান আর কাব্য নিয়ে আসর।

আমরা ক'টি বাঙালী ঐ ডাকবাংলোর ঘরের কাঠের মেঝের ওপর পর পর বিছানা পেতে নিয়েছি। চুল্লীতে কাঠের আগুন থেকে ভিজে কাঠ পোড়ার একটা শব্দ আসছে। গায়ে লেপ টানা। বুদ্ধু হারমোনিয়ম বাগিয়ে গান গাইছে পর পর। আমি খানিকক্ষণ ডায়েরি লিখে তারপর গানের কথা আর সুরের মধ্যে আপেক্ষিক মর্যাদা নিয়ে আলোচনা চালাতে লাগলাম। নির্মল, রাখাল আর দিলীপ বাংলাদেশের ছেলে।

বাকী সব ঘুমিয়ে পড়েছে একে একে। নির্মলও শুয়ে পড়েছে। আমি আরও ঘণ্টাখানেক হয়তো পড়েছি। ঘুম এসে গেছে; শুয়ে পড়েছি। আলোটা নিবিয়ে দিলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানিনা। বুদ্ধু ডাকলে—"দাদা, শুনছেন!"

একটা করুণ শব্দ, এবং জানালাটায় ছোটো ছোটো টোকা নয়, দ্রুত স্পন্দন, যেমন ভূমিকম্পে দরজা-জানালা থেকে শব্দ হয়। কিন্তু ঘরটার যেদিকটা বাইরে বেরুবার রাস্তা সেদিকটায় একটা দরজা, দুটো জানালা। জানালা দুটো ছোটো এবং মেঝে থেকে প্রায় চার ফুট উঁচুতে। জানালায় ছোটো জাল দেওয়া, যাতে পোকামাকড় না ঢুকতে পায়। বাইরে থেকে কাঠের খড়খড়ি, ভেতরে শার্সীর দরজা, মাঝে জাল।

সেই জানালা থেকে শব্দ আসছে।

আমি শুনে বললাম—"বাতাস।"

ওমা! রাখাল জেগে। ও বললে—"বাতাস হলে অন্য জানালাটা শব্দ করেনা কেন?"

বুদ্ধু বললে—"শার্সী আর খড়খড়ি দুটোই আঁটা। বাতাসও তেমন জোর নয়। এতো শব্দ হবে কেন?"

স্পষ্ট শোনা যায় কেউ যেন গুমিয়ে গুমিয়ে কাঁদছে। তার ওপর মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত স্পন্দন।

দরজা খুলে বাহিরে গেলাম। কোথাও কেউ নেই। খাদরালার জঙ্গল ওপরে দাঁড়িয়ে, সামনে প্রহরীর মতো জাগ্রত গিরিশৃঙ্গে তরঙ্গ;—আমার আর সেই তরঙ্গের মাঝের গভীর খাদের তলায় একটি গ্রাম তলিয়ে আছে নিবিড় শান্তির গহ্বরে—বাজেশাল। আকাশে তারা; পাইনের গাছে গাছে শিহরন, মাটির বুকে ঘুমিয়ে-পড়া মমতা।

যতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম শব্দটা নেই। আবার যেই দরজা বন্ধ করে শুয়েছি অমনি সেই শব্দ। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, শব্দ নেই। শুতেই শব্দ, সেই স্পন্দন।

সত্যিই একটু সচকিত হয়ে উঠলাম। অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বহু মতবাদ আছে। যাঁরা মানেন না তাঁরা অনেকটা না-ভেবে-চিন্তেই মানেন না। 'মানিনা' বলায় একটা সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'নেতি'বাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে একটা আপত্তি-ঘোষণা, একটা বিদ্রোহ। বাহবা পাবার সহজ উপায় সহজে বলা 'নেহি মানতা'। আবার যাঁরা মানেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে অনেক কিছু মন থেকে গড়ে নিয়ে মানেন, শুচিবাইগ্রস্তা মহিলা যেমন মেনে নেন: 'গুঁড়ো নুন খাবোনা; কি জানি বাবা, যদি হাড়ের গুঁড়ো থাকে; বলা তো যায়না, যা ভেজাল চলেছে!"

ব্যাপারটা কী, সত্যিই টের পাইনি শেষ অবধি। ডাক্তারও কোনও কারণ দেখাতে পারেনি। কিন্তু আজও আমার বিশ্বাস কোনও পারলৌকিক কারণ ওটাতে ছিলোনা; ছিলো কোনো নৈসর্গিক কারণই।

*

বিশে জুন সকালবেলায় পাহাড়ী-দলের কাজ অনেকক্ষণ তদ্বির করে একেবারে অন্যপ্রান্তে দুর্গাপ্রসাদদের দলে গিয়ে কাজ করছি। মির্জাপুর-দল আর রাজেন শুক্লার দল খুব কাজ করেছে। ওদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আজ থেকে ডিনামাইটের কাজ সুরু হয়ে গেছে। দুটো বাঁকের মাথায় ঝোলা-পুল-মতো করে রেলিং-দেওয়া চলছে। আজ জীপ্‌টাকে নিয়ে পরীক্ষা চললো। জীপ্‌টা দুর্গাপ্রসাদের দলের জায়গা অবধি গেলো। খুব খুশী আমরা সবাই।

যেসব মুরুব্বিরা প্রথমটায় মুখ বেঁকিয়ে পরিহাস উপহাস করেছিলেন এ-ক'দিন, আর তাঁদের দেখা নেই। মনের আনন্দে সবাইকে উৎসাহ দিয়ে ঘুরছি এ-দল ও-দল।

আস্থানা-সাহেবকে দেখলাম মন্ত্রী কেশকর-সাহেব এবং সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসছেন হাসতে হাসতে।

"কেমন কাজ চলছে?"

"চমৎকার!! আশাতীত!!"

"শুনুন, আজ বিকেলে একটা মীটিং করবো।"

"আবার মীটিং ?"

"হ্যাঁ, করতেই হবে। কংগ্রেস-পার্টি-পেপারে আমাদের প্রশংসা করে খবর বেরিয়েছে। সেটা জানাবো এবং গঠনমূলক কিছু কাজও করবো।"

আমি থমকে ভাবতে লাগলাম।

আস্থানা বুঝে বললো—"আপনি বৃথা চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক সামলে নিতে পারবো। দুর্গাপ্রসাদ প্রভৃতি দু'-চারটে লোককে একটু শিক্ষা না দিলে ওরা পরে বড়ো ক্ষতি করতে পারে।"

আমি বাধ্য হয়ে বললাম—"আস্থানা-সাহেব, ক্যাম্পের ডাইরেক্টর আপনি। যা বলবেন—হবে। তবে আমি কোনও পার্টির ক্যাম্প ব'লে আসিওনি, আসতামও না। এখানে কোনও পলিটিক্স চলা উচিত কিনা সে-বিষয়ে আমার মতামত না নিলেও আমি আমার কর্তব্য জানি। আমি কোনওরকম পলিটিক্সে থাকতে সম্পূর্ণ নারাজ। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতবাদ আমি কারুর ওপর চালাবো তো নাই-ই, এমনকি কারুর সঙ্গে আলোচনাও করবোনা। আপনাদের মীটিং সার্থক হোক সফল হোক, এই কামনা করি।"

কিন্তু তা হয়নি। যা হয়েছিল তার চেয়ে বিষণ্ণ পরিণতি আর হতে পারতোনা।

আগাগোড়া আস্থানাই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বিষয় ছিল—দেশে ফিরে গিয়ে প্রান্তে প্রান্তে 'খাদরালা দিবস' উদ্‌যাপন করার ব্যবস্থা করা, যাতে দেশবাসী জানতে পারে এই শিবিরে ছেলেরা এতদিনে কী করেছিল। এর সঙ্গে আস্থানার রীতি অনুযায়ী দুটি উৎকোচ প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হোলো। এক—নেহেরুর স্বাক্ষরিত নিজের ফটোগ্রাফ একখানা করে প্রতি ক্যাম্পারকে উপহার দেবেন, এবং রাষ্ট্রপতি-ভবনে ক্যাম্পারদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হবে।

কে একটি ছেলে প্রশ্ন তুললো—" 'খাদরালা দিবস' পালন কে করবে, কারা করবে, কোন্ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে করবে ?"

"অবশ্যই কংগ্রেস"—বললেন আস্থানা।

"অবশ্যই নয়"—বললে খান্না।

"অবশ্যই নয়"—বললে দুর্গাপ্রসাদ।

পরে বোঝা গেল শুক্লা, বাইসারিয়া, মালহোত্র প্রভৃতি ছেলেদের আগে থেকে

কেউ তাতিয়ে রেখেছিলো ঐ সভায় খান্না, দুর্গাপ্রসাদ, পটেল, পারীখ প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ জানাতে।

গোল বেধে উঠলো। হঠাৎ আস্থানা ব্যক্তিগতভাবে কী ব'লে ফেললেন দুর্গাপ্রসাদকে। অমনি একেবারে হৈ-হৈ, প্রায় হাতাহাতি। রক্ষা পায়না দল। দুর্গাপ্রসাদ ও খান্না ক্ষুব্ধ হয়ে পর পর অনেকগুলো উত্তপ্ত উক্তি করলো। কথার তরঙ্গ তখন সীমা ভাঙতে সুরু করেছে।

আমি ক্ষোভে হতাশায় যেন ভেঙে পড়লাম। কী সুর কোথায় তলিয়ে গেল! এখন রক্তারক্তি না হয়। ডাক্তারটা আপন মৌজে শুয়ে আছে; তাকে পাবার জো নেই। ছত্রসিং উপস্থিত। আমায় ধরেছে। এদিকে নির্মল বলছে—"কিছুতেই না। আপনার নিষেধ যখন মানেনি তখন যাক্ চুলোয়।"

বুড়ো ক্ষেমচন্দ্র তখন এসে জড়িয়ে ধরে বললে—"এখনও দেখবে এই দৃশ্য? এতো খাটলে, এতো করলে, এখন সব ভেসে যাবে? একি!" ভবানন্দ তখন মৃদুস্বরে বললো—"দাদা!"

এই ভবানন্দকে আস্থানা অপমানবিদ্ধ করেছিল। আজ ক্যাম্পের বদনাম হবার সময়ে ওর প্রাণ কেঁদে উঠেছে।

ডাকলাম প্রাণপণ জোরে—"দুর্গাপ্রসাদ, খান্না!"

হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো ওদের।

আস্থানাকে পাশে টেনে নিয়ে বললাম—"আপনার অসুস্থ শরীর নিয়ে এই মীটিং করা আপনার সাহসের পরিচয় হতে পারে, কিন্তু বিবেচনার পরিচয় নয়। আপনি যান। আরাম করুন। আমি এই মীটিং চালাবো। শুক্লা সভাপতি হোন, আমি বক্তৃতা করি। তারপর সকলে বক্তৃতার সুযোগ পাবে। আমার প্রথম প্রস্তাব যে এখানে একটা পোশাকী পার্লামেণ্ট ডাকা হোক। আমি স্পীকার, আস্থানা সভাপতি। সরকারী দলের মুখপাত্র হোন বাইসারিয়া আর বিপক্ষদলের মুখপাত্র হোন দুর্গাপ্রসাদ। দ্বিতীয় প্রস্তাব—আজ মুশায়রা এবং গানের জলসার ব্যবস্থায় আমারও গান হবে আপনারা অনুমোদন করুন।"

এমন একটা চিৎকার হৈ-হল্লা উঠলো যে, সমস্ত গ্লানি ভেসে গেল।

এর পর, পরের দিন থেকেই Parliamentary Elections-এর ইস্তাহার-প্রচার আরম্ভ হয়ে গেল।

রাতের জলসার ব্যবস্থা চললো অতঃপর।

সন্ধ্যার সময়টায় কেমন যেন মনটা ভারি হয়ে এলো। মীটিং-এর উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হয়তো। ভয় হোলো পাছে ভবানন্দ, নির্মল প্রভৃতি আজও এসে ধরে। আজ মন চাইছিলো ডাক্তারকে নিয়ে বসে গল্প করি। কিন্তু কোথায় ডাক্তার!

ক'দিন শ্রীমতীর চিঠি আসেনি। কি জানি ওদের কথা আজ অনেকবার মনে হতে লাগলো। তাই হয়তো মন ভারী। খাদরালা-হোটেল নয়, চা নয়, শুধু একা-একা পথচারণা। সেই জল খাবার জায়গাটা, দু'মাইল দূরে। তার নীচের সেই ঢলে-পড়া গাছের ছায়াটুকু। আকাশের বুকে গোধূলির সোনা। ওপারের গ্রামে এখন ঘরে ঘরে উনুন জ্বলছে। বোঝা বোঝা কাঠ নিয়ে পুরুষরা ফিরছে। নারীরা গোধন রক্ষা করছে। মক্কির রুটি সেঁকচে কেউ। সদ্য-আনা পশুর দেহ থেকে চামড়া ছাড়াচ্ছে। এপারে আমার মনে নেমে এসেছে একটা বিষণ্ণতা যার ভাষা নেই।

সহসা মনে পড়ে যায় কাশ্মীরী করীমখানের কথা: "তোমায় ঝেড়ে দিলাম; তুমি তো বাঁচবে; কিন্তু রক্ত..."—কেন বার বার কথাটা মনে আসে?

সংস্কার! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—পালপার্বণ—টোল-চতুষ্পাঠীর বাতাবরণে আবাল্য বর্ধিত। রক্তে সেই অমাবস্যা-পূর্ণিমা, 'বার্তাকু অভক্ষ্য' ও সুতহিবুকযোগের সংস্কার। অন্যদিকে ন্যায়-দর্শন-ব্যাকরণের নিগূঢ় বিচারের ক্ষুরধার বুদ্ধির ছটাও যুগ যুগ ধরে সংক্রামিত, প্রবাহিত এই ধমনীতে। বুঝেও বুঝিনা। যখন মায়া এসে ধরে তখন রিয়ালিস্ট ম্যাক্‌বেথ-ও ডাইনীর কথায় সব ভুলে যায়। কেন বার বার আমায় ঐ কাশ্মীরীটার কথায় ফিরে যেতে হচ্ছে!

জোর করে গান ধরি—

"আর রেখোনা আঁধারে আমায় দেখতে দাও
তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও।" ...

মাতিয়ে রাখে এই গানগুলি। কিছুদিন ধরে 'দেশ'-এ শ্রীযুক্ত অমলেন্দু দাশগুপ্তের* একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ বেরুচ্ছিল 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ'। অমলেন্দু-বাবুর সেই প্রবন্ধের উপযুক্ত মর্যাদা একদিন বাংলাদেশের চিন্তাশীল জনসাধারণ দেবেন। কবিকে এই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখার সৎসাহস ও নিষ্ঠার আদর একদিন হবেই। বড়ো কাছাকাছি তাঁকে পেয়েছিলো এই বিংশ শতকের প্রথমার্ধীরা।

---

* অধুনা স্বর্গত

তাই এখনই তাঁকে বোঝার দায়িত্বকে দায় ব'লে এড়াতে চায়। কালিদাস নিজের কালে, ভবভূতি নিজের কালে, সেক্সপীয়র মিল্টন প্রভৃতি কেউ নিজের কালে নিজের দেশে পূর্ণরূপে সমাদৃত হননি। বহু পরে শতাব্দীর নিস্তব্ধতার অন্তরাল থেকে ডাক দিয়ে উঠেছে মানুষ অতীতকালকে লক্ষ্য করে। হারানো কবিকে আবার পাওয়া গেছে। তাই হবে রবীন্দ্রনাথের বেলায়। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের গুরুদেব নন, তাঁরা আবিষ্কার করবেন এই কবিমানসকে। এইসব গানের রচয়িতা দার্শনিক-লিখিয়ে নন; তত্ত্বদর্শী, মানব-তত্ত্ব-পিপাসু মৃত্যুঞ্জয় সাধক। তাই এ গান গাওয়ার পর মনের ভাবতরঙ্গে দোলা লাগে।

"চা খাবে বাবু?"

গিরথী এসে দাঁড়ালো।

"তোমার শালার দোকান তো কাছেই। সেইখানেই এসেছিলে বুঝি?"

"হ্যাঁ। চা খাবে? চলো,—তুত্তা আছে।"

"তাই নাকি! তুত্তা বুঝি এখন আর তোমায় ছাড়া থাকেনা?"

রাঙা হয়ে বললে—"কোথায়! এইতো সারাদিন পরে ছুটি পেয়ে এলাম। আজ শালার এখানে নিমন্তন্ন।"

"সারাদিন খুব খাটলে বুঝি?"

"হ্যাঁ। ডিনামাইটের কাজ; বড়ো জখমী কাজ। অনেকক্ষণ ধরে তুরপুন দিয়ে আর ছেনি দিয়ে লম্বা গর্ত করতে হয়। যদি গর্ত করতে ভুল হয়, বা ঠাসতে গোলমাল হয়, সব বেকার হবে। আজ আমি প্রায় আটটা দেগেছি। একদিনে এতো দাগা আর কখনও হয়নি। কাল প্রায় বারোটা দাগবো।"

"এর জন্য তুমি কী পাবে?"

"কিছু না। সবাই যা পায়। তবে খাতির করে সকলে। ত্যাখানো, সেই সিমলা থেকে আনিয়েছে। আমি নৈলে এই কাজ নাকি এতো তাড়াতাড়ি হবেনা। আমি এসেছি ব'লেই তো ওভারসিয়র আর এঞ্জিনর-সাহেব এতটা ঢিলেঢালা; এতো ছুটি পান। নৈলে ওঁদের চরকিবাজি ঘুরতে হোতো।"

"অথচ তোমার টাকা নেই!"

"না, বাবু। আমরা চিরকালের গরীব। তুত্তা-ই এর মাঝে আমার একটা নেশা। এবার ওকে আমি সিমলায় নিয়ে যাবো ভাবছি।"

খুশী হয়ে বললাম—"তাই যাও, ভাই।"

"চলো তুমি, চা খাবেনা ?"

"আজ নয় ; যাবার সময় না-হয় একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে যাবো। তুমি যাও ঐ ডাক্তারবাবুকে বরং গিয়ে ডেকে দাও।"

"ও-বাবু বড়ো ভালো লোক। চর্গে গেলে কত লোক কাঁদবে। ভালো ভালো ওষুধ দেয়। ডেকে দিচ্ছি।"

চলে গেল।

ডাক্তার এসে বললে—"খচ্চরগুলো জঙ্গলে হারিয়ে গেছে কিনা দেখতে বেরিয়েছিলাম।"

"সত্যি ডাক্তার, আজও খাবার এলোনা। রাতে তো শেষ খাদ্য ফুরিয়ে যাবে। কাল সকালে কী হবে ?"

"চুলোয় যাক্ খাদ্য। খাদ্যের অভাবের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কে ? পানীয় নেই এইটা বড়ো কথা।"

"আমি তো চলে যাবো, ডাক্তার। আজ নয় কাল। যাবার দিন এসে গেল। কিন্তু আমি সত্যিই জানতে চাই এতো করে মদ খেয়ে তোমার আনন্দ কী ?"

"একটা ভ্যাপ্‌সানি গল্প শুনতে চাও বুঝি ? বেশ প্রেম থাকবে, বঞ্চনা থাকবে, কাঁদাকাটা থাকবে! ডাক্তারের পতন লিখে ডাক্তারকে এক হীরো করবে।"

"পাহাড়ী বিছুটির চেয়েও sensitive তুমি। ছুঁতে-না-ছুঁতে চুলকানো ধরিয়ে দাও। এসব তোমার জ্যাঠামি।"

"জ্যাঠামি ব'লে মনে হয় যখন আঁতের কথা কেউ বলে। তোমার মন আজ উদাস, একা বসে বসে আফিমের নেশায় মেতে আছো…"

"আফিমের নেশা ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, 'আমি কত প্রকৃতিবিলাসী', 'আমি কতো মানবমনপিয়াসী', 'আমি কতো কী' ভাবছো, আর ভাবছো তাবৎ ধরণীর দুঃখদৈন্য নিরাকরণের ভার তোমায় অর্পিত। প্যান্‌প্যানে বাঙালী! দাপট কই, দৃষ্টি কই ? কেবল আবিলতা!"

"জানো ডাক্তার, আমার মনে হচ্ছে যেন আমার কোনও বিপদ আসছে।"

"সেটা বুঝতে পেরেছি। আর তাই ভাবছি তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।

তোমার যা রোগ হয়েছে তার নাম 'homesickness'। প্রেয়সীর মুখচ্ছবি না দেখলে ওর আর শেষ নেই—চলে যাও।"

"আমার বয়স জানো?"

"মানে? বলতে চাও একটা কোনো বয়সের পর শ্রীমতীকে মনে না ধরা তোমার অপরাধ ব'লে গণ্য নয়, মানে, মন থেকে তাড়ানো তোমার অধিকার হয়ে দাঁড়াবে?"

"তা বলছিনা। বলছি যা পাক লাগাবার লেগে গেছে। এখন আর হারাই-হারাই ভাব নেই।"

"অহঙ্কার!"

"কিসে বুঝলে অবিবাহিত নারীভুক্?"

হাসতে লাগলো ডাক্তার—"বড্ড গাল দিলে হে মাস্টার! কিন্তু ভারী মিষ্টি গাল। মনে থাকবে।"

পিছনে পায়ের শব্দ।

পিরথী আর তুত্তা দু'-গেলাস চা এনে দুজনাকে দিলে। দিয়েই চলে গেল তাড়াতাড়ি।

ডাক্তার সেই-যে তাকিয়ে রইলো ওদের পানে, মুখ আর ফেরায়না।

"কী হোলো হে, আর যে ফিরতে চাওনা!"

"There's the cause, there's the cause!—কে—তোমাদের শেলী না ওয়ার্ডস্বার্থ্?"

"কী cause?"

"তোমার মন-কেমন করার, আমায় গাল পাড়ার, আমায় যা-তা বলার।"

"মানে?…না ডাক্তার, নীচতা তোমায় মানায়না! তুত্তা আমার বোনের মতো!"

খুব হাসলে ডাক্তার। "তাই নাকি? কিন্তু তুত্তার কথা আমি মনেই আনিনি। যদিও 'বোনের মতো' ব্যাপারটা আমার 'মনের মতো' নয়, কোথাও। মনস্তাত্ত্বিকরাও ঐ 'মতো'-ধর্মী সম্বন্ধগুলোকে নিয়ে বড়োই নাড়াচাড়া করেছেন।"

বিরক্ত হয়ে বললাম—"শিশু পেলে নাকি আমায়? এইসব কথা শোনাবার উপযুক্ত স্থান কাল পাত্র বটে!"

"সবই relative—স্থান-অস্থান, কাল-অকাল, পাত্র-অপাত্র ভেদাভেদ তো কেবল মনে। খাঁটী—absolute—স্থান বলো, কাল বলো, পাত্র বলো—পাবে কোথায়, পাচ্ছ কোথায়? তবে শিশু তোমায় ভাবিনি। তবু 'বোনের মতো' কথাটার ন্যাকামি আমায় হাসালো মন্দ নয়।…"

"তবে cause-টা কী?"

"তোমার মন আজ কেমন বিরক্ত হয়ে আছে ঠাওর পাচ্ছ তো! গিন্নীর জন্য, বাড়ীর জন্য মন-কেমন করছে বললাম, স্বীকার করলেনা। কিন্তু তুত্তা ষ্টার পিরৃথীকে এই-যে একসঙ্গে দেখছো, এই যে নয়ন-ভুলোনো যুগল রূপ, এই মন-ভরানো ছবিটি একে দেখেই তোমার মন হু-হু করছে। তোমাদের কবিদের ভাষায় বলা যায়—" চোখ মট্‌কে হেসে বললে—"বলবো? ঠাট্টা করবেনা তো?"

"তোমায় ঠাট্টা? ঠাট্টার গলায় দড়ি। নীরেট বেরসিক, মাতালের বেহদ্দ। বলো বলো তোমার কাব্যিক উদ্গার!"

"বেড়ে লাগছে শুনতে, বলতে চাওনা…শোনো তোমাদের কাব্যিক ভাষায় বলে—এক শ্যাল ডাকলে অন্য শ্যাল ডাকে, বনে একটা কোকিল জেগে সাড়া দিলে অন্যগুলো সাড়া দেয়; গাছে এক বাতাসে ফুল ফোটালে অন্য ডালেও ফুল ফোটে, বাতাস যে একই! তাই তুত্তা-পিরৃথী ছবির সম্পূর্ণতা তোমায় বিকল করেছে। 'Zান্‌তি পারছোনা'—vide তোমাদের সাহিত্য।"

"চলো, ফেরা যাক্—কিন্তু সত্যি কেমন স্বাস্থ্যবান সম্পূর্ণ জীবন এই দম্পতীর! প্রকৃতির শোভা যেন।"

"আহা-হো অমৃতং বালভাষিতং আহা কিবা কাব্য রে! এই তুত্তার বয়ঃক্রম ত্রিংশোত্তরতা প্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে আধা-দর্জন পিরৃথীকে আয়ত্ত করে দিব্য সংসার পাতিয়েছে। 'মেঘমালা ঘেরি তড়িতলতাজনু', একটি অঙ্গুরীয়কে অনেকগুলি মণি যেন, একই নাকে অনেকগুলি ব্রণ!"

"পাষণ্ড! বাণীর কমলবনে মত্তহস্তীর মতো দলনে ও পীড়নে, ধ্বংসে ও নাশেই তোমার বিলাস! তুত্তা আবার বিয়ে করবে?"

"করবে গো করবে। তুত্তার মা করেছে, শাউড়ী করেছে, ও করবেনা কেন? এ-বেলার চোখের কাজল ও-বেলার চোখের জলের মতোই 'সইত্য' চাঁদমোহন—বুঝছনা ক্যেনে। তুত্তার সমাজে নব নব যৌবনশালী পুরুষ-ভজনা

যখন অনুমোদিত, তখন বিগতযৌবন পুরুষপ্রিয়তা ওর ধর্ম ও রুচিতে আরোপ করে গুলিখোরের মতো নেশা করে থাকবে কেন? যা সত্য তা দেখ-না-দেখ, যা যথার্থ, স্পষ্ট তা দেখবেনা কেন?"

"রাতে খাবে কী?"

"বেগুন!"

"বেগুন

"হ্যাঁ। একটা রুগীকে ব'লে কয়েক ধামা বেগুন আনাতে সক্ষম হয়েছি। সেই বেগুনের ঝোল এবং ভাত। রুটি হবেনা। কাল ছোলা বন্ধ। কাল ছেলেদের কাজ বন্ধ। ওরা নামবে স্পোর্টস্-তে। এদিকে চলবে ডিনামাইটের কাজ। কাল যদি রসদ না আসে, তোমায় আমায় আর আস্থানাকে কেটে চড়াতে হবে।"

শুক্লা আর সক্সেনা এসে ধরেছে পথেই। "আমাদের মুশায়রা দেখতে কতো লোক আজ এসেছে দূর-দুরান্ত থেকে। গানের মৈফিল শুনে সব ভেঙে পড়েছে। অথচ আজও আমাদের সাজগোজের কিছু এসে পৌঁছালোনা। লক্ষ্ণৌওয়ালাদের মেক-আপ না নিতে পারলে মুশায়রা জমবেনা।"

"আমি কি করবো?"

ডাক্তার বুক্নি ছাড়লো—"হর-ফন্-মৌলা-সর্বকার্যেষু মাধব—দাড়ি-গোঁফ চাই, তাও তুমি পারবে!"

বিরক্ত হয়ে বললাম—"হ্যাঁ, পারবো। যাও শুক্লা, মেক-আপ-এর ভার আমার।"

রাতে যখন মেক-আপ করিয়ে মুশায়রায় ওদের পাঠালাম, ডাক্তার তখন বিস্মিত।

গানের মধ্যে বেজওয়াডার কনকরাও অনেকগুলি কর্নাটক কায়দার গান গাইলে;—গলা বেশ তালিমদার, এলেমদার কিন্তু চমকদার নয়। সেটা পলের গলা। রূপা-ঢালা গলা। যেমন চমক তেমনি ধ্বনি। পল গাইলো হাল্কা সুরের কয়েকখানা। চমকদার না হলেও ভজনের রসে ব্যাকুল গান গাইলে কাথিয়াওয়াড়ের খুশলদাস। শুধু হাতে তালি বাজিয়ে বাজিয়ে গান গেয়ে ছোকরা জমিয়ে ফেললে আসর। কিন্তু আন্ধ্রা থেকে একটি ছেলে গান গাইলে কম্যুনিস্ট লোকসঙ্গীত। ভারতে কম্যুনিস্ট লোকসঙ্গীত একটা বলিষ্ঠ ধারা

নিয়েছে। যতই নাক তুলে কথা কওয়া যাক্‌না কেন—এ-গানের বলিষ্ঠতা, গতিবেগ, অর্থগর্ভতা, এবং সর্বোপরি উন্মাদনা যেন প্রদীপ্ত। এই গান জোর-গলায় গেয়ে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একটা উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা যায়, যেমনটা মুকুন্দদাসের যাত্রার গানগুলি এককালে করেছিলো। তা ব'লে লক্ষ্ণৌয়ের সূক্ষ্ম কাজ, কোল্‌কাতার কোমল এবং আভিজাত্য পরিপূর রস, দিল্লীর ঘরানার মাল যে পরিবেশিত হয়নি তা নয়; গজল, ঠুংরি, খেয়াল সবই গাইলো একের পর এক। বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত হোলো। হোতে হোতে রাত, গভীর রাত। পালা শেষ হোলো। আমরা ঘরে শুয়ে পড়লাম।

*

রাতে সেই ভূতের উপদ্রব, জানালার ধারে কান্নার শব্দ, জানালার শার্সীতে আঘাত—কিন্তু কোনও কারণ পাওয়া যায়না।

সকাল হোলো; তুল্‌সীরাম ডাকছে—"বাবু, চা!"

"এখানেও তোমাকেই চা এনে দিতে হবে, হতভাগা!"

তুল্‌সীরাম হল্‌দে দাঁত বার করে বললে—"বড়ো চমৎকার দিন আজ। দূরের পাহাড়গুলো সব দেখা যায়। আজ যাও জঙ্গলে। আজ নিশ্চয় হরিণ দেখতে পাবে। কস্তুরী;—আসল। যাও, শিকার করে এসো!"

এদিকে লাউড-স্পীকার বলছে—"এসো, সবাই এসো। আজ 'অ্যাথ্‌লেটিক মীট্'। এখুনি মিস্টার খাদরালা অলিম্পিক-টর্চ নিয়ে পাহাড় পরিক্রমা করবে। সকলে এসো। টুর্নামেণ্ট আরম্ভ হবে এখুনি।"

ওদিকে বিরিজরাজ সিং এসে বিছানার ধারে বসে বলছে—"চলুন স্যর, আপনাকে অনেক ক'টা আইটেমে জাজ্ করা হয়েছে। আজ স্পোর্টস্‌-তে। আজ আর বিছানা নয়, উঠুন।"

খেলার আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে খাদরালা-ক্যাম্পের যুবকদল।

যখন অওতার সিং বিরাট একটা মশাল হাতে নিয়ে দৌড়চ্ছিল, যখন ছেলেরা পতাকা হাতে নিয়ে কুচ করে চলেছিলো, যখন লাউড-স্পীকারে নানা বাদ্য বেজেছিল—সেই জনহীন কান্তার যেন আনন্দে কলরব করে উঠেছিল। তরুণের স্বপ্ন, তরুণের বিদ্রোহ, তরুণের তেজস্বিতা, নির্ভীকতা—তরুণেরই সাজে; পলাশ আর কোকিল যেমন সাজে আম্রমঞ্জরীর গন্ধের সাথে; চামেলী

আর দোয়েল যেমন সাজে শেফালীর গন্ধের সাথে। আমরা শুধু চেয়ে থাকবো এই ব্যাকুলিত হিন্দোলিত প্লাবন-আনা তারুণ্যের জোয়ারের পানে। কিছু দ্বেষ, কিছু সঙ্গীত; কিছু বন্দনা, কিছু বঞ্চনা; এই দোলায় দুলবে চিত্তপাথারে ভালো-অভালো-তত্ত্ব-নিয়ামক সমালোচক মনটি। আমার বয়সের বেলাতটে দাঁড়িয়ে নতুন-সূর্য-উদয় আর দেখবোনা জানি—তাই ভোরের বাতাসের গন্ধ, উষার আঁচল-ঢাকা আলোর সম্ভাবনা হঠাৎ জাগিয়ে দেয় অনেক-কিছু ঘুমন্ত স্বপ্নকে।

আমি যখন কারুকে বলতে শুনি—"এ-যুগটা কী অপদার্থ অকর্মণ্য, এ-যুগের-ছেলেগুলো কী দায়িত্ব-কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জিত"—আর কিছু না হোক, বেশ বুঝতে পারি বক্তা বিগতযৌবন। আমি নিজেও যখন বলি তখনও মর্মে মর্মে বুঝি "হারিয়ে গেছে সেদিন রাতের তারা"।

তাই এদের দেখতে দেখতে যেমন একটা দিকে আনন্দের বন্যায় উদ্বেল হয়ে উঠলো জীবনপুলিন, অন্যদিকে মনে হোলো খাদরালা-বনভূমির কথা। দশহাজার ফুটের মাথায় ঘনগম্ভীর অরণ্য; ভয়ে ভয়ে লোক আসতোনা। ভালুক আর অজগর, নেকড়ে আর সাপের আড্ডা। পাইনের দুস্তর পর্দা, হাতীও যা ভাঙতে পারেনা। এখানে একদিন মানুষ আসবে, তরুণ মানুষ, সভ্যজগতের জ্ঞানান্বেষী ভাববিলাসী মানুষ, কে কবে ভেবেছিল? কে ভেবেছিল এই বনভূমির কপালে অগ্নিতিলক এঁকে দেবে ধাবমান অওতার সিং, এর গলায় পরিয়ে দেবে দেবদারু-কিশলয়ের মাল্য বোম্বাই-এর পারীখ, এর মাথায় ঘোমটা টেনে দেবে ত্রিবর্ণ-পতাকার মহিমময় গৌরব, এর সীমন্ত রক্তিম হয়ে উঠবে প্রাণঝরা হাসির অরুণরাগে। বনভূমিতে বেজে উঠবে গান, নেচে উঠবে জীবন। খাদরালা আমাদের দু'চোখ ভরে দেখছে আজ। বাজেশাল গ্রাম দূরে বসে বসে এই আগুন দেখছে কি?

হাই জাম্প, লং জাম্প, পোল-ভল্ট, দৌড় সবই হতে লাগলো। আর হতে লাগলো অদ্ভুত কপাটি-খেলা। দলে দলে আটজন। খুব জমেছে। শ্রেষ্ঠদল মরাঠারা। ভারতবর্ষে কপাটি-খেলার চ্যাম্পিয়ান এই মহারাষ্ট্র, এবং সেই বিজয়ী দলের মধ্যের তিনজনই আছে এই দলে। অদ্ভুত তাদের ক্ষিপ্রতা আর কৌশল।

হঠাৎ একটা ছেলে ছটকে খাদের মধ্যে পড়ে গেল। চারধার থেকে

চিৎকার উঠলো—"হায় হায়"। কপাটি-খেলার মতো প্রশস্ত স্থান কোথায় এই তীক্ষ্ণদেহ খাদরালার পাহাড়ে? ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারির সামনে একটু জায়গা। সেখানেই চলছিলো পালার পর পালা খেলা। নীচেই সম্ভ-কাটা পথ, আর তার তলায় গভীর খাদ গড়িয়ে গেছে।

কী ভাগ্য ছেলেটার পা-জামা একটা বেড়া-তারে আটকে যাওয়াতে একনিমেষ ও সময় পায়। সেই সময়টুকুর মধ্যে ও নিচের খাদে পড়েই একটা বরাসগাছের ডাল ধরে ফেলে। বেঁচে গেলো।...

কিন্তু খেলা বন্ধ হোলোনা।

"না না, বন্ধ নয়, বন্ধ নয়...চালাও..." বিরিজরাজ সিং হাঁক পাড়ে। সব ছেলেরা চিৎকার করে—"চালাও ভাই, চালাও।"

কিন্তু করীমখানের সেই বাণী। ক্ষুধিত আছে খাদরালা। রক্ত চাই তার। আমার পাপ—আমার এই দুরন্ত জিজ্ঞাসার ফল। সেই কাশ্মীরী-বেদেনীর মুখ দেখেছি। রক্ত নেবে তারা। বিংশ শতাব্দীর নগরপালিত বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও এই সংস্কার বার বার মনের মরচে-পড়া দরজায় শব্দ তুলছে। আমার মাথায় সেই-যে ধুলোবালির স্নান করিয়ে দিয়ে গেলো, সেই থেকেই মন আমার যেন কেমন ঝিমিয়ে আছে। পদে পদে শঙ্কা। পদে পদে ভয়।

দূরে একটা কোলাহল। অনেকগুলো কুলী কি-একটা বয়ে নিয়ে আসছে। পাহাড়ে গাছ ফেলার সময় এমন শব্দ করে কুলী-গ্যাং। আজ ওরা কাজও করছিলো খুব বেগে। বার বার ডিনামাইটের শব্দ, আর গাছ পড়ছে নিচে বিরাট শব্দ করতে করতে। কিন্তু এ সে গোলমাল নয়। কী যেন বয়ে আনছে ওরা।

দুটো ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এলো। তাদের চক্ষে আতঙ্ক, ভীতি, ব্যগ্রতা।

"ডাক্তার-সাব্, ডাক্তার-সাব্!"

"কি গো, কী!"

"জল্‌দি খেলা বন্ধ করে দিন। এখানে চৌকি পেতে একটা বিছানা করুন। একটা ভীষণ..."

"কি? অ্যাক্‌সিডেণ্ট?"

"ভীষণ; একটা লোকের সমস্ত মুখটা উড়ে গেছে ডিনামাইটে। ভীষণ রক্ত পড়ছে। চোখ-টোখ সব উড়ে গেছে।"

ডাক্তার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—"তবু শালা বেঁচে আছে? আমায় ডোবাবার মতলব!"

ডুবতে চললো ডাক্তার। ক'পাত্র টানলো জানিনা। আমায় বললে—"ভীড় সামলাও।"

লাউড-স্পীকারে বারণ করে দিলাম কেউ যেন ডাক্তারের ঘরের সামনের খালি জায়গায় না আসে। হাতে হাতে ধরে একটা বেড়া করিয়ে দিলাম।

আস্থানা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে এসে বললো—"খেলা বন্ধ করে দিই; কি বলেন?"

"কিছুতেই নয়। পূর্ণ বিক্রমে খেলা চালান। নৈলে এই বেদনা সকলকে পেয়ে বসবে। আর ভীড়ও হবে। ছেলেদের মনের জোর বজায় রাখা এখন আমাদের সবার বড়ো দায়িত্ব। খেলা চলুক।"

লাউড-স্পীকারে আবার খবর দৌড়ুলো: "খেলা চলবে।"

ইতিমধ্যে লোকটাকে নিয়ে কুলীরা এসে পড়লো। ডিনামাইট! ডিনামাইট!…কে লোক? এ লোক কে?…

অনর্গল ব'লে যাচ্ছিলো হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে রথীরাম, বুড়ো সর্দার: "অনেকটা গর্ত করে বেশ গেদে-গেদে বারুদ ভরা হোলো। পলিতাও খুব কেরামতির সঙ্গে রাখা হোলো। এমনি এগারোটা। তারপর পলিতায় আগুন। দম্ দম্ করে ফাটতে লাগলো পর পর দশটা। কিন্তু বাকী একটা। সেটা কোন্‌টা? কোন্‌টা ফাটেনি? সাধারণতঃ আমরা দশ মিনিট অপেক্ষা করি। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর পিরথী বললে—'বুড্ঢা, তোর ভীমরতি হয়েছে। পঁচিশ মিনিটের পরেও মশালা জ্বলবে কি রে? ছেড়ে দে, দেখে আসি।' পিরথীর হাতের গর্ত; তার হাতের ঠাসা। অমন কাজ কারুর হাতের নয়। দেখা গেল একটা ফাটেনি। বারণ করা সত্ত্বেও…"

আমি আর্তকণ্ঠে ব'লে উঠলাম—"কে? পিরথী নয় তো?—পিরথী নয়?"

উদাস দৃষ্টিতে ও চাইলো আমার পানে। তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললো—"থামিয়োনা আমার কথা তুমি। পিরথীকে আমি চিনিনা? তুমি চেনো?

অমন কাজ কার হাতে? অমন ছেলে ক'টা? গেলো দেখতে। উবু হয়ে যেই দেখছে অমনি একটা বিরাট শব্দ করে ফাটলো—"

আমি বুড়োর ঘাড় দু'-হাতে ধরে বললাম—"কে? পিরথী?"

কিন্তু দেখে ধরার জো নেই যে! তাই বার বার জিজ্ঞাসা। তা ছাড়া আমি যাইওনি রোগীর ধারে। ভীড়টাই সামলাচ্ছি। কিন্তু আর যেন সহ্য হচ্ছেনা এই ঔৎসুক্য!

ডাক্তার ডাকলো—"মাস্টার, এসো একটু সাহায্য করো।"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই।

কী দৃশ্য!!

কপালের ওপর থেকে খানিকটা চুল অবধি জায়গা থেকে দগ্ধানো ঘা। একটা চোখ সম্পূর্ণ উড়ে গেছে এবং গালটা নেই। ভেতরের দাঁত আর জিভ দেখা যাচ্ছে। অন্য চোখের ওপরের মাংস ঝুলে পড়ে জায়গাটায় একটা মাংসপিণ্ডের তাল হয়ে গেছে। নাকটা উড়ে গেছে। মুখখানা মাংসে ধোঁয়ায় মাটিতে রক্তে আর চেনা যায়না। একটুও চেনা যায়না। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। কখনও কোনও সাড়া-শব্দ দেবে এ প্রমাণ নেই।

কিন্তু পাহাড়ের প্রাণ। গিয়েও যায়নি। নাড়ী চলছে। প্রাণের ধারা বইছে। তাই ডাক্তারের কর্তব্য রয়ে গেছে। ডাক্তার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করে যেতে লাগলো।

হঠাৎ পায়ে এসে আছাড় খেয়ে পড়লো তুত্তা। অভাগিনী তুত্তা।

"ভাই-সা—ব্—"

ওরে আমি কি করবো রে তুত্তা? আমি কি করবো? তোরই মতো আমিও নিরুপায়, অসহায়। "ওঠ্ ওঠ্—এখন একটু থাম্! সারাজীবন কাঁদতে পাবি। এখন দ্যাখ্ যদি ওকে বাঁচাতে পারি!!"

ধক্ করে উঠলো প্রাণ! বাঁচবে? আর ও বাঁচবে? আর কি ওর কাছে জীবনের কোনও অর্থ থাকবে? দেহের ভেতর প্রাণ বয়ে যাওয়াই কি জীবন? বেঁচে থাকা কি জীবন? প্রাণ আর জীবন কি এক? To exist, to continue to live—এক কি? চোখ নেই, বীভৎস কদাকার মুখ, উপার্জনহীন দীর্ঘ যৌবন, দীর্ঘতর বার্ধক্য পার হয়ে যেতে হবে সমাজের ঘৃণা ও করুণার পাত্র হয়ে, এরই জন্য ডাক্তারের প্রচেষ্টা?

তুত্তা ডাক্তারের পায়ে,—"বাঁচাও ওকে ডাক্তার-সাব্, বাঁচাও!"

ডাক্তার চেয়ে থাকে মেয়েটার পানে। হাত ধরে তোলে। ততক্ষণে রোগীর সারা মাথা-মুখ ব্যাণ্ডেজে বাঁধা হয়ে গেছে। নাক আর মুখের কাছটায় খালি রেখেছে একটু একটু নিশ্বাসের জন্য।

তুত্তার হাত ধরে ডাক্তার বলে—"বাঁচাবো? আমি কি জীবন দিই না নিই? কিন্তু তুই বলিস্ বাঁচাতে? ভারী স্বার্থপর তো। তুই বল্ যে—ও মরুক, করুক। তুই স্ত্রী, তুই বরং তা বলতে পারিস্। আমি ডাক্তার, আমিই পারিনা। মরণ দেবার পাগলামি করা আমাদের গুরুর নিষেধ।"

ডাক্তার ঢুকলো তার ঘরে। আজ ও জ্বলন্ত আগুনের মতো তরল-বিষ দিয়ে সমস্ত জ্বালা নেবাচ্ছে, ধুয়ে দিচ্ছে।

চিৎকার করে ওঠে তুত্তা—"একটিবার দেখতে দাও ওগো, মুখখানা একটিবার দেখতে দাও! ও ডাক্তার-সাব্, তোমার কোল-জোড়া ছেলে হবে —থলে-ভরা টাকা হবে…"

বাঘের মতো লাফিয়ে প'ড়ে ডাক্তার তুত্তার প্রায় টুঁটি টিপে ধরে বলে—"চুপ কর্ তুই। নৈলে পুঁতে ফেলবো তোকে। এটা হাসপাতাল। চিৎকার করার জায়গা নয়। আমি শাপ দিই তোর ছেলে হোক, তোর টাকা হোক—তা নৈলে বুঝবিনা কী শাপ দিচ্ছিস্।"

আবার ছট্‌কে এসে পড়ে তুত্তা আমার পায়ে,—"একবার দেখতে দাও, মাস্টার-সাব্! আমার পিরথী! তোমায় কাল চা দিয়েছে, সিগারেট দিয়েছে। কত সুন্দর ওর মুখখানি ছিল—হায়-হায় আমার একি হোলো!"

বুড়োটা এসে ততক্ষণ তুত্তাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বসেছে। তুত্তা সাপের ফণার মতো দুলছে, ছট্‌ফট্ করছে, চাইছে ছুটে গিয়ে পিরথীর দেহ জড়িয়ে ধরে!

"তুই কেন এখানে তুত্তা? এখানে এলি কি করে?"

"হায় আমার ভাগ্য! কেন এলাম? কেন আমি মরে গেলামনা গাঁয়ে।" ছিট্‌কে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো পিরথীর দেহ—"ওগো ওঠো, জাগো; গাঁয়ে ফিরতে হবে; বাসায় যাবো গো; আর তোমায় পথের কাজ করতে দেবোনা, —একবার…"

ওকে সরিয়ে নিয়ে গেল হোটেলের মালিকের স্ত্রী আর দু'-একটি মেয়ে যারা

ওষুধ নিতে এসেছিল। আর কোনো ভরসা না পেয়ে ও ডাকতে লাগলে —"ভাই-সা—ব্—ভাই-সা—ব্"—···খাদরালার পাহাড়ের উঁচু পথে আঁকেবাঁকে শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেলো।

ডাক্তার হাত ধুচ্ছে সাবান দিয়ে। ছেলেদের খেলা দূরে চলেছে হাসপাতালের প্রাঙ্গণ কলগুঞ্জনে ভরতি। খচ্চরের দল রসদ নিয়ে পৌঁছে গে সবে। আমি ভাবছি সেই কথা—"ফোস্কা পড়বে রাতে ওদের গায়ে। রক্ত দিয়ে না ধুলে তা সারবেনা। রক্ত চাই···" মনে পড়লো—"তোমায় না হোক যে এখন তোমার মনের খুব কাছাকাছি···" কেন তখন আমি তুত্তার কথ ভাবছিলাম। ওদের সুখে আমার সুখ মিলিয়ে দেবার দরকার ছিল কি আমার ?

জল ঢালছে কম্পাউণ্ডার ডাক্তারের হাতে। সাবানের ফেনা হচ্ছেনা— পাহাড়ী জল। সাবান-ধোয়া জল। সাদা জল। মনটা অমনি হার্ড-ওয়াটার ধোয়া সাদা জল। চেষ্টা করেও ফেনার শুভ্রতা নেই, সাবান-জলের ক্লেদে ভরা

"কাল তুমি আমায় বলছিলে গিন্নীর কথা, বাড়ির কথা ভেবে আমার ম খারাপ···"

"আর বলছিলাম এদের যুগলকে দেখে তোমার মন আরও খারাপ···"

"কিন্তু খারাপ ছিল এই সম্ভাবনার ভবিতব্যের ছায়াপাতে।"

"মানে তুমি আগামী ঘটনাও জানতে পারো ? কলির সঞ্জয় না ধৃতরাষ্ট্র ?"

"মানে, ক'দিন ধরে কেবল মনটা একটা অন্ধ সংস্কারের আবর্তে জড়িয়ে হাঁফাচ্ছিলো। বার বার তাকে তাড়াচ্ছিলাম সংস্কার ব'লে। কিন্তু ডাক্তার সব সংস্কার নয়···"

ডাক্তার বললো—"তা নয়। কিন্তু ওকে পত্রপাঠ জীপে করে সিমলা পাঠাও।"

"বাঁচতে পারে ও ?"

"যতক্ষণ না মরে যায় ততক্ষণ ডাক্তার বলে 'বাঁচানো যায়'—তাই বিধি···

"হায়, যদি বাঁচে, কী সর্বনাশই হবে!"

আমি দেখলাম জীপে করে ওরা নিয়ে গেল—কিন্তু তুত্তাকে নিয়ে গেলোনা জীপে জায়গা নেই ; তা ছাড়া সিমলায় গিয়ে কোথায় থাকবে ?

এর মধ্যেই ছেলেরা চাঁদার খাতা বার করেছে। তুত্তার হাতে তুলে দেওয়া হবে মোটা টাকা। কেন? টাকা কেন? সরকারী হাসপাতাল থেকে ওর চিকিৎসা হবে। আর মরে যায় তো, তুত্তা পেন্‌সন পাবে; টাকা কেন?

মানুষের মনে সহানুভূতি একটা জ্যোতি; জীবনে অন্ধকার দূর করে।

কিন্তু জ্যোতির তেল টাকা। একটা রূপ নৈলে সহানুভূতি প্রকাশ পায়না। এতোবড়ো ক্যাম্প-টার মনে বোবা-ব্যথা ভাষা খুঁজে পেলো টাকায়।

ডাক্তারের মাথায় নেশা চড়েছে। সে গান ধরেছে—

*A widow bird sat mourning for her love*
*Upon a wintry bough ;*
*The frozen wind crept on above*
*The freezing stream below-o-o-o—*

আমি ডাক্তারের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললো—"আমাদের ডাক্তারি কি জানো—consoling the living and consolidating the dead! কেবল জীবন্তকে ব'লে যাও—আছে আছে, আশা আছে; মকদ্দমার আশা উকিল, পরকালের আশা পুরুত, আর জীবনের আশা ডাক্তার। ধাপ্‌পাবাজির এতোবড়ো উপকরণ, আয়োজন আর কারসাজি আর নেই…"

আমি বললাম—"ভাবিনি শেষ দিন ক'টায় এমন ধাক্কায় পড়বো। তুত্তা আমার কে?"

ডাক্তার বললে—"Friend!"

আমি উদাস কণ্ঠে বললাম—"What is a friend? বন্ধু কী ডাক্তার?"

গ্লাস থেকে একটা চুমুক দিয়ে ডাক্তার বললে—"দুঃখের কারণ; কারণ, এই কারণ থেকেই সুখের জন্ম।"

"বৌদ্ধদর্শন নাকি?"

"জানিনা। তবে এ-কথাটা জানি: For a weak and tender soul it is the greatest of misfortunes to have known the greatest happiness!"

"বাঃ, চমৎকার কথাটি তো! কার কথা, ডাক্তার?"

"ঐ তোমাদের শেলী বা কীট্‌স্‌ হবে।"

"না, না—তাদের কথা নয়—বলোনা ডাক্তার—"

"রলঁ্যা—ক্রিস্তফের আঁতোনেত্‌ মরে গেলে বলেছেন। সুসম্পূর্ণ মিলনানন্দের বাড়া দুঃখ নেই, মাস্টার। ওর বড়ো দুঃখ নেই। শুনবে কথাটা, শুনবে?—দাঁড়াও, মগজটাকে চাঙ্গা করে নিই। তুত্তা কাঁদে—কাঁদে কেন জানো? ভালবেসে মরেছে! কখ্‌খনো ভালবাসবেনা—না—ভট্‌চায-গিন্নীকেও না—অবশ্য কোনো গিন্নীকেই কোনো কত্তা ভালবাসেনা—তবে কিনা তুত্তা গিন্নী এখনও হয়নি—তুত্তা এখনও জীবন নিয়ে খেলা করছিলো, বাঁচা নিয়ে ঘরকন্না এখন সুরু করেনি—"

"জীবন বলতে কী বলো, ডাক্তার? জীবন কী?"

"Life? A tragedy—ঐ রলঁ্যারই উক্তি। বড়ো ঋষি-মনিষ্যি ছিলেন গো—"

"যাক্‌, কথাটা বলছিলে বলো—"

"বলি। শোনো বালক, শোনো। 'He who has once had the happiness of perfect intimacy and boundless friendship with another human being has known the divinest of all joys,—a joy that will make him miserable for the remainder of his life.' [ নিবিড় সম্বন্ধের সুখ একটিবার যার হোলো, আর একটি মানুষকে একটিবারও যে বন্ধুতার সীমাহীন বন্ধনে যে পেলো—সে পেলো চরম সুখ, স্বর্গীয় সুখ—এমন একটা সুখ, যার ফলে জীবনে বাকী ক'টা দিন সে একেবারে মুষড়ে পড়ে থাকবে। ]"

"এই সীমাহীন বন্ধুতার বন্ধনে যে আমিও পড়েছি, ডাক্তার—এই খাদরালার জঙ্গলে।" আমার কণ্ঠস্বর মৃদু, কিন্তু দৃষ্টি স্থির।

ডাক্তার দুটো চোখ আমার চোখের ওপর রেখে বললে—"বাকী সময়টার জন্য সমবেদনা জানাই, বন্ধু। তুমি একটি শৌখিন হতভাগ্য!"

কখন খাবার সময় হোলো, খাওয়া হোলো, কিছু জানিনা।

খাদরালা-হোটেলে তুত্তার খোঁজে গেলাম। সে নেই, চলে গেছে। সিমলার পথ ধরে অভাগিনী ছুটে চলে গেছে। আমি সংবাদটা শুনে খানিকট চেয়ে রইলাম শূন্যে। মনে পড়লো—

*Man is like vanity : his days are*
*as a shadow that passeth away.*
*He asked life of thee and then gavest it him,*
*even length of days for ever and ever.*

কোথাও পাবে তুত্তা তার বেঁচে থাকার সন্ধান। কোথাও পাবে পিরৃথীর খানিকটা; সে-পথ মহাকাল নিজে ওকে দেখিয়ে দেবেন। আমি শুধু ভাবি এই খাদরালার জঠরে কী বিষ-ই সঞ্চিত ছিল! আমায় চিরদিনের মতো বিষাক্ত করে দিল।

ডাক্তারকে তো আর পাবোনা জানতাম।

কিন্তু কাজ থেমে থাকেনা। পিরৃথীর দুর্ঘটনা সাধারণের চক্ষে একটা দুর্ঘটনা মাত্রই। কুলী-গ্যাঙে অমনটা হয়। কোথা থেকে তুত্তার ঘটনা এসে যেটুকু আবিলতার সৃষ্টি করেছিল, যথাকালে কাজে-কর্মে সবাই তা ভুলে গেল। বেলা তিনটে থেকে আবার ডিনামাইট ফাটার শব্দ সুরু হয়ে গেল। থামানো যায়না। কাজ করে যেতে হবে।

কিন্তু বিকেলে আমি যদিও ওদের সঙ্গে বেরুলাম, আমায় ওরা পেলেনা। রাতেও না। গভীর রাতে বারান্দায় বসলাম।

আজ তো জানালার ধারে অশরীরী সেই কান্না নেই। আমি গান করছি গুন্‌গুন্ করে—

"এই কি তোমার খুশী তুমি তাই পরালে মালা…"

বুদ্ধু এসে দাঁড়ালো, তারপর নির্মল, তারপর রাখাল। এবং গানের পর গান। সারারাত রবীন্দ্রনাথের গান।

শেষরাতে বললাম—"না, আর নয়। খাদরালা আর নয়। আমি চলে যাবো এবার। বাড়ি-ই আমার ভালো। এখানে আমি থাকবোনা—"

কানে তীক্ষ্ণ শব্দ: "ভাই-সা—ব্, একটিবার দেখতে দাও ভাই-সাব্।—"

নির্মল বললে—"আমিও থাকবোনা।"

ভোরের দিকে আস্থানা বিছানার পাশে বসে ডাকছে।

"কি ভাই?"

"উঠুন। এমন সকাল দেখেননি।"

সত্যিই এ কী সকাল! এ কী রূপ!!

দূর-দূরান্তে গিরিশিখরের পর গিরিশিখর ধাপে ধাপে উঠে গেছে। এই দীর্ঘ আঠারো-দিনের অভিজ্ঞতায় এতোগুলি গিরিশিখর কোনোদিন প্রত্যক্ষ করিনি। পাঁচটা স্তর পর্যন্ত দেখেছিলাম একদিন। আজ তা নয়; আট, নয়, দশ—শিখরের পর শিখরে জ্যোতির তরঙ্গ। তীব্র-বিচ্ছুরিত আলোর ঢেউ, যেন সৌন্দর্য ফুলে ফুলে আকাশপানে উঠে গেছে। বিচিত্র তার বর্ণ, বিচিত্র তার সমাবেশ। অরোরা-বোরিয়ালিস্ কেমন হয় জানিনা, দেখিনি; কিন্তু একি দীপ্তিচ্ছটা, স্বর্ণনিকষিত সম্পদ! কোথাও হলুদ, কোথাও বেগুনী কোথাও ফিরোজা, কোথাও কমলা—যেন একটা বৈশিষ্ট্য রেখে ছন্দ রেখে বিস্তারের পর বিস্তারে চলে গেছে দিগন্ত ছাড়িয়ে দিগন্তে, ঊর্ধ্বলোক অতিক্রম করে ঊর্ধ্বতর লোকে। পর্বত নয়, গিরিশ্রেণী নয়; এ যেন সুদূরের ইশারা এ যেন আরো চলার ইঙ্গিত। "আমি আছি—এখানে নয়—এখান থেকে বহুদূরে—আরও দূরে—আরও দূরে আছি। চলে আয়—পাবি তো আয় দেখবি তো আয়"—তেমনি ডাক। এর বর্ণনা নেই, বেদনা আছে; ভাষা নেই, বন্দনা আছে।

*

আস্থানা কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে নির্বাক বিস্ময়ে দেখছে আর বলছে—"এম পবিত্র স্থানে এসে আপনাকে পেলাম, প্রিন্সিপল-সাব্—এ আমার বহু ভাগ্য এ জায়গায় এসেও বন্ধুত্ব করতে পারলাম না, এতো ছোটো হয়ে গেছে মন কাল তুত্তার দুঃখে আপনি যা বিচলিত হয়েছিলেন, দেখে হিংসে হচ্ছিল। আমিও তো পাইনি আমার জীবনসঙ্গিনী। আমিও তো রিক্ত অভিশপ্ত জীবন যাপন করছি। কিন্তু দেখুন, আমার জন্য একফোঁটা চোখের জল কেউ ফেলবে এমন কিছু করতে পারলাম না। সরলতা যার জীবনে নেই তার কিছু নেই।"

আমি সান্ত্বনা দেবার ভাষা পেলাম না। শুধু বললাম—"এত ভোরে আপনি উঠেছেন যে বড়ো?"

"কাল রাতে ঘুমোইনি। আপনাকে আজই সিমলা পাঠাতে হবে। জানি আজ আপনাকে যদি পাঠাই, আপনি আর ফিরবেন না। কিন্তু না-পাঠিয়েও উপায় নেই। এতোগুলো লোক ফিরবে। এদের থাকার ব্যবস্থা, রেলের

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে ফেরার ব্যবস্থা, দিল্লীতে ফিরে একটা বিদায়-সভার আয়োজন—সবই করতে হবে। হিমাচল-সরকারের অফিসারদের গিয়ে বলতে হবে শ্রীমতী ইন্দিরার আসার ব্যবস্থা করতে, রাজ্যপালের আসার আগে সেই স্মৃতিফলকটা পাঠাতে—আজ বাইশ, আর ছাব্বিশে ক্যাম্প গোটাতে হবে। আপনি সাহায্য না করলেই নয়।"

"বেশ তো..."

"বেশ তো নয়। আজ অকপটে বলছি এই চিন্তাতেই আমার ঘুম হয়নি সারারাত। আপনি চলে যাবেন তাতেও ভালো লাগেনি। অথচ কোনও উপায় নেই। আপনি চলে গেলে আমি তো পক্ষহীন হয়ে পড়বোই—আপনার সাধের পার্লামেন্টের উদ্বোধন নিয়ে ছেলেদের মধ্যে বিমর্ষভাব দেখা দেবে—তা ছাড়া সমস্ত ক্যাম্প একসাথে আনন্দহীন নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।"

"এতো করে আমায় বাড়িয়ে তুলবেন না, আস্থানা!"

"ছি ছি, এই ভোরের বাতাসে সূর্যের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে মিথ্যা ছলনা করার অভিসন্ধি শয়তানেরও হয়না। অকপটে সব বলার সময় হয় কৈ। তাইতো আমি শেষ অবধি সব বলতে একা-একা চলে এলাম। জীপ্ আসবে আটটায়, সাড়ে-আটটায় ছেড়ে যাবেন। তার আগে জাগিয়ে তুলুন সারা ক্যাম্প-কে। নিজহাতে আমি লাউড-স্পীকার লাগিয়ে দিচ্ছি।"

সত্যিই ও লাগিয়ে দিলো। আমি গাইতে লাগলাম—

"ডাকিল মোরে জাগার সাথী..."

তারপর সেই অপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনা দিতে লাগলাম। ধীরে ধীরে সারা ক্যাম্প জেগে উঠলো। পাহাড়ের গা বেয়ে এক-দুই-দশ-বারো গুটি-গুটি সব নামতে লাগলো, কারুর গায়ে ওভারকোট, কারুর গায়ে কম্বল। একী দৃশ্য, সত্যিই তো একি দৃশ্য—সকলেই একেবারে যেন জ্যোতিষ্মান্ অনাদিপুরুষের মুখোমুখী।

কখন এসে দাঁড়িয়েছে খান্না। বললে—"গান-না সেই বাংলা-গানটা—"

আমি জানি কোন্ গান। বললাম বুদ্ধুকে—"ধরো, বুদ্ধু—" দুজনায় মিলে গাইতে লাগলাম—"পোহালো পোহালো বিভাবরী", আর তারপরেই—সাজাবো যতনে কুসুম-রতনে..."

নির্মল জেদ ধরলো—"না! তাহলে আমিও যাবো।"

আমি আস্থানাকে অনুরোধ করলাম। নির্মলও চললো আমার সঙ্গেই।

সারা ক্যাম্প অবাক।

"চললেন?—সেকি! এ-কথা তো ছিলনা। চললেন?"

এ শুধায় "চললেন?", ও শুধায় "চললেন?"—সকলে যেন আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

তুস্‌সীরাম বিছানাপত্র বেঁধে দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে হল্‌দে দাঁত বার করে হাসছে আর বলছে—"বড়ো তাড়াতাড়ি যাচ্ছো, বাবু। আমি চিনি আর ঘি যোগাড় করেছিলাম।"

তখন ঠিকানা নেবার হুড়াহুড়ি লেগে গেল: ঠিকানা দেওয়া, ঠিকানা নেওয়া।

জীপ্ এসে গেল।

আমি ও নির্মল চড়লাম।

জিনিসপত্রও উঠলো।

উঠলোনা ডাক্তার।

এমন নেশা করেছে—তাকে আর ডাকার ইচ্ছা নেই কারো। শেষমুহূর্তে বাল্‌জী গিয়ে ডাকলে—ও এসে যখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছে জীপ্ তখন ছেড়ে দিয়েছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বললো—"A joy that will make him miserable for the remainder..."

জীপ্ চলে গেল। আর শোনা গেলনা।

খাদরালা পড়ে রইলো পেছনে।

সামনে শুধু সিমলার পথ—

আর কী?

আর গানের কলি—

"যাত্রী আমি ওরে।
কোন্ দিনান্তে পৌঁছব কোন্ ঘরে।
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে
বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে
কে গো আমায় স্নিগ্ধ দু'নয়ানে
অনাদিকাল চাহে আমার তরে।"